চর্যাগীতিকা

সম্পাদনায়
মুহম্মদ আবদুল হাই
ও আনোয়ার পাশা

সম্পাদনায়

মুহম্মদ আবদুল হাই

অধ্যক্ষ, বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ও

আনোয়ার পাশা

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সূচীপত্র

ভূমিকা

।। পুঁথি আবিষ্কার প্রসঙ্গ ।।

স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর সম্পাদিত 'বৌদ্ধগান ও দোহা'র মুখবন্ধে লিখেছেন—'যখন প্রথম চারিদিকে বাঙ্গালা স্কুল বসান হইতেছিল এবং লোকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণ পরিচয়, বোধোদয়, চরিতাবলী, কথামালা পড়িয়া বাঙ্গালা শিখিতেছিল, তখন তাহারা মনে করিয়াছিল, বিদ্যসাগর মহাশয়ই বাঙ্গালা শিখিতেছিল, তখন তাহারা মনে করিয়াছিল, বিদ্যাসাগর মহাশয়ই বাঙ্গালা ভাষার জন্মদাতা। কারণ, তাহারা ইংরেজীর অনুবাদ মাত্র পড়িত, বাঙ্গালা ভাষার যে আবার একটা সাহিত্য আছে এবং তাহার যে আবার একটা ইতিহাস আছে, ইহা কাহারও ধারনা ছিল না।···ক্রমে রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস ছাপা হইল। তাহাতে কাশীদাস, কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ প্রভৃতি কয়েক-জন বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীন কবির বিবরণ লিখিত হইল। বোধ হইল. বাঙ্গালা ভাষায় তিন শত বৎসর পূর্বে অনেকতক কাব্য লেখা হইয়াছিল; তাহাও এমন কিছু নয়, প্রায়ই সংস্কৃতের অনুবাদ।'—এই হচ্ছে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে সাধারণ শিক্ষিত বাঙালীর ধারণা। কিন্তু ধারণাটা যাই হোক, এ কথাও সত্য যে—ঐ সময়টা ছিল বাঙালীর বিকাশের যুগ, জীবনের নানা ক্ষেত্রে তার অনুসন্ধিৎসা ও কৌতুহল তখন বিচিত্রমুখী হয়ে উঠেছে। এই বিচিত্র অনুসন্ধিৎসার অঙ্গ হিসেবেই আমরা লক্ষ করি, বৌদ্ধধর্মের ইতিবৃত্ত ও সাহিত্য সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান শুরু হয়েছে তখন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও বৌদ্ধধর্মের ইতিবৃত্ত সন্ধানেই নেপাল যাত্রা ক'রে এ-পর্যন্ত প্রাপ্ত বাংলা সাহিত্যে আদি নিদর্শন চর্যাপদ আবিষ্কার করেন। শাস্ত্রী মশায়ের পূর্বে এ-সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহে প্রথম প্রবৃত্ত হন রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র। সম্ভবত তিনিই প্রথম নেপাল যাত্রা ক'রে সংস্কৃতে রচিত অনেকগুলি বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্যের পুঁথি প্রাপ্ত হন এবং ১৮৮২

খ্রীষ্টাব্দে Sanskrit Buddhist Literature in Nepal নাম দিয়ে সে সবের একটি তালিকাও প্রকাশ করেন।[১] রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পর তাঁরই পদাংক অনু-সরণ ক'রে নেপালে পুঁথি সংগ্রহের চেষ্টায় যান হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। শাস্ত্রী মশায়ের ইচ্ছাটা ছিল এই রকম—'নেপালে হিন্দু রাজার অধীনে বৌদ্ধধর্ম কিরূপে চলিতেছে দেখিতে যাইব'।[২] সে সময় শাস্ত্রী মশায় বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে পড়েছিলেন। যে ভারতে বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব সেই ভারতের মাটি থেকে বৌদ্ধধর্ম একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যাবে—এটি তাঁর কাছে অসম্ভব ঘটনা মনে হয়েছিল এবং এইটেই সম্ভাব্য ব্যাপার ব'লে তাঁর মনে হয়েছিল যে, নিশ্চয়ই কোন-না কোনো ছদ্মবেশে বৌদ্ধধর্ম এখানে আত্মগোপন ক'রে আছে। তিনি ধর্ম ঠাকুরকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ব'লে মনে করেছিলেন—'নানা কারণে আমার সংস্কার হইয়াছিল যে, ধর্মমঙ্গলের ধর্মঠাকুর বৌদ্ধ ধর্মের শেষ'।[৩] শাস্ত্রী মশায়ের এ সিদ্ধান্ত পরবর্তীকালে অসার প্রমাণিত হয়েছে, কিন্তু তাঁর অনুসন্ধিৎসা বিফলে যায়নি। তিনবার তিনি নেপালে যান, ১৮৯৭-৯৮ খ্রীষ্টাব্দে দুবার এবং শেষবার ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে। এই শেষবার তিনি আবিষ্কার করেন বাংলা সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ চর্যাপদ। '১৯০৭ সালে আবার নেপালে গিয়া আমি কয়েকখানি পুঁথি দেখিতে পাইলাম। একখানির নাম চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়, উহাতে কতকগুলি কীর্ত্তনের গান আছে ও তাহার সংস্কৃত টীকা আছে। গানগুলি বৈষ্ণবদের কীর্ত্তনের মত, গানের নাম চর্যাপদ।'[৪]

।। নামকরণ ।।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আবিষ্কৃত পুঁথির নাম 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়'। পুঁথির মধ্যে 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়' নাম যেমন আছে, তেমনি তার প্রথম বন্দনা শ্লোকে আছে—'শ্রীলূয়ীচরণাদিসিদ্ধরচিতেপ্যাশ্চর্য্যচর্য্যাচয়ে'··· । এখানে পাওয়া যাচ্ছে আশ্চর্য্য-চর্য্যাচয়' শব্দটি। এ থেকে বিধুশেখর শাস্ত্রী মনে করেন গ্রন্থের প্রকৃত নাম 'আশ্চর্য্যচর্য্যাচয়'।[৫] প্রবোধচন্দ্র বাগচী দুটি নামের কোনটিই গ্রহণ করেননি। তাঁর মতে প্রকৃত নমে হবে 'চর্য্যাশ্চর্য্যবিনিশ্চয়', লিপিকর ভুল করে 'চর্য্যাচর্য্য-বিনিশ্চয়' লিখেছেন।[৬] সুকুমার সেন এই মত সমর্থন করেছেন।[৭] তবে 'চর্য্যাচর্য্য-বিনিশ্চয়' শব্দটি যে লিপিকরের ভুল মাত্র—একথা তাঁরা কেউই প্রমাণ করেননি,

অনুমানের সাহায্যে বলেছেন মাত্র। মনীন্দ্র মোহন বসু যুক্তিসঙ্গতভাবেই লিখেছেন—'পুথিতে যে পাঠ রহিয়াছে তাহাতে যখন অর্থ-সঙ্গতি লক্ষিত হয় তখন কল্পনার সাহায্যে নামের পরিবর্তন করিবার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না।' তিনি অর্থ-সঙ্গতি দেখিয়েছেন এই ভাবে—'চর্য্য অর্থে আচরণীয় এবং অচর্য্য অর্থে অনাচারণীয়। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিধি নিষেধ লইয়া ঐ পদগুলি রচিত হইয়াছিল।'[৮]

অশ্চর্য্যচর্য্যাচয় অর্থ আশ্বর্য বা অদ্ভুত চর্যাসমূহ। শ্লোকটির পরবর্তী চরণ হচ্ছে—সদ্বর্ত্মা বগমায় নির্মলগিরাং টীকাং বিধাস্যে স্ফুটম্'। সমগ্র শ্লোকটির অর্থ—'শ্রীলুইপাদ প্রমুখ সিদ্ধাচার্য রচিত অদ্ভুত চর্যাসমূহে প্রবেশের সদ্বর্ত্ম নির্দেশ করবার জন্য নির্মলগিরা নামক টীকা রচনা করা হ'ল।'—এখানে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে—'আশ্চর্য শব্দটি 'চর্যাচয়' (=চর্যাসমূহ) শব্দের বিশেষণ। সেক্ষেত্রে 'আশ্চর্য্যচর্য্যাচয়'' শব্দটিকে সংকলনের নাম হিসেবে গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত ব'লে মনে হয়না। এ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে মণীন্দ্র মোহন বসু লিখেছেন—"অন্যত্র টীকাকার লিখিয়াছেন—সিদ্ধাচার্য্যশ্রীলুইপাদঃ প্রণিধিপ্রেরিতাবতারণার্থং কাঅতরুব্যাজেনসদ্ধর্ম্ম তাপীঠিকাং প্রাকৃতভাসয়া রচিয়িতুমাহ কায়েত্যাদি (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত 'বৌদ্ধগান ও দোহা'র ২য় পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য—সম্পাদক)। এখানেও সদ্ধর্ম্মতাপীঠিকা শব্দটি চর্য্যার সমনামরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। এজন্য চর্য্যাপদের পরিবর্তে ইহাদের 'সদ্ধর্ম্মতাপীঠিকা' নামকরণ করা সঙ্গত হইবে কি ?"[৯]

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ধারণা ছিল, তিনি চর্যাগীতি-সংগ্রহের মূল পুথিই (টীকা-সহ) আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু সকল পণ্ডিতই পরবর্তীকালে এ বিষয় এক-মত যে, শাস্ত্রী মশায়ের সংগৃহীত পুথিটি আসলে বৃত্তি বা টীকার। বৃত্তির সঙ্গে পাঠের সুবিধা বিবেচনা ক'রে মূল চর্যাগুলিও উদ্ধৃত হয়েছিল। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে, 'চর্য্যাচর্যবিনিশ্চয়' নামটি মূল চর্যা-সংগ্রহ গ্রন্থের নয়, সংস্কৃত টীকার। চর্য্যাগীতিগুলি সংকলিত হওয়ার পর সাধারণের সুবিধার্থে তার সংস্কৃত টীকা রচিত হয়েছিল। শাস্ত্রী-সংগৃহীত পুথির লিপিকর এক পুথি থেকে মূল গীতি এবং অন্য পুথি থেকে টীকা নকল করেছিলেন ব'লে মনে হয়।

তাহ'লে এখন প্রশ্ন দাঁড়ায়, মূল চর্যাসংকলন-গ্রন্থখানির নাম কী ছিল? পন্ডিতগণের অনুমান অনুসারে সেই নাম হচ্ছে 'চর্যাগীতিকোষ'। তিব্বতী অনুবাদ ও তেঙ্গুর-তালিকা[১০]এই অনুমানের সপক্ষেই সহায়তা করে।

।। মূল ও বৃত্তি।।

পূর্বেই বলেছি, মূল ও বৃত্তি ছিল প্রথমে পৃথক দুখানি গ্রন্থ। কোনো লিপিকর এদের একত্রে গ্রথিত করেন। এ কথা যে সত্য তার প্রমাণ পুঁথির মধ্যেই ছড়িয়ে আছে। দেখা যাচ্ছে, মূলের পাঠ ও টীকার পাঠ সর্বত্র মিলছেনা। এতে প্রমাণিত হয়, টীকাকার মূলের যে পুঁথি অনুসরণে টীকা রচনা করেছিলেন সেই পুঁথি লিপিকরের সামনে ছিল না। আর একটি ব্যাপারও সবিশেষ লক্ষণীয়। ১০ সংখ্যক চর্যার পর নেপালে প্রাপ্ত পুঁথিতে আছে—"লাড়ীডোম্বী-পাদনাম্ সুনেত্যাদি। চর্য্যায়া ব্যাখ্যা নাস্তি।" এখানে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে, এই পুঁথির লিপিকরের সামনে মূল চর্যাসমূহের যে পুঁথিটি ছিল তাতে এই খানে এমন একটি চর্যা ছিল যা টীকাকার ব্যাখ্যা করেন নি। তার মানেই টীকাকার মূলের যে পুঁথি অবলম্বনে টীকা রচনা করেছিলেন তাতে ঐ পদটি ছিলনা, কিন্তু লিপিকরের ব্যবহৃত পুঁথিতে পদটি ছিল। এইভাবে টীকাকরের অবলম্বিত পুঁথিতে চর্যাসংখ্যা ৫০; কিন্তু লিপিকরের পুঁথিতে চর্যা ছিল ৫১টি। তাই বলা যায়, মোট চর্যাসংখ্যা মূলে ৫০টি ছিল না, ছিল ৫১টি।

অতঃপর মূলের পাঠ ও বৃত্তিতে উদ্ধৃত পাঠের পার্থক্য দেখিয়ে একটি তালিকা দেওয়া যাচ্ছে—

চর্যা-সংখ্যা	চরণ	লিপিকরের মূল পাঠ	টিকাতে ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে উদ্ধৃত পাঠ
২	৯	অইসন	অইসনি
৬	৫	চচ্ছুপই	খন্ডই
৮	১	ভরিতী	ভরিলী
১২	১	পিহাড়ি	পিড়ি
১২	৯	দাহ	দায়
১৬	৯	গঅণাঙ্গন	গগনগঙ্গা
২০	৩	ফেটলিউ	ফিটলেসু

ভূমিকা

২০	৫	পহিল	পহিলে
২০	৭	জাণ জোবণ	নব যোবন
৩০	৩	উইত্তা	উইএ
৩০	৬	নিহুরে	নিহএ
৩১	৫	চান্দরে	চান্দেরি
৩১	৭	ছাড়িঅ	ছাড়িল
৩২	৭	পার উআরে°	পারোআরে
৩৩	২	হাড়ীত	হন্ডী (ত)
৩৩	৩	বেগ	বেঙ্গ
৩৩	৫	বলদ	বলদা
৩৩	৫	গবিআ	গাবী
৩৬	৮	ঘোরিঅ	ঘানিক
৩৮	৫	নৌবাহী	নৌবাঅ
৩৮	৭	বাটঅভয়	বাটত (ভয়)
৩৮	৯	খরে সোন্তে	খর–সোন্তে°
৩৯	১	সুইণা	সুইণে°
৩৯	৯	ভণন্তি	ভণ (ই)
৪০	৫	আলে	অলে°
৪০	৭	জে তই	তেজই
৪০	৮	বোধ	বোব
৪৫	৯	সু তরু	সুন তরুবর
৪৬	১	পেখু	পেখই
৪৭	৩	ডাহ	দাহ
৪৯	২	অদঅবঙ্গালে	অদ্বয়বঙ্গালে
৪৯	৪	চন্ডালী	চন্ডালে°
৪৯	৫	ডাহি জে।	দাহিঅ
৪৯	৭	সোণ তরুঅ	সোন রুঅ
৫০	৩	ছাড়ু	ছাড়
৫০	১১	ভাইলা	গড়িল

।। তিব্বতী অনুবাদ ।।

নেপালে প্রাপ্ত পুঁথির শেষের কয়েকখানা পাতা পাওয়া যায়নি ব'লে চর্যাগুলির টীকাকার কে তা জানা যায়না। তিব্বতী অনুবাদ আবিষ্কৃত হওয়ার পর জানা গেল, ঐ টীকা-রচয়িতার নাম মুনি দত্ত এবং তিব্বতী অনুবাদকের নাম কীর্তিচন্দ্র। তিব্বতী অনুবাদের সংবাদ প্রথম দিয়েছিলেন ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। তেঙ্গুর—তালিকা অনুধাবন ক'রেই তিনি এই অনুবাদ-গ্রন্থের আভাস পান। ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের ইঙ্গিত অনুসারে অনুসন্ধান চালিয়ে ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী এই তিব্বতী অনুবাদ গ্রন্থখানি সংগ্রহ করেন।

নেপালী পুঁথিতে কয়েকটি পাতা নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে সাড়ে তিনটি চর্যা (যথা :—২৩ সংখ্যক চর্যার অর্ধেক, ২৪, ২৫ ও ৪৮ সংখ্যক চর্যা।) পাওয়া যায়নি। কিন্তু তিব্বতী অনুবাদে সেগুলি পাওয়া গেল। সেই তিব্বতী অনুবাদ ও বৃত্তি অবলম্বনে ডঃ সুকুমার সেন তাঁর চর্যাগীতিপদা-বলীতে তাদের কল্পিত পাঠ স্থির করেছেন এইভাবে—

২৩ (শেষার্ধ)

কাএ অপণা ন তুটই মালা বি অহারেই
জাল অকাল বেণি বি লেই।।
জাল ন সিকল রে হরিণা এক বি বাসই
চঞ্চল চঞ্চল চলি রে সুণ মাঝেঁ সমাই।।

২৪

কাহ্ন

রাগ ইন্দ্রতাল

জইসে চান্দ উইআ হোই
চিঅরাজ তইসে সোহিঅই।
মোহমল গুরু-উএসে জাই
আঅত্তন ইন্দী গঅন সমাই।

খসম-বীঅ জা খসমে জাই
নিঅ রুথহু তিহুঅন ছাঅ বিছাই।
সুজ উএলা জিম রাতি পোহাই
ভবসমুদা মোহ তিম অবসরি জাই।
হংস-রাঅ জিম পানী লেই
ভব আহারি এহু কাহ্নে গাই।।

২৫

তান্তী

ধামহু পইঠা বাজঠাবি কহেই
কাল পাঞ্চ তান্তে সুধ কট বঅই।।
হাঁউ সে তান্তি সুতা অপনা
অপনে সুতের লকখন জানা।।
অধউঠ হাথ বেম পসরিউ ভুঅনে
গঅন পুরিল এহু কট বঅনে।।
অনহা বেমকট বয়ন থিরা
বেণবি তোড়ি জোড়িঅ দিঢ়া।।
বইঠা ম নিতি শুনত পাই
তন্ত্রী ছাড়ি বাজিল হোই।।

৪৮

কুক্কুরীপা

রাগ পটমঞ্জরী

কুলিশ-ভর-নিদ বিআপিল
সমতা জোএ মন্ডল সঅল।।
বিষয় ইন্দিপুর সব জিতেল
শুনরাঅ মহাসুহেং ভইল।।

তুর শাংখ ধনি অনহা গাজই
মোহ ভববল দুরে ভাজই।।
সুহ-নঅরীএ লই আগ ধাতি
আঙ্গুলি উভ তোলি কক্কুরী পা ভণথি।।
এ তৈলোএ মহসুহে' লইঅ
অথ নিনাদে' কুক্কুরীপাএ' কহিঅ।।

।। রচনাকাল ।।

চর্যাপদের রচনাকাল নিয়ে পন্ডিত সমাজে যথেষ্ট মতভেদ আছে। ডঃ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অনুমান করেন, এগুলির রচনাকাল দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে সীমাবদ্ধ।[১১] ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের এই মত কলকাতার সকল পন্ডিতই বিনা দ্বিধায় মেনে নিয়েছেন। কিন্তু কলকাতার বাইরে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এবং রাহুল সাংকৃত্যায়ন এ সম্পর্কে অন্য মত পোষণ করেন। রাহুল সাকৃত্যায়ন প্রমাণ করেছেন, লুইপাদ এবং সরহপাদ—এই দুজন প্রাচীন সিদ্ধাচার্য রাজা ধর্মপালের সময়ে (৭৬৯—৮০৯ খৃঃ) বর্তমান ছিলেন।[১২] ডঃ শহীদুল্লাহ্ প্রমাণ করেছেন, চর্যাপদে আনুমানিক ৬৫০ থেকে ১১০০ খৃীষ্টাব্দের ভাষালিপিবদ্ধ হয়েছে।[১৩]

ভাষা ও রচয়িতাদের সম্ভাব্য আবির্ভাব কাল ধ'রে চর্যাসমূহের রচনাকাল নির্ধারণের চেষ্টা হয়েছে। ভাষার কথা আলোচনা করতে গিয়ে সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মত দিয়েছেন যে চর্যার ভাষায় দ্বাদশ শতকের প্রাচীন বাংলা ভাষার রূপটি বিদ্যমান। তিনি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের-ভাষায় আদিমধ্য বাংলার যে রূপটি প্রত্যক্ষ করেছেন, চর্যার ভাষাকে তদপেক্ষা দেড়-শ বা দু-শ বৎসরের প্রাচীন হ'তে পারে ব'লে মনে করেছেন। শ্রী কৃষ্ণকীর্তনের ভাষাকে চতুর্দশ শতাব্দীর ধ'রে নিয়ে চর্যার ভাষাকে তাই স্থির করেছেন দ্বাদশ শতাব্দীর ব'লে। অবশ্য সব কটি চর্যাই দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত এ কথা তিনি বলছেন না, প্রাচীনতম চর্যাগুলির রচনাকাল দশম শতাব্দীর দিকে ব'লে তিনি স্বীকার করেন।

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এ মতের প্রতিবাদ ক'রে বলেন, বাংলা সাহিত্যের উৎপত্তিকাল সপ্তম শতক এবং 'বাঙ্গালা ভাষা ইহার অন্তত একশত বৎসর পূর্বের হইবে।' তিনি মৎস্যেন্দ্রনাথ প্রথম বাঙ্গালী কবি মনে করেন এবং প্রমাণ করেন যে, মৎস্যেন্দ্রনাথ সপ্তম শতকে জীবিত ছিলেন।[১৪] চর্যাপদে কিন্তু মৎস্যেন্দ্রনাথ একটি চর্যাও নেই, কেবল ২১ সংখ্যক চর্যার টীকায় মীননাথের এই চরণগুলি উদ্ধৃত হয়েছে—

কহন্তি গুরু পরমার্থের বাট
কর্ম্ম কুরঙ্গ সমাধিক পাট।
কমল বিকসিল কহিহ ণ জমরা
কমলমধু পিববি ধোকে ধোকে ন ভমরা।।

এই চরণগুলির ভাষা হচ্ছে প্রাচীন বাংলা। শহীদুল্লাহ্ সাহেব লিখেছেন— 'আমরা পদটিকে প্রাচীন বাংলা বলিয়াই গ্রহণ করিব।'[১৫] পদটির রচয়িতা মীননাথই নামান্তরে মৎস্যেন্দ্রনাথ। মৎস্যেন্দ্রনাথের সময় নিয়েও পন্ডিতদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়েছে। ডঃ সুনীতিকুমারের মতে মীননাথের শিষ্য গোরক্ষনাথ দ্বাদশ শতাব্দীর লোক, অতএব মীননাথও ঐ শতাব্দীর লোক হবেন।[১৬] অধ্যাপক নলিনীনাথ দাশগুপ্ত মৎস্যেন্দ্রনাথকে দশম শতাব্দীর শেষার্ধের লোক মনে করেন।[১৭] কিন্তু ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ নাথগীতিকার গোপীচাঁদ এবং চর্যাপদের লুইপাদের সময় আলোচনা ক'রে দেখিয়েছেন 'মৎস্যেন্দ্রনাথের সময় ৭ম শতকের পরে হইতে পারে না।[১৮] এছাড়াও, ডঃ শহীদুল্লাহ্ বিভিন্ন চর্যারচয়িতায় যে সম্ভাব্য সময়—সীমা নির্ধারণ করেছেন তাতেও দেখা যায় চর্যাগুলির রচনাকাল খৃষ্টীয় সপ্তম শতক থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই পড়ে। ডঃ শহীদুল্লাহ্ চর্যারচয়িতাদের যে আনুমানিক সময় স্থির করেছেন[১৯] তা হচ্ছে—

শবর পা—৬৮০ খৃীঃ থেকে ৭৬০ খৃীঃ
লুই পা—৭৩০ খৃীঃ থেকে ৮১০ খৃীঃ
বিরূপা—খৃীষ্টীয় অষ্টম শতক
কানু পা—খৃীষ্টীয় অষ্টম শতক

ডোম্বীপা—৭৯০ খ্রীঃ থেকে ৮৯০ খ্রীঃ
ভুসুকু—খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের মধ্যভাগ
কুক্কুরীপা – খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতক
কম্বলাম্বর—খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতক
আর্যদেব খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতক (কম্বলাম্বরের সমকালীন)
কঙ্কণ—খ্রীষ্টীয় অষ্টম-নবম শতক (কম্বলাম্বরের বংশজাত অথবা শিষ্য ?)
মহীধর—খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতক কানুপার শিষ্য)
ধর্ম্মপাদ—খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতক (কানুপার শিষ্য)
ভাদ্রপাদ—খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতক (কানুপার শিষ্য)
শান্তিপাদ—খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের প্রথমার্ধ
বীণাপাদ—খ্রীষ্টীয় নবম শতক।
দারিকপাদ—খ্রীষ্টীয় একাদশ শতক (?)
সরহ—খ্রীষ্টীয় একাদশ শতক।

॥ রচয়িতা ॥

চর্যাপদের মোট ৫০টি পদের ২৩ জন পদকর্তার নাম পাওয়া যায়। আরো একজন পদকর্তার নাম আছে, কিন্তু তার পদটি নেই। সেটি ধরলে চর্যার সংখ্যা দাঁড়ায় ৫১; এবং পদকর্তা ২৪ জন। এখানে পদকর্তাদের এবং তাঁদের রচিত পদগুলির একটা তালিকা এভাবে দাঁড় করানো যেতে পারে—

	পদকর্তা	মোট পদ	পদের ক্রমিক সংখ্যা
১।	আর্যদেব (আজদেব)	১	৩১
২।	কঙ্কণ (কঙ্কণপাদ)	১	৪৪
৩।	কম্বলাম্বর (কামলি)	১	৮
৪।	কাহ্নপাদ (কাহ্ন, কাহ্নি, কাহ্নিল, কৃষ্ণচার্য, কৃষ্ণবজ্রপাদ ইত্যাদি)	১৩	৭, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৮, ১৯, ২৪, *৩৬, ৪০, ৪২ ও ৪৫

৫।	কুক্কুরীপাদ (কুক্কুরী পা)	৩	২, ২০; ও ৪৮*
৬।	গুন্ডরীপাদ (গুন্ডরী)	১	৪
৭।	চাটিলপাদ (চাটিল্ল)	১	৫
৮।	জয়নন্দী (জঅনন্দি)	১	৪৬
৯।	ডোম্বীপাদ	১	১৪
১০।	ঢেন্ঢণপাদ (ঢেন্ঢণপা)	১	৩৩
১১।	তন্ত্রী (তান্তি)	১	২৫*
১২।	তাড়ক	১	৩৭
১৩।	দারিক (দারক)	১	৩৪
১৪।	ধামপাদ (ধম্মপাদ)	১	৪৭
১৫।	বিরুবাপাদ (বিরুপা, বিরুআ)	১	৩
১৬।	বীণাপাদ	১	১৭
১৭।	ভদ্রপাদ (ভাদে)	১	৩৫
১৮।	ভুসুকুপাদ (ভুসুকু)	৮	৬, ২১, ২৩, ২৭, ৩০ ৪১, ৪৩ ও ৪৯
১৯।	মহীধরপাদ (মহিণ্ডা, মহিন্ডা, মহিত্তা)	১	১৬
২০।	লুইপাদ (লুয়ীপাদ)	২	১, ২৯
২১।	লাড়ীডোম্বী (এ'র একটি পদের উল্লেখ আছে, কিন্তু পদটি নেই)		
২২।	শবরপাদ (সবর)	২	২৮, ৫০
২৩।	শান্তিপাদ (শান্তি)	২	১৫, ২৬
২৪।	সরহপাদ (সরহ)	৪	২২, ৩২, ৩৮ ও ৩৯

[* তারক চিহ্নিত পদগুলি পুথি খন্ডিত থাকার দরুণ পাওয়া যায়নি। ২৩ সংখ্যক চর্যাটি ঐ একই কারণে অর্ধেক পাওয়া গেছে।]

এই সকল পদকর্তার আনুমানিক আবির্ভাবকাল পূর্বেই আমরা লক্ষ্য করেছি। এ'দের অধিকাংশই বাঙালী ছিলেন। তবে কয়েকজন যে বাংলা দেশের অধিবাসী ছিলেন না তা সুনিশ্চিত। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এ'দের প্রায় প্রত্যেকে,

রচনার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা ক'রে দেখিয়েছেন—এ'রা কেউ কেউ বাংলার বাইরের অধিবাসী হ'লেও তাঁদের রচনা প্রাচীন বাংলা ছাড়া কিছুই নয়। এর কারণ সম্ভবত এই হ'তে পারে যে, এরা সকলেই মীননাথ প্রবর্তিত সহজযান (তান্ত্রিক বৌদ্ধ মত)-এর অনুসারী ছিলেন এবং মীননাথ ছিলেন বাঙালী ও বাংলাভাষার আদিম লেখক।[২০] সম্ভবত পরবর্তী সিদ্ধাচার্যরা আদি সিদ্ধাচার্যের ভাষাকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ ক'রে থাকবেন। সেকালে প্রাচীন বাংলার সঙ্গে পার্শ্ববর্তী অন্যান্য প্রদেশের ভাষার পার্থক্য খুব বেশী ছিল না বলে তাঁদের পক্ষে প্রাচীন বাংলায় পদ রচনা সহজেই সম্ভব ছিল।

এই পদকর্তাদের সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন—'কুক্কুরীপা ও ঢেন্ডণপা নাম দুইটিতে গুরুগৌরবসূচক "পা" থাকায় এই নামাঙ্কিত চর্যাগুলি সিদ্ধাচার্যদ্বয়ের অজ্ঞাতনামা ভক্তের রচনা বলিতে হয়। চাটিল ভনিতার চর্যাটিও তাঁহার কোন শিষ্যের—সম্ভবত ধামের রচনা। তাড়ক ও কঙ্কণ এ দুইটি চর্যাকর্তার নাম নয়, ছদ্মনাম অথবা উপাধি। তাড়, কাঁকণ, হার, মকুট প্রভৃতি ভূষণ উপহারযোগে সেকালে কবি-গুণীকে পুরস্কৃত করার রীতি ছিল। উপহার-প্রাপ্ত-ভূষণ-অনুসারে কবিরাও উপাধি বা নামান্তর ব্যবহার করিতেন। ডোম্বী ও তন্ত্রী জাতিবাচক নাম হইতে পারে। যেমন সম্ভবত দোহা-রচয়িতা তীল বা তীল্লো।...চাটিল নাম তিব্বতী ঐতিহ্যে একেবারে অজ্ঞাত। এই নামে চর্যাটি পাইয়াছি তাহা চাঠিলের রচনা হওয়া সম্ভব নয়, কেননা যত উচ্চস্তরের হোক না কেন কোন চর্যাকর্তাই নিজেকে অনুত্তর-স্বামী গুরু বলিয়া জাহির করিবেন না। সুতরাং গানটি চাটিলের কোন ভক্ত শিষ্যের রচনা, যিনি পারগামী লোককে চাটিলের উপদেশ লইতে আহ্বান করিয়াছেন। ধ্রুবপদে আছে - ধামার্থে চাটিল সান্কম গঢ়ই। ধামার্থে—কথাটির ব্যাখ্যা মুনিদত্ত করিয়াছেন—ধর্মার্থং স্বলক্ষণ ধারণাৎ ধর্মঃ ঘটপটস্তম্ভকুম্ভাদিভূতবিকারঃ। এ অর্থের কোন সঙ্গতি নাই। মনে হয় এখানে ধাম ব্যক্তিবিশেষের নাম, চাটিলের শিষ্য, মুখ্যত যাহার উত্তরণের জন্য চাটিল সাঁকো গড়িয়াছেন, সে সাঁকোয় আরো অনেকে স্বচ্ছন্দে ভবসাগর পার হইয়া যাইতে পারে। এই ব্যাখ্যা স্বীকার করিলে চর্যাটি ধর্মপাদের রচনা হয়।'[২১]

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আদি পদকর্তা হিসেবে লুইপার নাম উল্লেখ করেছেন। চর্যাপদের প্রথম চর্যাটি লুইপার। এতে মনে হ'তে পারে চর্যাগীতিকাগুলির সংগ্রাহক লুইয়ের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। সুকুমার সেন মনে করেন—'লুই অভিসময়ের বই লিখিয়াছিলেন। আর কোন চর্যাকর্তা বা বৌদ্ধ তান্ত্রিক সিদ্ধাচার্য বিশুদ্ধ বৌদ্ধ দর্শনের বই লিখেন নাই। এখানেও লুইয়ের প্রাচীনত্বের প্রমাণ।'

লুইপার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে কেউই সন্দেহ প্রকাশ করেন না। তবে অন্যবিধ প্রমাণের সাহায্যে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ দেখিয়েছেন শবরপা ছিলেন লুইপার গুরু এবং কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী।[২৩] তাই শবরপাকেই প্রথম রচয়িতা মনে করা যেতে পারে। তারপরই অবশ্য লুইপা।

সর্বশেষ চর্যা রচয়িতা কে বলা শক্ত। দারিকপাদ লুইপার শিষ্য ব'লে কথিত আছে। কিন্তু দারিকপাদ তিব্বতী ঐতিহ্য অনুসারে দীক্ষা-গ্রহণের পূর্বে ছিলেন রাজা ইন্দ্রপাল। আর ইন্দ্রপাল নামে একজন রাজা ছিলেন কামরূপে, ১০৩০ খ্রীঃ তিনি সিংহাসনে বসেন।[২৪] এই রাজা ইন্দ্রপালই যদি দারিকপাদ হন তবে তিনি লুইপার শিষ্য হ'তে পারেন না। লুইপার শিষ্য হ'তে গেলে তাঁর জীবনকাল অনেকখানি পূর্বের হয়ে পড়ে। অতএব দারিকপাদ সঠিক জীবনকাল নির্ধারণ করা শক্ত। সেই হিসেবে সরহ-পাদকেই আমরা শেষ চর্যারচয়িতা ব'লে মনে করতে পারি। তিনি কাম-রূপের রাজা রত্নপালের (১০০০–১০৩০ খ্রীঃ) দীক্ষাগুরু ছিলেন।

॥ তান্ত্রিক সাধনা ও চর্যাপদ ॥

চর্যাপদগুলি বৌদ্ধ সহজিয়াদের সাধন পদ্ধতিমূলক এক প্রকারের গান। কিন্তু যে ভাষায় ঐ সাধন পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে সহসা তা বুঝবার উপায় নেই। ঐ ভাষাকে তাই নাম দেওয়া হয়েছে সন্ধ্যাভাষা। সর্বত্রই একটা অস্পষ্টতা; কিছু বুঝা যায় কিছু বুঝা যায় না। সে জন্য অনেক টীকা-টিপ্পনী ও ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, চর্যাপদের মূল্য আমাদের কাছেই ঐ জাতীয় গূঢ় ধর্ম-কথার জন্য নয়। কেবল ভাষা ও সাহিত্যের প্রয়োজনেই চর্যাপদ আমাদের কাছে আদরণীয়। হরপ্রসাদ

শাস্ত্রী বলেছেন 'সন্ধ্যাভাষার মানে আলো আঁধারি ভাষা কতক আলো, কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায় না। অর্থাৎ এই সকল উঁচু অঙ্গের ধর্মকথার ভিতরে একটা অন্য ভাবের কথাও আছে। সেটা খুলিয়া ব্যাখ্যা করিবার নয়। যাঁহারা সাধন ভজন করেন, তাঁহারাই সে কথা বুঝিবেন, আমাদের বুঝিয়া কাজ নাই। আমরা সাহিত্যের কথা কহিতে আসিয়াছি, সাহিত্যের কথাই কহিব।'[২৫] —শাস্ত্রী মশায়ের এ দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে আমরা সম্পূর্ণ একমত। তবু এখানে কৌতূহলী পাঠকের জন্য সংক্ষেপে কিছু বলা যাচ্ছে।

'তন্ত্র বস্তুত কোনো দার্শনিক মত নয়, কতকগুলি আচারের সমষ্টি। সেই তন্ত্রাচার আদিতে হিন্দু বা বৌদ্ধ কোনো ধর্মের সঙ্গেই যুক্ত ছিলনা, হিন্দু-বৌদ্ধাদি ধর্মের সঙ্গে তার যোগ পরবর্তীকালের। মহাযানী বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে এইভাবে সংযুক্ত হয়ে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব হয়েছিল।

'Tantricism is neither Buddhist nor Hindu in origin: it seems to be a religious under current, ori ginally independent of any abstruse metaphysical speculation, flowing on from an obscure point of time in the religious history of India. With these practices and yogic proceesses, which characterise tantricism as a whole, different philosophical, or rather, theological systems got closely associated in defferent times, and the association of the practices with the fundamental idias of Mahayana Buddhism will explain the origin and development of Tantric Buddhism.' [২৬]

মহাযানী বৌদ্ধদের মতে শূন্যতা ও করুণার মিলনে বোধচিত্ত উৎপন্ন হয়, আর বোধিচিত্ত লাভের মধ্য দিয়ে উপনীত হওয়া যায় বোধিসত্ত্বাবস্থায়, তারপর ক্রমে বুদ্ধত্ব লাভ হয়। পার্থিব কোনো বস্তুর নিজস্ব কোনো স্বরূপ বা 'ধর্ম' নেই, সকলি অস্তিত্ববিহীন – এই জ্ঞানই হচ্ছে শূন্যতা-জ্ঞান। করুণা হচ্ছে সকল পার্থিব জীবনের মুক্তির জন্য আকুতি। শূন্যতা-জ্ঞানের সঙ্গে এই মুক্তির আকুতি মিশ্রিত হয়ে অভিন্ন ভাব প্রাপ্ত হ'লেই বোধিচিত্ত উৎপন্ন হয়। এই শূন্যতা ও করুণা বৌদ্ধসহজিয়াদের প্রজ্ঞা ও উপায়ে পরিণত হয়েছে এবং প্রজ্ঞা ও উপায়ের মিলিতাবস্থা হয়েছে একটি পরম সুখময় অদ্বয় অবস্থা—এই অবস্থাই মহাযানী বৌদ্ধদের বোধিচিত্ত। এই প্রজ্ঞা এবং উপায়ই পরবর্তী পর্যায়ে তন্ত্রশাস্ত্রের ইড়া-পিঙ্গলার সঙ্গে অভিন্ন হয়ে

গেছে এবং চন্দ্র-সূর্য, গঙ্গা-যমুনা, লালনা-রসনা, নাদ-বিন্দু, আলি-কালি প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত হয়েছে।

এক্ষণে তন্ত্রের সাধন-প্রণালী লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, একই ব্যাপার ভিন্ননামে সহজযানী বৌদ্ধদের মধ্যে রয়েছে। প্রথমে এই তান্ত্রিকদের মূল কথাগুলি জেনে নেওয়া প্রয়োজন। তান্ত্রিকদের মতো সত্য বিরাজিত আমাদের দেহের অভ্যন্তরে। এই দেহ যেন বিপুল বিশ্বব্রহ্মান্ডের প্রতিমূর্তি। বাইরের জগতের চন্দ্র-সূর্য, সুমেরু-কুমেরু, গঙ্গা-যমুনা প্রভৃতি যাবতীয় তত্ত্ব তান্ত্রিকরা দেহের মধ্যে দেখতে পান। দেহ তাদের কাছে ব্রহ্মান্ড। তান্ত্রিকদের মূল কথাটি হচ্ছে—'এই দেহই সত্যের মন্দির, সকল তত্ত্বের বাহন। ইহাকেই যন্ত্র করিয়া ইহার ভিতরেই সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া ইহার ভিতরেই শিব-শক্তির মিলন ঘটাইতে হইবে। নিজের ভিতরে এই শিব শক্তির মিলনের দ্বারা সত্য প্রতিষ্ঠা হইলেই বিশ্বব্রহ্মান্ডের ভিতর দিয়াও সেই সত্যকে উপলব্ধি করা সহজ হইবে। সাধককে তাই বিশ্বব্রহ্মান্ড হইতে ফিরিয়া আসিতে হইবে দেহভান্ডে, ইহাই তান্ত্রিক সাধনার প্রথম অঙ্গ।'[২৭]

তান্ত্রিকদের মতে দেহের মেরুদন্ড হচ্ছে মেরু পর্বত। এর উত্তরাংশ অর্থাৎ উধর্বভাগে রয়েছে সুমেরু এবং কুমেরু হচ্ছে সর্বনিম্নে। সুমেরুতে সহস্রার এবং কুমেরুতে মূলাধার চক্র অবস্থিত। মূলাধার চক্রে সার্ধ-ত্রিবলিত কুন্ডলীর মধ্যে কুলকুন্ডলিনীরূপিণী শক্তি সুষুপ্তা—এই নিদ্রিতা শক্তিকে যোগসাধনার দ্বারা জাগাতে হবে এবং সেই সাধনা বলে তাকে উধর্বাভিমুখে নিয়ে যেতে হবে—বিভিন্ন চক্র অতিক্রম ক'রে সহস্রারে শিবের সঙ্গে মিলন করাতে পারলেই সাধক অদ্বয়সত্য লাভ করবে। এখানে বিভিন্ন চক্র অর্থে মূলাধার ও সহস্রারের মধ্যবর্তী পাঁচটি চক্রের কথা বলা হচ্ছে। তান্ত্রিকগণ দেহের বিভিন্ন অংশে কয়েকটি চক্রের নির্দেশ করেছেন। যেমন গুহ্যদেশ ও জননেন্দ্রিয়ের মধ্যভাগে মূলাধার চক্র, জননেন্দ্রিয়ের মূলে স্বাধিষ্ঠান চক্র, নাভিতে মণিপুর চক্র, হৃদয়ে অনাহত চক্র, কন্ঠে বিশুদ্ধ চক্র, ভ্রূদ্বয়ের মধ্যেস্থলে, মতান্তরে তালুতে আজ্ঞা চক্র, পরিশেষে মস্তিষ্ক দেশে সহস্রার।

তান্ত্রিক কায়াসাধনার আর একটি দিক হচ্ছে, দেহের নাড়িকে সংযত ক'রে সাধনার পথে অগ্রসর হওয়া। বাম দিকের ইড়া নাড়ি এবং ডান

দিকের পিঙ্গলা নাড়ি যথাক্রমে শক্তি ও শিবরূপে কল্পিত হয়, এদের মধ্যবর্তী হচ্ছে সুষুম্না। এই ইড়া-পিঙ্গলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত অপান ও প্রাণ বায়ুকে যোগ-সাধনার দ্বারা সুষুম্নাতে এনে মিলিত করতে হবে। তারপর সেই সুষুম্না-পথে তাকে ঊর্ধ্বাভিমুখে পরিচালিত ক'রে সহস্রারে নিয়ে যেতে হবে। এখানেও যাত্রাপথে সেই ষট্‌চক্র অতিক্রম করার ব্যাপার আছে।

পূর্বেই আমরা বলেছি, মহাযানী বৌদ্ধদের শূন্যতা ও করুণা সহজযানী বৌদ্ধদের প্রজ্ঞা ও উপায়ে পরিণত হয়েছে। এই প্রজ্ঞা ও উপায়ই ললনা ও রসনা নাম নিয়ে পরবর্তী পর্যায়ে ইড়া-পিঙ্গলার সঙ্গে অভিন্ন হয়ে গেছে এবং বোধিচিত্ত অবধূতিকারূপে শেষ পর্যন্ত অভিন্ন কল্পিত হয়েছে সুষুম্নার সঙ্গে। এই ললনা-রসনা-অবধূতিকা নানা বিচিত্র রূপকে চর্যাপদে আত্ম-প্রকাশ করেছে দেখতে পাই। হিন্দু-তন্ত্রের অনুকরণে বৌদ্ধতন্ত্রেও চক্র কল্পিত হয়েছে—তবে এখানে চক্রসংখ্যা ছয় নয়, চার। এখানে প্রথমে নির্মাণ চক্র, তারপর যথাক্রমে ধর্মচক্র, সম্ভোগ চক্র ও মহাসুখ চক্র। হেবজ্রতন্ত্র অনুসারে জননেন্দ্রিয় থেকে নাভি পর্যন্ত স্থান হচ্ছে নির্মাণচক্র। হৃদয়ে ধর্মচক্র ও কণ্ঠে সম্ভোগ চক্র অবস্থিত। অতঃপর সর্বশীর্ষে মস্তকে স্থাপিত মহাসুখচক্র। তাহ'লে দেখতে পাচ্ছি, নির্মাণচক্র একই সঙ্গে হিন্দু-তন্ত্রের মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান ও মণিপুর—এই তিন চক্রে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। এই তিনটি চক্রই হচ্ছে প্রবৃত্তির রাজ্য। পরবর্তী অনাহত চক্র থেকেই নিবৃত্তির রাজ্য শুরু। বৌদ্ধতন্ত্র অনুসারেও, ললনা ও রসনার মিলনে যে বোধিচিত্ত উৎপন্ন হয়, নির্মাণকায়ে অবস্থান কালে সে হচ্ছে সংবৃত বোধিচিত্ত—এই বোধিচিত্তের স্বভাব চঞ্চল এবং নীচের দিকে ধাবিত হওয়ার প্রবণতা থাকে তার। যোগ-সাধনা বলে একে ঊর্ধ্বগামী করতে পারলে সে রূপান্তরিত হয় পারমার্থিক বোধিচিত্তে। এই পারমার্থিক বোধিচিত্তই চর্যাপদে সহজসুন্দরী, নৈরামণি, নৈরাত্মাদেবী প্রভৃতি নামে উল্লেখিত হয়েছে। আমরা প্রত্যেকটি পদের নীচে এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করেছি ব'লে এখানে সে সবের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

পাঠকের সুবিধার্থে তান্ত্রিকদের সাধনা-পদ্ধতি একটি রেখাচিত্রের সাহায্যে এখানে দেখানো হ'ল।

॥ তত্ত্ব দর্শন ॥

মণীন্দ্র মোহন বসু লিখেছেন 'চর্যার ধর্মতত্ত্ব প্রধানতঃ দার্শনিক মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত'।[২৮] কথাটি সম্পূর্ণ সত্য নয়। তবে এরকম ধারণায় উপনীত হওয়ার পেছনে কিছু কারণ আছে। কয়েকটি চর্যার পদকর্তাগণ তাঁদের বক্তব্য কোনো পারিভাষিক শব্দের সাহায্য ব্যতিরেকেই প্রকাশ করেছেন। ২৩ জন পদকর্তার মধ্যে মাত্র তিন জন পদকর্তাকে আমরা পাই যাঁরা তাঁদের পদে কোনো প্রকার পারিভাষিক শব্দ কিংবা আদি রসাত্মক রূপক ব্যবহার করেননি। সেখানে দর্শনের দিক থেকে তাঁদের পদের একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করানো যেতে পারে। কিন্তু অবশিষ্ট চর্যারচয়িতাগণ যে মূলতঃই তান্ত্রিক ছিলেন এবং তন্ত্র সাধনার কথাই প্রচার করেছেন তাতে সন্দেহ নেই। তন্ত্রের পারিভাষিক শব্দ আলি-কালি, এবং রবি-শশী, প্রভৃতির প্রয়োগ কারো দৃষ্টি এড়াবার নয়। এই সকল তান্ত্রিক পরিভাষার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মণীন্দ্র মোহন বসু লিখেছেন—'মহাযান-মত দার্শনিক তত্ত্বের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু পরবর্তী বজ্রযানে তান্ত্রিকতা প্রবেশ করিয়াছে। এইজন্য অধিকাংশ চর্যাতে দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা থাকিলেও প্রত্যক্ষ অনুভূতির জন্য মধ্যে মধ্যে তন্ত্র ও যোগের উল্লেখ রহিয়াছে।'[২৯] অর্থাৎ মণীন্দ্র মোহন বসুর মতে তন্ত্রের প্রভাবে চর্যাগুলিতে দু'চারটে পারিভাষিক শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে মাত্র, কিন্তু দার্শনিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত মহাযান মত এগুলিতে ঠিকই আছে।

এ কথার জবাবে ডঃ শশীভূষণ দাশগুপ্তের এই কথাগুলি স্মরণ করা যেতে পারে, 'বৌদ্ধ সহজিয়া বলিয়া যে সম্প্রদায়টি আমাদের নিকটে বিশেষ পরিচিত একটু বিচার বিশ্লেষণ করিলেই দেখিতে পাইব, ধর্মমত সম্বন্ধে তাঁহারা যতই শূন্যবাদী এবং বিজ্ঞানবাদী মহাযান বৌদ্ধদের মত কথা বলুননা কেন, মূলে তাঁহারা তান্ত্রিক।'[৩০]

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, চর্যাগুলির রচনাকাল কয়েক শতাব্দীতে পরিব্যাপ্ত। আর বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে যে তন্ত্রাচার অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে সেতো কোনো একটি বিশেষ দিনের ঘটনা নয়-দীর্ঘদিন ধ'রে ধীরে ধীরে তা হয়েছে। কথাটা কালের দিক থেকে যেমন সত্য ব্যক্তিবিশেষের দিক থেকেও তেমনি সত্য।

অতএব সকল রচনায় তান্ত্রিকতার প্রভাবে যে সমান হবে—এটি আশা করা যায় না। কিন্তু একটি কথা ঠিক যে, একই জাতের পদ না হ'লে চর্যাগীতি-কোষের মধ্যে তা সংকলিত হ'ত না। মতাদর্শ ও আচরণের দিক থেকে পৃথক পদগুলি একত্রে সংকলিত হবে—এটা সে যুগে আশা করা যায় না। তবে একটি কথা স্বীকার করতেই হবে যে, বশিকরণ, মারণ, উচ্চাটন প্রভৃতি তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ চর্যাপদে নেই। এটা না থাকার ব্যাখ্যা নানা ভাবে হ'তে পারে, কিন্তু ঐগুলির অভাবেই কেবল একথা বলা যায় না যে, চর্যাপদ মূলতঃই দর্শন-ভিত্তিক এবং এর রচয়িতারা তান্ত্রিক ছিলেন না।

॥ ভাষা প্রসঙ্গ ॥

চর্যাগীতির ভাষা বাংলা—এ কথা সকলেই যে একবাক্যে স্বীকার করেছেন এমন নয়। কিন্তু ভাষা বিচারের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করলে একে বাংলা ছাড়া আর কিছুই বলা যাবে না। এ কথা ঠিক যে, কোনো কোনো চর্যায় এমন কিছু শব্দ ও পদ পাওয়া যায় যা আসামী, উড়িয়া, বা হিন্দী ভাষার কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। কিন্তু সেই ধরনের দু'একটি বৈশিষ্ট্য দ্বারা সমগ্র রচনার জাতি-বিচার সঙ্গত নয়। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রমুখ পণ্ডিতগণ দেখিয়েছেন, চর্যাপদের ভাষা মূলতঃই বাংলা। তবে ডঃ শহীদুল্লাহ্ কেবল শান্তিপাদ ও আর্যদেব সম্পর্কে বলেছেন —তাঁদের ভাষা যথাক্রমে মৈথিলী ও উড়িয়া হ'তে পারে। কিন্তু অন্য সকল পদ-কর্তার ভাষা নিঃসন্দেহে বাংলা।

এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অনেকেই প্রতিবাদ জানিয়েছেন, কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিতে পারেননি। ডঃ সুকুমার সেন এ সম্পর্কে ভারি চমৎকার মন্তব্য করেছেন—"বাংলার প্রতিবেশীরা এখন চর্যাগীতি লইয়া রীতিমত মামলা বাধাইয়াছেন। হিন্দীভাষা, মৈথিলীভাষী, উড়িয়াভাষী,—ইহারা সবাই দাবী করিতেছেন যে, চর্যাগীতির ভাষা হিন্দী, মৈথিলী এবং উড়িয়া, মোটকথা বাংলা কিছুতেই নয়। এই দাবীদারেরা জানেন না, কিংবা জানিয়াও জানেন না যে, নবীন ভারতীয় আর্যভাষার প্রথম স্তরে সর্বত্র মোটামুটি মিল ছিল, এক আধটি শব্দ বা পদ লইয়া বিচার করিলে

প্রথম স্তরের যে কোন ভাষাকে অপর ভাষা বলিয়া দেখানো খুব সহজ। 'তেহনউ পিতা নগরি চালিউ আহীরহ' সরিসউ ঘী বিক্রয় করিবা কারণি'— প্রাচীণ গুজরাটী রচনা হইতে উদ্ধৃত এই বাক্য 'ঘী বিক্রয় করিবা' পদগুলি বিশুদ্ধ বাংলা, তাই বলিয়া কি সমস্ত বাক্যটিকে বা সমগ্র রচনাটিকে বাঙ্গালা বলিয়া দাবি করিব ?"[৩১]

এ ধরণের দাবির অযৌক্তিকতা প্রমাণ করবার জন্য ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ একবার কয়েকটি বিতর্ক উত্থাপন ক'রে একটি সুন্দর আলোচনার সূত্রপাত করেন। তিনি আলোচ্য বিষয়কে এই ভাবে সাজিয়েছিলেন—"(১) ইহা কোনও ভাষা নয়; একটি কৃত্রিম খিচুরি ভাষা। (২) ইহা অপভ্রংশ। (৩) ইহা হিন্দী। (৪) ইহা মৈথিলী। (৫) ইহা উড়িয়া। (৬) ইহা আসামী। (৭) ইহা বাঙ্গালা।"[৩২]—পরিশেষে সমস্ত বিষয় পর্যালোচনা ক'রে তিনি চর্যার ভাষাকে 'প্রাচীন বঙ্গ-কামরূপী ভাষা বলাই সঙ্গত, মনে করেছেন। সুকুমার সেনও বলেছেন—চর্যাপদের উপর অসমীয়াভাষীদের দাবি অযৌক্তিক নয়, কেননা ষোড়শ শতাব্দী অবধি দুই ভাষায় বিশেষ তফাৎ ছিলনা।'[৩৩]

চর্যাপদ বাংলা ভাষারই প্রাচীনতম নিদর্শন

চর্যাপদের মধ্যে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় যার দ্বারা বুঝা যায়, এগুলি বাংলা ভাষারই প্রাচীনতম নিদর্শন। বৈশিষ্ট্যগুলি একে একে উল্লেখ করা যাচ্ছে—

(১) 'ইল' প্রত্যয় যোগে অতীকালের ক্রিয়াপদ ও বিশেষণ; যথা- কানেট চোরে নিল (২), বাটত মিলিল মহসুহ (৮), মইল রঅণি (২৩), দুহিল দুধু (৩৩) ইত্যাদি।

(২) 'ইব' প্রত্যয় যোগে ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়াপদ; যথা—তো এ সম করিব মো সাঙ্গ (১০), মই ভাইব কীস (১৯), শাখি করিব জালন্ধরি পাএ (৩৬) ইত্যাদি।

(৩) 'ইয়া' 'ইলে' যোগে অসমাপিকা; যথা—মণিকুন্ডলে বহিআ অড়িআণে সমাই (৪), রাগ দেস মোহ লইআ ছার (১১), সাঙ্কমত চড়িলে··· (৫) ইত্যাদি।

(৪) ষষ্ঠীর চিহ্ন হিসেবে 'এর' ও 'র' বিভক্তির ব্যবহার; যথা—রুখের তেন্তলী (২), হরিণির নিলঅ (৬), ডোম্বী-এর সঙ্গে জো জই রত্ত (১৯) ইত্যাদি।

(৫) তৃতীয়ায় 'তে' (তে) বিভক্তি; যথা—সুখ দুখেতেঁ (১), সরুঅ বিআরেতেঁ (১৫) ইত্যাদি।

চতুর্থীতে 'রে' (র) বিভক্তি; যথা—সো করউ রস রসানেরে কংখা (২২) ইত্যাদি।

সপ্তমীতে 'ত' 'তে' (তেঁ), 'এ' বিভক্তি; যথা—দশমি দুআরত চিহ্ন দেখিআ (৩), বাটত মিলিল মহাসুহ (৮), দু আন্তে চিখিল মাঝেঁ ন থাহী (৫) ইত্যাদি।

(৬) কারকে বিভক্তির পরিবর্তে অনুসর্গের ব্যবহার; যেমন—করণ কারকে 'দিআঁ', 'সাঙ্গে'—চারি বাক্তে গাড়িলারে দিআঁ চঞ্চলী (৫০); দুক্‌জণ সাঙ্গে অবস মরি জাই (৩২)। অধিকরণ কারকে 'মাঝেঁ' ...গঙ্গা জউনা মাঝেঁ রে বহই নাঈ (১৪)।

(৭) আধুনিক বাংলায় যেমন শূন্য বিভক্তি একাধিক কারকে ব্যবহৃত হ'তে দেখা যায়, তেমনি চর্যাপদেও একাধিক কারকে শূন্য বিভক্তির ব্যবহার লক্ষণীয়। যথা—

কর্তৃকারকে—কাআ তরুবর পাঞ্চ বি ডাল (১)
কর্ম কারকে—দিঢ় করি মহাসুহ পরিমাণ (১)
করণ কারকে—বাঢ়ই সো-তরু সুভাসুভ পাণী (৪৫)
অধিকরণ কারকে—বেঢ়িল হাক পড়ই চৌদীস (৬)

(৮) থাকা অর্থে আছ্‌ এবং থাক্‌ ধাতুর ব্যবহার, যেমন—কাহেরে ঘেনি মেলি আছহু কীস (৬), গুরুবঅণবিহারেঁ রে থাকিব তই ঘুণ্ড কইসে (৩৯)।

(৯) বহুভাষণের (Periphrasis) সাহায্যে কর্মভাববাচ্যের অর্থ প্রকাশ, যেমন—দুলি দুহি পীঢ়া ধরণ ন জাই (২)

(১০) শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে এমন কয়েকটি বিশিষ্ট প্রয়োগ এখানে লক্ষ্য করা যায় যেগুলি বাংলা ছাড়া অন্যত্র দেখা যায় না। যেমন—ভান্তি ন বাসসি (১৫), কহণ ন জাই (২০), আহার কএলা (৩৫) ইত্যাদি।

(১১) আধুনিক বাংলার সন্ধির সূত্র চর্যাতেও প্রযুক্ত হ'তে দেখা যায়; যেমন—অজরামর (অজর+অমর), ভাবাভাব (ভাব+অভাব) ইত্যাদি।

(১২) আধুনিক বাংলার মতোই চর্যাতেও বহুত্ববাচক প্রত্যয়ের পরিবর্তে বহুত্ববোধক শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়; যেমন—সঅল সমাহিঅ (১), ছড়গই সঅল (৯) ইত্যাদি।

(১৩) একই শব্দ দুবার ব্যবহার ক'রে বহুবচনের অর্থ প্রকাশিত হয়েছে; যথা—উষ্চা উষ্চা পাবত (২৮)।

(১৪) প্রবচন জাতীয় শব্দ-সমষ্টি বিশেষভাবে বাংলার ঐতিহ্যকেই স্মরণ করিয়ে দেবে যথা—অপণা মাংসে' হরিণা বৈরী (৬), হাথেরে কাঙ্কন মা লোউ দাপণ (৩২), হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী (৩৩), বর সুণ গোহালী কি মো দুঠ বলদে' (৩৯) ইত্যাদি।

চর্যার ভাষায় অপভ্রংশের প্রভাব

উপরিউক্ত লক্ষণগুলি অনুধাবন করলে একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, চর্যাপদের ভাষা বাংলা ছাড়া কিছুই নয়। তবে এক্ষেত্রে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, অর্বাচীন অপভ্রংশের প্রভাবও চর্যার ভাষার কিছু কিছু রয়েছে। এই প্রভাবের দুটি কারণ নির্দেশ করা যেতে পারে।

প্রথমতঃ মনে রাখা প্রয়োজন যে, কোনো ভাষার পরিবর্তন একদিনে ঘটে না। অনেকদিন ধ'রে একটা ভাষার ধ্বনি ও প্রকাশ ভঙ্গিতে পরিবর্তন আসতে আসতে কালক্রমে তাকে অন্য ভাষায় রূপান্তরিত ক'রে দেয়। চর্যাগীতিসমূহ যে সময় রচিত হয় সে সময় বাংলা ভাষা অপভ্রংশের মৌলিকরূপ ত্যাগ করেছে বটে কিন্তু তার সঙ্গে একেবারে সম্পর্কচ্যুত হয়নি। ধীরে ধীরে কয়েক শতাব্দী ধ'রে

পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলা যখন অপভ্রংশ থেকে নবীন আর্য ভাষায় রূপান্তর লাভ করেছে তখনও তার নিজস্ব বৈশিষ্টসমূহের আশে পাশে ছিটে-ফোটা অপভ্রংশের প্রভাবও এই ভাষার উপর থেকে গিয়েছিল। চর্যাপদের উপর অপভ্রংশের প্রভাবের কারণও এইখানেই।

দ্বিতীয়তঃ সে সময় সংস্কৃতের পর সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী সাহিত্যিক ভাষা ছিল অপভ্রংশ। চর্যাপদকর্তাদের অনেকে আবার অপভ্রংশেও পদ রচনা করেছেন; এই কারণে তাঁদের বাংলা রচনাতেও অপভ্রংশের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এক্ষণে চর্যার ভাষায় অর্বাচীন অপভ্রংশের প্রভাব কিভাবে রয়েছে সেটা লক্ষ্য করা যাক—

(১) জসু, তসু, অইসন, জৈসন, জিম, তিম, কইসে, জইসোঁ প্রভৃতি শব্দে অপভ্রংশের স্মৃতি সুস্পষ্টরূপে বিজড়িত হয়ে রয়েছে।

(২) নিষেধার্থক অব্যয় 'মা' শব্দের ব্যবহার। যেমন—মা হোহি।

(৩) কৃচিৎ যুক্ত ব্যঞ্জনের উপস্থিতি; যেমন—অচ্ছিলে', চৌকোট্টি, সংপুন্না।

(৪) কর্তায় 'উ' বিভক্তি. যেমন- গতঃ>গও>গউ।

(৫) 'ইউ' দ্বারা অতীতকালের পদ নিষ্পাদন, যেমন—তোড়িউ।

(৬) '-মি' বিভক্তি যুক্ত উত্তম পুরুষের ক্রিয়া; যেমন—পীবমি, পুছমি।

(৭ জব, তব, কইস ইত্যাদি সর্বনামজাত ক্রিয়া-বিশেষণ।

(৮) মাত্রামূলক ছন্দ ও ছন্দের মাত্রামূলকতা (বিস্তৃত আলোচনার জন্য 'ছন্দ'-অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, অপভ্রংশের এইসব লক্ষণের ছিটে-ফোটা পরবর্তীকালে বড়ু চন্ডীদাসের রচনাতেও লক্ষ্য করা যায়, যেমন—'জৈসাণে রতি জাণিবোঁ তেসাণে কাহ্ন আনিবোঁ"।

এ ছাড়া 'ভণথি' ও 'বোলথি' -এই দুটি ক্রিয়াপদে মৈথিলী ভাষার প্রভাব লক্ষ্য করা যাবে। এ সম্পর্কে একজন সমালোচকের মন্তব্য এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য -'ইহা যদি ভণন্তি, বোলন্তি হইতে আগত না হয় তবে

নিতান্তই লিপিকর প্রমাদ; কারণ চর্যাপদগুলির অনুলিপি হইয়াছিল নেপালে, সেখানে মৈথিল ভাষার ব্যবহার ও চর্চা ছিল। সুতরাং এইরূপ দুই একটি মিশ্রণ খুবই স্বাভাবিক।"৩৪

চর্যাপদের ভাষার ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য

পূর্ববর্তী আলোচনাতেই চর্যাপদের ভাষার ব্যাকরণগত কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ্য করছি। এখানে অবশিষ্ট লক্ষণগুলি উল্লেখ করা যাচ্ছে।

(১) যুক্ত ব্যঞ্জন প্রাকৃতে সমীভূত হওয়ার পর চর্যায় এসে সরল হ'ল এবং তার পূর্ববর্তী হ্রস্বস্বর দীর্ঘ হ'ল। যথা জাম <জম্ম <জন্ম, ধাম <ধম্ম <ধর্ম্ম ইত্যাদি। অবশ্য অর্ধ-তৎসম শব্দে যুক্ত ব্যঞ্জন কোথাও কোথাও থেকে গেছে; যেমন—দুক্‌খ <দুঃক্ষ্য, মিচ্ছা <মিথ্যা ইত্যাদি।

(২) পদান্তের স্বরধ্বনি বজায় ছিল, তবে যুক্তস্বর 'ইঅ' ('ইআ') বহু ক্ষেত্রে ঈ ('ই')-কারে পরিণত হয়েছে; যেমন—ভণই <ভণতি, পোথী <পোথীআ>পুস্তিকা।

(৩) য়-শ্রুতি ও ব-শ্রুতি বিদ্যমান ছিল; যেমন নিয়ড়ী <নিকটে, আবই<আয়াতি।

(৪) বাংলায় শ-ষ-স, জ-য কিংবা ন-ণ—এর মধ্যে কোনো উচ্চারণ-বৈষম্য কিছু নেই। চর্যার আদর্শ পুথি লিখিত হবার সময় এই উচ্চারণ-পার্থক্য লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল ব'লে মনে হয়। সেজন্য বানানে এই সকল বর্ণ-ব্যবহারে কোনো সুস্পষ্ট নিয়ম মেনে চলা হয়নি। মন মণ দু'রকম বানানই পাওয়া যাচ্ছে। ৫০ সংখ্যক চর্যাতে শবরাশবরি, সবরো, ষবরালী প্রভৃতি বানান লক্ষ্য করা যায়।

(৫) হ্রস্বস্বর এবং দীর্ঘস্বর ব্যবহারের কোনো নিয়ম লক্ষিত হয় না—পণ্ড-পাণ্ড, উজু-উজূ প্রভৃতি বানান পাওয়া যাচ্ছে।

(৬) চর্যাপদের ভাষায় স্ত্রীলিঙ্গ-পুংলিঙ্গের পার্থক্য বহুক্ষেত্রে রক্ষিত হয়েছে, (আধুনিক বাংলায় এক বিশেষণ পদ ছাড়া অন্যত্র এ পার্থক্য দেখা যায় না)। উদাহরণ—

সাধারণ বিশেষণ—একেলী সবরী।
ক্রিয়াপদের লিঙ্গান্তর লাগেলী ডালী।
সম্বন্ধপদ বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হ'লে হাড়েরি মালী।

(৭) আধুনিক বাংলার মতো চর্যার ভাষাতেও দ্বিবচন পরিলক্ষিত হয় না; একবচন-বহুবচন ভেদে শব্দরূপের কোনো পার্থক্যও দেখা যায় না।

(৮) কারক-ভেদে বিভিন্ন বিভক্তির উদাহরণ—

কর্তৃকারকে—০(শূন্য), ও, এ। যথা- কাআ তরুবর (১); উমত সবরো গরুআ রোসেঁ (২৮), কুম্ভীরে খাই, চোরে নিল (২)।

কর্মকারকে—০ (শূন্য), এ, (এঁ), ক। যথা—দিঢ় করি মহাসুহ পরিমাণ (১), বিন্ধহ অরম ণিবাণেঁ (২৮), মতিএঁ ঠাকুরক পরিনিবিত্তা (১২)।

করণ কারকে—০ (শূন্য), এঁ (এ), ত, তেঁ। যথা- বাঢ়ই সো তরু সুভাসুভ পাণী (৪৫), একে সরসন্ধানেঁ বিন্ধহ (২৮), সহজে থির করি (৩), বাকলত পারুণী বান্ধই (৩), সুখদুখেতেঁ নিচিত মরিঅই (১)।

সম্প্রদান কারকে—কে, কু, রে (রেঁ)। যথা—কেঁ কি বাহবকে পারই (৮)। কাহারে ঘেনি মেলি (৬), মকুঁ ণঠা ৩৫)।

অপাদান কারকে—হু, হি, (ই), এ। যথা-খেপহুঁ জোইনি লেপন জাই (৪), জামে কাম কি কামে জাম (২২), বহুড়ী কাউহি (কাউই) ডর ভাই (২)।

অধিকরণ কারকে—০(শূন্য), অই, অহি, ই, এ, ত। যথা—বেঢ়িল হাক পড়ই চৌদীস (৬), দিবসহি (দিবসই) বহুড়ী কাউহি ডর ভাই (২), জো রথে চড়িলা (১৪), গীবত গুঞ্জরী মালী (২৮)।

সম্বন্ধপদে—আ, ক, এর, রি (এরি'রী), যথা—অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী (৬) সহজ পথক জোই (৩৭), মহামুদেরী টুটি গেলী কংখা (৩৭), ঢেণ্টণপাএর গীত (৩৩) হরিণির নিলঅ, হরিণার খর (৬)।

(৯) কাল অনুসারে ক্রিয়াপদের রূপ—

বর্তমান কাল : উত্তম পুরুষ—চাহমি, জাণমি, জীবমি, পুছমি, পেখমি, লেমি; আছহুঁ, করহুঁ, খেলহুঁ, জাণহুঁ, দেহুঁ, বিহরহুঁ, লেহুঁ, ইত্যাদি।

মধ্যম পুরুষ—আইসসি, আছসি, গিলেসি, জাসি, পুছসি, বাসসি, বুঝসি; ছেবহ, জাণ (জাণহ), বিষ্কহ, ভোল (ভুলহ) ইত্যাদি।

প্রথম পুরুষ - আবই, উঅজই, করেই, খাই, ছীজই, জাই, জাগই, জাণই, তিমই, তুটই, দাঢ়ই, দীসই, দেখই, পইসই, বুঝই, ভণই, মানই, সমাই, সোসই, ইত্যাদি; কহন্তি গান্তি, চাহন্তি, নাচন্তি, ভণন্তি, ভমন্তি ইত্যাদি; বোলথি, ভণথি।

অতীত কাল : উত্তম পুরুষ—আচ্ছিলোঁ, ভৈভিল, গাইল, দেখিল, বুঝিল, সমাইল ইত্যাদি।

মধ্যম পুরুষ—বইছিলেস, নিলেসি ইত্যাদি।

প্রথম পুরুষ—আইলা, গেলা, চড়িলা, চলিলা, পড়িলা, রঙ্গেলা, সুতেলা, মৌলিল, মিলিল, মেলিলী, লাগেলী, লেলী ইত্যাদি।

ভবিষ্যৎ কাল : 'ইব'-প্রত্যয়যুক্ত ভবিষ্যৎকালের রূপ সব পুরুষেই একই প্রকার। করিব, কহিব, খাইব, জাইব, থাকিব, দিবি, ভাইব, লোড়িব, হোইব ইত্যাদি।

অনুজ্ঞা : মধ্যম পুরুষ - কর জাহি' পেখ, বাহ, বাহহ, সিঞ্চহ, হোহি ইত্যাদি।

প্রথম পুরুষ করউ, জাইউ ইত্যাদি।

(১০) অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপ :

ই (ঈ), ইঅ, ইআ, যুক্ত—উঠি, উপাড়ী, করি, অরিঅ, গই চাপী, চুম্বী, ছাড়ী, থোই, ধুণি, ধরিআ, পুছিঅ, ফাড়িঅ,

ভণি মারি, লইআ ইত্যাদি। ইলে-যুক্ত—চড়িলে, বুঝিলে, ভইলে ইত্যাদি। অন্তে-যুক্ত—আছন্তে, চাহন্তে, পড়ন্তে, বুড়ন্তে, মুণন্তে ইত্যাদি।

(১১ সর্বনামের রূপ—

	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	প্রথম পুরুষ
কর্তৃকারকে	হাঁউ, আমহে, মই	তু, তঁই, তো, তুমহে	সে, তে, সো,
কর্মকারক	মো	তো, তোহোরে,	তা, সো
করণকারক	মই, মোএ	তোএ, তঁই	
সম্প্রদানে	মুকঁ	তোরেঁ	
সম্বন্ধ পদে	মোর, মোহোর	তোহোর, তোহোরি (স্ত্রী), তো	তসু, তা, তাহের
অধিকরণে			তহিঁ

(১২) সর্বনামজাত ক্রিয়া-বিশেষণের রূপ—

জবেঁ, জিম, তবেঁ, তিম।

(১৩) সংখ্যাবাচক শব্দগুলির রূপ—

এক, একু। দুই, দো, বেণি। তীনি (তিনি)। চউ। পাঞ্চ (পঞ্চ)। ছড়। দশ। বতীস। চউশঠী।

চর্যাপদের ভাষা কোন অঞ্চলের উপভাষা ?

সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় চর্যাপদের ভাষাকে পশ্চিম বঙ্গের উপভাষা মনে করেন। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এ কথার প্রতিবাদ ক'রে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন যে, এই ভাষাকে সঠিক ভাবে বলতে গেলে বাংলাদেশের কোনো এক অঞ্চলের উপভাষা মনে করা যায় না। একে "বৈজ্ঞানিকভাবে প্রাচীন বঙ্গ-কামরূপী ভাষা বলাই সঙ্গত" ব'লে তিনি মনে করেছেন।[২৫] আমরা ডঃ শহীদুল্লাহর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, কেবল শব্দ বিচার করে এই ভাষাকে কোনো একটি বিশেষ অঞ্চলের উপভাষা স্থির করতে গেলে ভ্রান্তির সম্ভাবনা খুবই বেশী। বড়ু চন্ডীদাসের রচনায় এমন কিছু কিছু বৈশিষ্ট লক্ষ্য করা যায় যা এখন পশ্চিম বঙ্গে নেই, কিন্তু পূর্ববঙ্গে রয়েছে।

এ রকম উদাহরণ মুকুন্দরাম থেকেও খুঁজে বের করা কঠিন নয়। এতে এইটুকু শুধু প্রমাণিত হয় যে, পশ্চিম বঙ্গের ভাষা যতো দ্রুত বদলে গেছে, তত দ্রুত পরিবর্তন পূর্ব বঙ্গের ভাষায় আসেনি। বাংলা ভাষার প্রাচীনরূপ কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য পূর্ব বঙ্গেই এখনো রয়ে গেছে। সুতরাং চর্যাপদের ভাষার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য পূর্ব বঙ্গের কথ্যভাষাতেই এখনো যদি তুলনামূলকভাবে বেশি লক্ষ্য করা যায় তবে সেইটেই হবে স্বাভাবিক ব্যাপার। তা দিয়ে পশ্চিম বঙ্গের দাবি নস্যাৎ করা যাবেনা। আবার অনুরূপ যুক্তিতেই, পশ্চিম বঙ্গের উপভাষার দু-একটি বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া গেলেই তাকে যে পশ্চিম বঙ্গের উপভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত বলে মনে করতে হবে এ কথাও ঠিক যুক্তি সম্মত নয়। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, চর্যাপদের রচয়িতাদের কেউ কেউ পূর্ব বঙ্গের অধিবাসী ছিলেন একথা যেমন সত্য, তেমনি কেউ কেউ পশ্চিম বঙ্গের অধিবাসীও যে ছিলেন তাও সত্য—এবং সবটা মিলিয়ে চর্যাপদে বাংলাদেশে প্রাচীন বাংলাভাষার নিদর্শন মাত্র। ভাষাবিজ্ঞানীর দৃষ্টিকোণ থেকে একে বলা যেতে পারে বঙ্গ-কামরূপী ভাষা।

চর্যার ভাষা কি সন্ধ্যা ভাষা ?

চর্যার ভাষাকে সন্ধ্যাভাষা বলা হয়েছে। আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি এই 'সন্ধ্যাভাষা' বলতে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মনে করেছিলেন—আলো আঁধারি ভাষা; কতক আলো, কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায় না⋯'। 'খানিক বুঝা যায় না' কথাটা সাধারণভাবে তন্ত্রধর্মে যারা বিশ্বাসী নয় তাদের জন্য প্রযোজ্য, কিন্তু তান্ত্রিকতায় যারা দীক্ষিত তাদের জন্য এ ভাষা তবে 'সন্ধ্যাভাষা' হ'তে যাবে কেন—তাদের কাছে তো এর সব কিছুই স্পষ্ট, বোধগম্য। বিধুশেখর শাস্ত্রী তাই 'সন্ধ্যাভাষা'র অন্য রকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে, সম্‌পূর্বক ধা ধাতু ও প্রত্যয় ক'রে 'সন্ধ্যা' হয়েছে—তিনি মনে করেন, 'সন্ধ্যা' বানান লিপিকর প্রমাদ।[৩৬] ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচীও বিধুশেখর শাস্ত্রীর এই মত সমর্থন করেন।[৩৭] এই-ভাবে ব্যুৎপত্তি নির্ধারণ করলে 'সন্ধ্যা' শব্দের অর্থ দাঁড়াবে—অভীষ্ট, উদ্দিষ্ট, আভিপ্রায়িক বচন। অর্থাৎ এই চর্যাসমূহ, সাধারণ অর্থে নয়,

এমন এক অভীষ্ট অর্থে প্রযুক্ত যে কেবল তন্ত্রসাধকগণই এর মর্ম অনুধাবন করতে পারবেন। যুক্তির দিক থেকে এ-কথা মেনে নিলে কোনো ক্ষতি নেই। কেননা "অভীষ্ট শব্দটির মধ্যেও 'আপাত লক্ষ্য নহে' এরূপ একটি ইঙ্গিত আছে—তাহা হইতেই অস্পষ্টতার ভাবটি আসিয়াছে এবং তাহার প্রভাব অর্থ-সাদৃশ্যে বানানটিও সন্ধা হইতে সন্ধ্যাতে পরিণত হইয়াছে—ইহাও অসম্ভব নহে"[৩৮] ডঃ নীহার রঞ্জন রায় লিখেছেন—"সে ভাষার নাম ছিল সন্ধাভাষা (সন্ধিভাষা), যে ভাষা শুধু 'মৌলিক' 'সম্পূর্ণ' 'নিগূঢ়' সত্যের কথা বলে, কিন্তু যতো মৌলিক, সম্পূর্ণ নিগূঢ়ই হোক না কেন সে ভাষা, অদীক্ষিত জনের কাছে তাহা ছিল দুর্বোধ্য। এ-ভাষায় যাহা 'অভিপ্রায়িক' অর্থাৎ আপাত যে অর্থ কোনো বাক্যের বা পদের, তাহাই তাহার নিগূঢ় অর্থাৎ মৌলিক, সম্পূর্ণ অর্থ নয়; মৌলিক, সম্পূর্ণ, উদ্দিষ্ট অর্থের দিকে তাহা ইঙ্গিত করে মাত্র। কাজেই, সে ভাষার মৌলিক উদ্দিষ্ট অর্থ ধরিতে পারা সহজ নয়"[৩৯]—অর্থাৎ ডঃ রায়ও এ ভাষাকে সন্ধ্যাভাষা না ব'লে সন্ধাভাষা (বসন্ধিভাষা) বলতে চান। কিন্তু একটি কথা মনে রাখার প্রয়োজন আছে যে, তন্ত্র বিষয়ক প্রাচীন পুথিতে 'সন্ধ্যাভাষা' শব্দটিই সর্বত্র পাওয়া যায় 'সন্ধাভাষা' নয়; "অনেক প্রাচীন পুথিতে 'সন্ধ্যাভাষাই' পাওয়া যায়; সবগুলিই যে লিপিকরপ্রমাদ তাহা মনে হয় না।"[৪০]

কেউ কেউ বলেন 'সন্ধ্যা' শব্দটি 'সন্ধ্যাদেশ' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ১৯৪২ সালে Visvabharati Quarterly-তে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন যে, 'সন্ধ্যাভাষা'র অর্থ—'সন্ধ্যা' দেশের ভাষা। সন্ধ্য—অর্থাৎ আর্যাবর্ত এবং পূর্ব ভারতের মধ্যবর্তী অঞ্চল।"[৪১] কিন্তু এ ব্যাখ্যা কেহই মানেননি। 'সন্ধ্যা' শব্দ যে দেশ-বাচক এমন কোনো সন্তোষজনক প্রমাণ কেউ দিতে পারেননি। পক্ষান্তরে তিব্বতী ভাষায় শব্দটি। 'প্রহেলিকাপূর্ণ ভাষ, কথিত দুরূহ তত্ত্বব্যাখ্যা'—অর্থে গৃহীত হয়েছে।

এখানে চর্যাগীতিসমূহে ব্যবহৃত কয়েকটি শব্দের সাধারণ অর্থ ও সন্ধ্যা অর্থ পাশাপাশি দেখানো যেতে পারে—

মূলশব্দ	সাধারণ অর্থ	সন্ধ্যা অর্থ
আলি-কালি	স্বরবর্ণ-ব্যঞ্জনবর্ণ	প্রশ্বাস-নিঃশ্বাস
গঙ্গা	একটি নদী	গ্রাহ্য
চউসট্‌ঠি কোঠা	দাবার ছকের ৬৪ ঘর	নির্মাণচক্র
চান্দ	চাঁদ	প্রজ্ঞাজ্ঞান বা গ্রাহ্যভাব
ডোম্বী	ডুমনী	নৈরাত্মা, শুক্রনাড়িকা
নাবী	নৌকা	বোধিচিত্ত
পুলিন্দা	মাস্তুল	নিরুপাধিত্ব (বা নপুংসক)
বড়িআ	দাবার বোড়ে	একশো ষাট প্রকৃতি
বামহ	ব্রহ্মা	বিটনাড়িকা, বিষ্ঠানাড়ী
মূসা	মূষিক	চিত্তপবন
যমুনা	একটি নদী	গ্রাহক
সবর	শবর-পুরুষ	বজ্রধর, হেরুক
সবরী	সবর-স্ত্রীলোক	নৈরাত্মা
সসহর	শশধর, চন্দ্র	শুক্র
সুজ্জ	সূর্য	অদ্বয়জ্ঞান গ্রাহকভাব
হর	শিব	শুক্রনাড়ী
হরি	বিষ্ণু	মূত্রনাড়ী
হরিণ	হরিণ	চিত্ত
হরিণী	হরিণী	নৈরাত্মা

।। ছন্দ ।।

প্রায় সকল পণ্ডিতই চর্যাপদের মধ্যে পজ্ঝটিকা ছন্দের প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। শার্ঙ্গদেব রচিত 'সঙ্গীতরত্নাকর' নামক সঙ্গীতশাস্ত্রেও চর্যাপদ সম্পর্কে বলা হয়েছে—'পদ্ধড়ী প্রভৃতিচ্ছন্দাঃ পদান্ত প্রাস শোভিতাঃ'।[৪২] এখানে 'পদ্ধড়ী' শব্দের দ্বারা সংস্কৃত পজ্ঝটিকা ছন্দের কথাই বুঝানো হয়েছে। তবে 'প্রভৃতিচ্ছন্দা' বলতে বুঝা যায় এর মধ্যে অন্য ছন্দও যে ছিল সে সম্পর্কেও 'সঙ্গীতরত্নাকর'-রচয়িতা সচেতন ছিলেন।

'পজ্ঝটিকা' ছন্দে প্রতি চরণ ১৬-মাত্রাবিশিষ্ট হয় প্রতি চরণে চার পদ প্রতি পর্বে চার মাত্রা। প্রকৃতপৈঙ্গলে বর্ণিত পাদাকুলক' ছন্দেরও বৈশিষ্ট্য একই প্রকার ঃ অর্থাৎ সেখানেও প্রতি চরণ ১৬ মাত্রাবিশিষ্ট এবং পর্বগুলি ৪ মাত্রার। আমরা একটি ক'রে পজ্ঝটিকা ও পাদাকুলক ছন্দের উদাহরণ তুলে ধরছি—

v v _ v v v v v v v v v v _

সংস্কৃত পজ্ঝটিকা— নলিনী/দলগত/জলমতি/তরলং

_ _ _ v v v v v v v v _

তদ্ব/জ্জীবন/মতিশয়/চপলম্

_ v v v v v v _ v v _ v v

প্রাকৃত পাদাকুলক— সো জণ/জণমউ/সো গুণ/মন্তউ

_ v v v v v v _ v v _ v v

জে কর/পর-উব/আর হ/সন্তউ

চর্যার ছন্দে এদের প্রভাব আছে। তবে এদের ছন্দে হ্রস্বস্বর ও দীর্ঘস্বরের মাত্রা-গণনার যে সুনির্দিষ্ট নিয়ম আছে চর্যার ছন্দে তা নেই। সেখানে দীর্ঘস্বর কখনো দু-মাত্রা কখনো এক মাত্রাবিশিষ্ট। অনুরূপভাবে হ্রস্বস্বরকেও কোনো কোনো স্থলে টেনে দু'মাত্রা ক'রে নিতে হয়।

_ v v v v v v v v v v _ _

আঙ্গন/ঘর পণ/সুন ভো বি / আতী

_ v v _ _ v v v v _ _

কানেট/চোরে / নিল অধ / রাতী।

v v _ v v v v v v _ _ v v

সসুরা/ নিদ গেল/ বহুড়ী/জাগই

_ v v v v v v _ v v _ v v

কানেট/ চোরে নিল/ কাগই/ মাগই।।

লক্ষ্য করা যাবে, এখানে স্বরের মাত্রা গণনার ক্ষেত্রে কোনো সুনির্ধারিত নীতি অনসৃত হচ্ছে না। দ্বিতীয় চরণে 'চোরে' ৪ মাত্রা, কিন্তু চতুর্থ চরণে তা দু'মাত্রা; প্রথম চরণে 'ভো' একমাত্রা। আবার—

রাতি/ভইলে/কামরু/জাই

এই চরণে হ্রস্ব স্বরকেও টেনে দু'মাত্রার ক'রে নেওয়া হয়েছে। এরকম উদাহরণ চর্যার যত্রতত্র পাওয়া যাবে।

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, চর্যাপদের ছন্দ মূলতঃ মাত্রাবৃত্তরীতিতে গঠিত; কিন্তু একালের মাত্রাবৃত্ত ছন্দের সুনির্দিষ্ট গণনা-পদ্ধতি এখানে মেনে চলা হয়নি। পণ্ডিতগণের ধারণা—এই ছন্দই পরিবর্তিত হয়ে মধ্যযুগে পয়ার ছন্দের উদ্ভব হয়েছিল। কথাটা স্বীকার ক'রে নেবার পশ্চাতে একটা যুক্তি আছে এই যে, চর্যাপদেই বহুস্থলে ছন্দ যেন মধ্যযুগের পয়ারের রূপ পেতে চেয়েছে।—

কমল কুলিশ ঘাণ্টি/করহু বিআলী

অথবা

তরঙ্গেতে' হরিণার/খুর ন দীসই

অথবা

অবণাগবণে কাহ্ন/বিমণা ভইল।

অথবা

আলো ডোম্বি তোএ সম/করিব মো সাঙ্গ

উপরের চরণগুলি বিশুদ্ধ পয়ার। কিন্তু তা ছাড়াও ক্ষেত্র বিশেষে স্বরকে দীর্ঘ ক'রে নিলে চর্যাপদের অধিকাংশ পদই পয়ারের সগোত্রীয় হয়ে পড়ে।—

কাআ তরুবর/পাঞ্চ বি ডাল
চঞ্চল চীএ/পইঠা কাল
দিঢ় করিঅ মহা/সুহ পরিমাণ
লুই ভণই গুরু/পুছি অ জান

চর্যাগুলি গানরূপে গাওয়া হ'ত ব'লে এখানে স্বরের হ্রস্ব-দীর্ঘ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট নিয়ম রক্ষিত হয়নি। কিন্তু পরবর্তীকালে, সঙ্গীতে নয়, পদ্যে যখন এই ছন্দ ব্যবহৃত হ'তে লাগল তখন বাঙালীর স্বাভাবিক উচ্চারণ-ভঙ্গি জয়যুক্ত হয়ে কোনো স্বরই আর দীর্ঘ রইল না। তবে যেহেতু সাধারণ পদ্যও সুরে পড়া হ'ত এবং সেই সুর চরণের শেষে টানা হয়ে দীর্ঘ হয়ে যেত সেজন্য পয়ারের শেষার্ধে আট মাত্রার পরিবর্তে ক'মে ছ-মাত্রার হয়ে গেল—শেষের টানা সুরেস দু-মাত্রার ক্ষতিপূরণ হ'ত। এইভাবেই পয়ারের উদ্ভব।

ষোলো মাত্রার ছন্দের পরেই চর্যাপদে বেশি পাওয়া যায় ছাব্বিশ মাত্রার ছন্দ। তবে কোথাও কোথাও দু-মাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে তা ২৮ হয়েছে, কোথাও বা দু-মাত্রা ক'মে তা হয়েছে ২৪।—

– – – – –∨∨ – – ∨∨–∨ ∨– ––

উষ্চা উষ্চা / পাবত তহিঁ / বসই সবরী / বালী

∨–∨ –∨ ∨∨∨∨∨∨– –∨∨–∨∨ –

মোরঙ্গি পীচ্ছ / পরিহাণ সবরী/গীবত গুঞ্জরী/মালী ৮+৮+৮+৪

এই ছন্দের সঙ্গে 'মরহট্টা' ছন্দের সাদৃশ্য তুলনীয়—

কিন্তো মন্তে/কিন্তে তন্তে/কিন্তোরে ঝাণব/খাণে

২৬ মাত্রার পদ—

– – –∨∨ –∨∨–∨∨ – ∨∨∨∨∨∨∨∨

সুনা পন্হর / উহ ন দীসই / ভান্তি ন বাসসি জাঅন্তে

–∨∨∨∨ – –∨∨ ∨∨∨∨–∨

এথা আঠ মহা / সিদ্ধি সীঝই / উজু বাট জাঅন্তে ৮+৮+১০

২৪ মাত্রার পদ—

∨∨∨∨ ∨∨∨∨ ∨∨– –– ––– ∨––

গঅণত গঅণত / তইলা বাড়ী / হিএ কুরাড়ী ৮+৮+৮

এই সকল দীর্ঘ মাত্রাবিশিষ্ট পদই পরবর্তীকালে ত্রিপদী ছন্দে রূপান্তরিত হয়েছিল ব'লে মনে হয়।—

উষ্চা উষ্চা পাবত তহিঁ
বসই সবরী বালী।

অথবা

সুনা পন্হর উহ ন দীসই
ভান্তি ন বাসসি জাঅন্তে।

॥ প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্র, চর্যাগীতি ও রাগরাগিণী ॥

শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র তাঁর 'বাংলার সঙ্গীত' (১ম) গ্রন্থে সঙ্গীতরূপে চর্যাপদের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেছেন। প্রাচীন বাংলার দুখানি সংগীতগ্রন্থ হচ্ছে লোচন পন্ডিতের 'রাগতরঙ্গিনী' এবং শার্ঙ্গদেবের 'সঙ্গীতরত্নাকর' (১২১০—৪৭)। 'সঙ্গীতরত্নাকরে' সঙ্গীত হিসেবে চর্যাগীতির বৈশিষ্ট এবং

তার গঠন পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যায়। কেবল এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, একালের কীর্তন ইত্যাদি গানের মতো চর্যাগীতিও এককালে অশেষ জনপ্রিয় ছিল।

'সঙ্গীতরত্নাকর' থেকে জানা যাচ্ছে, এ কালের গানের অস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী এবং আভোগ—এই চার কলির পরিবর্তে সেকালে ছিল উদ্‌গ্রাহ, মেলাপক, ধ্রুব ও আভোগ; এদের বলা হ'ত ধাতু। এই চার ধাতুই যে সব গানে থাকত তা নয়। তবে উদ্‌গ্রাহ এবং ধ্রুব সর্বত্রই থাকত। কোথাও আভোগ, এবং ক্বচিৎ কোথাও মেলাপক ও আভোগ—একত্রে বর্জিত হ'ত। এইভাবে একটি ধাতু বর্জিত হ'লে সে সঙ্গীতকে বলা হ'ত ত্রিধাতুক প্রবন্ধ-গীত, দুটি ধাতু বর্জিত হ'লে তার নাম হ'ত দ্বিধাতুক প্রবন্ধ-গীত। সাধারণ-ভাবেই সঙ্গীতকে তখন প্রবন্ধ-গীত বলা হ'ত। চর্যাপদগুলি মেলাপক বর্জিত, সেই হিসেবে চর্যাপদ ত্রিধাতুক প্রবন্ধগীত।

পূর্বেই ছন্দের আলোচনা-প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি, শার্ঙ্গদেব ছন্দ সম্পর্কে বলতে গিয়ে এগুলিকে 'পাদান্তপ্রাস শোভিতাঃ' বলেছেন। আধুনিক বাংলা গানের চরণও সাধারণতঃ অন্ত্যানুপ্রাসযুক্ত হয়। চর্যাগীতিগুলিও এমনি অন্ত্যানুপ্রাসযুক্ত ছন্দোবদ্ধ চরণ দ্বারা গঠিত। তবে চর্যাগীতির ছন্দ যে যথেষ্ট শৈথিল্যপূর্ণ শার্ঙ্গদেব তা লক্ষ করেছিলেন। এজন্য তিনি এগুলিকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছিলেন—পূর্ণ, অপূর্ণ। ছন্দে শৈথিল্য থাকলে তা হ'ত অপূর্ণ না থাকলে পূর্ণ।

রাজ্যেশ্বর মিত্রের আলোচনা থেকে আরো জানা যায়, সেকালের প্রবন্ধগীতের ছ'টি অঙ্গ থাকত—স্বর, বিরুদ, পদ, তেনক, পাটক ও তাল। এই ছ'টি অঙ্গের সব কটিই যে একটি গানে থাকতে হবে এমন কোনো কথা ছিল না। চর্যাগীতিতে সাধারণতঃ দুটি অঙ্গ লক্ষ করা যায়—পদ ও তাল। এ জন্য চর্যাগীতিকে 'তারাবলী' বলা হত।

চর্যাগীতিসমূহ বিভিন্ন রাগে গাওয়া হ'ত। প্রত্যেকটি গানের প্রথমেই কোন রাগে তা গাওয়া হবে তার নির্দেশ আছে। তন্মধ্যে 'পটমঞ্জরী' যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ছিল তা বুঝা যায় চর্যাগীতিতে এর সর্বাধিক ব্যবহার

দেখে। মোট ১২টি গানের রাগ পটমঞ্জরী—গীত সংখ্যা :—১, ৬, ৭, ৯; ১১, ১৭, ২০, ২৯, ৩১, ৩৩, ৩৬, ৪৮। মল্লারী—৫টি; গীত সংখ্যা :—৩০, ৩৫, ৪৪, ৪৯। গুঞ্জরী (গুর্জরী বা কাহ্নু-গুর্জরী)—৪টি; গীত সংখ্যা : —৫, ২২, ৪১, ৪৭। কামোদ—৪টি; গীত-সংখ্যা :—১৩, ২৭, ৩৭, ৪২। বরাড়ী (বলাড্ডী)—৪টি; গীত-সংখ্যা :—২১, ২৩, ২৮, ৩৪। ভৈরবী—৪টি; গীত-সংখ্যা :—১২, ১৬, ১৯, ৩৮। গবড়া (গউড়া)—৩টি; গীত-সংখ্যা :—২, ৩, ১৮। দেশাখ—২টি; গীত-সংখ্যা :—১০, ৩২। রামক্রী—২টি; গীত-সংখ্যা :—১৫, ৫০। শবরী—২টি; গীত-সংখ্যা :—২৬, ৪৬। অরু, ইন্দ্রতাল, দেবক্রী, ধনসী (ধানশ্রী), মালসী, মালসী-গবুড়া ও বঙ্গাল রাগে একটি ক'রে গীত, তাদের সংখ্যা যথাক্রমে—৪, ২৪, ৮, ১৪, ৩৯, ৪০ ও ৪৩।

এই সব রাগের কয়েকটি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে' এবং বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যে লক্ষ করা যায়। রামক্রী গীতগোবিন্দে হয়েছে রামকিরী এবং বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যে রামগিরি। দেশাখরাগ গীতগোবিন্দে ও বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যে হয়েছে দেশাগ। বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যের ধানুষী ধানশ্রীর পরিবর্তিত রূপ মাত্র। মল্লারী রাগ মল্লার নামে আজও সুপরিচিত। কৃষ্ণলীলায় প্রচলিত গুর্জরী রাগই চর্যাতে সম্ভবত কাহ্নু-গুর্জরী। গবড়া (গউড়া) রাগ সম্পর্কে দুটি অনুমান করা হয়েছে—লোচন পণ্ডিত তাঁর 'রাগতরঙ্গিনী' গ্রন্থে গোরী রাগ নামে একটি রাগের উল্লেখ করেছেন, সেই গোরী শব্দের পরিবর্তিত রূপ গউড়া বা গবড়া হ'তে পারে; কিংবা এমনও হ'তে পারে যে, সেকালে কাব্যে যেমন গৌড়ী-রীতি ব'লে একটি বিশিষ্ট রীতির উল্লেখ পাই, তেমনি রাগের মধ্যেও হয়ত একটি ছিল গৌড়ী রাগ—গউড়া বা গবড়া সেই গৌড়ী শব্দের পরিবর্তিত রূপ। কিন্তু এ সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু বলা যায় না। চর্যাগীতির রাগ-সম্পর্কিত আলোচনায় ডঃ নীহার রঞ্জন রায়ের বক্তব্য তাঁর ভাষাতেই আমরা তুলে ধরছি—"সঙ্গীতেতিহাসের দিক হইতে চর্যাগীতির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রাগ শবরী ও বঙ্গাল-রাগ। শবরী রাগ তো নিঃসন্দেহে শবরদের মধ্যে প্রচলিত রাগ। এই লোকায়ত রাগটির মার্গীকরণ কবে হইয়াছিল বলা কঠিন. তবে ইহার উল্লেখ শুধু চর্যাগীতিতেই পাই-

তেছি, আগে বা পরে সে উল্লেখ আর কোথাও দেখিতেছি না। বঙ্গাল রাগও যে কি ধরনের আজ তাহা বুঝিবার উপায় নাই, তবে এই রাগটিও যে এক সময় গুর্জরী, মালবশ্রী বা মালসী, শবরী প্রভৃতি রাগের মত স্থানীয় লোকায়ত রোগ ছিল, সন্দেহ নাই। অথচ ভারতীয় মার্গসঙ্গীতে বঙ্গাল-রাগ এক সময় সুপরিচিত রাগ ছিল, এবং অষ্টাদশ শতকের রাজস্থানী চিত্রনিদর্শনে বঙ্গাল রাগের চিত্রও দুর্লভ নয়। পরে কখন কিভাবে যে এই রাগটি লুপ্ত হইয়া গেল তাহা জানা যাইতেছে না। বস্তুত, চর্যাগীতির দেবক্রী, গউড়া বা গবড়া মালসী-গবড়া শবরী, বঙ্গাল, কাহ্ন গুর্জরী প্রভৃতি অনেক রাগই আজ বিলুপ্ত। দেশাখ-রাগ তো বোধ হয় আজিকার দেশরাগে বিবর্তিত বা রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। আরু রাগ যে কি তাহাও আজ আর বুঝিবার উপায় নাই।"[৪৩]

যে তিনটি চর্যা পাওয়া যায়নি তার একটি অনুবাদে 'ইন্দ্রতাল' নামটি পাওয়া যাচ্ছে। ইন্দ্রতালের নাম থেকে অনুমিত হয়— এটি সম্ভবতঃ কোন তালের নাম, রাগ ঠিক নয়। সুকুমার সেন তাই মন্তব্য করেন—"ইহা রাগিণীর নাম না হইয়া তালের নাম হইবে বলিয়া মনে করি। তাহা হইলে কি কোন কোন চর্যায় রাগণীর সঙ্গে তালেরও নির্দেশ ছিল, যেমন জয়দেবের পদাবলীতে ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পাই?"[৪৪]

।। সাহিত্যিক মূল্য ।।

চর্যাগীতিগুলি মূলতঃই বৌদ্ধ সহজিয়াদের সাধনপদ্ধতিমূলক গান। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সন্ধ্যা ভাষায় রূপকের মাধ্যমে সাধকদের গূঢ় ধর্মসাধনার কথা প্রচার করা। কোটি জনের মধ্যে একজন এর মর্মার্থ অনুধাবন করতে পারবে— এমন বিশ্বাস ব্যক্ত করেছেন চর্যাপদকর্তাগণ স্বয়ং। অতএব এইটেই স্বাভাবিক যে, এগুলি মূলতঃই প্রচারধর্মী, কাব্যরস-সৃষ্টির কোনো সজ্ঞান চেষ্টা এখানে থাকবে না। আর আজকের পাঠকের কাছে এর ভাষাতাত্ত্বিক গুরুত্ব যতোখানি, ততখানি গুরুত্ব অন্যদিকে নেই। তবু কথা থেকে যায়।

কথা হচ্ছে ঐ রূপকের ব্যবহার নিয়ে। রূপকের ব্যবহার মাঝে মাঝে সার্থক হয়ে রচনাকে কাব্যগৌরব দান করেছে। চর্যার সাহিত্য-মূল্য পর্যালোচনা করতে

গেলে দেখা যাবে, রূপক সৃষ্টিতে পদকর্তাগণ যেখানেই লোকায়ত জীবনকে আশ্রয় করেছেন সেখানেই তা সাহিত্য গুণসম্পন্ন হওয়ার অবকাশ লাভ করেছে। বস্তুতঃ তৎকালীন জীবনের ছবি পদকর্তাগণের ধ্যানতন্ময়তার স্পর্শে বহু স্থানেই সজীব হয়ে উঠেছে। একটি ছবি নেওয়া যাক—লোকালয়ের বাইরে একাকিনী ডোম্বী তার কুঁড়ের মধ্যে বাস করে। সে অস্পৃশ্যা রমণী, লোকালয়ে স্থান নেই তার। কিন্তু সে নিত্য-পটিয়সী, খুব হালকা ভঙ্গিতে, মনে হয় যেন, পদ্মের পাপড়িতে পা রেখে নৃত্য করে সে। তার গুণে মুগ্ধ হয়ে কবি তাকে প্রেম নিবেদন করেছেন—

তু লো ডোম্বী হউঁ কাপালী
তোহোর অন্তরে মো এ ঘালিলি হাড়েরি মালী।।

প্রণয়িনী যেখানে সমাজে অস্পৃশ্যা, প্রেমিক সেখানে কাপালিক না সেজে আর করবে কি! প্রিয়ার জন্য গলায় হাড়ের মালা প'রে সমাজ ত্যাগ করেছে সে। 'ওলো, তুই যেমন ডোম্বী, আমিও তেমনি কাপালিক। তোর জন্যই গলায় হাড়ের মালা ধারণ করেছি।'—প্রেম নিবেদনের এই ভাষা অপূর্ব

তৎকালীন জীবনের যে চিত্র চর্যাগুলিতে ফুটে উঠেছে তার কয়েকটি বেশ সরল ও কবিত্বপূর্ণ।—

উঞ্চা উঞ্চা পাবত তহিঁ বসই সবরী বালী।
মোরাঙ্গ পীচ্ছ পরিহাণ সবরী গীবত গুঞ্জরী মালী।।

উঁচু উঁচু পর্বত, তার উপরে বাস করে শবর বালিকা। শিখীপুচ্ছ খোঁপায় গুঁজে গলায় গুঞ্জার মালা প'রে সে ঘুরে বেড়ায়, শবর তার জন্য উন্মত্ত। শবরীকে যে পরিবেশে চিত্রিত করা হয়েছে সেই পরিবেশটিও মনোরম—

ণাণা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী
একেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণকুণ্ডল বজ্রধারী।।

ফুলে ফুলে ভ'রে গেছে সারা বন, সেই বনের ফুলে-ভরা ডাল যেন স্পর্শ করেছে আকাশকে। কানে কুণ্ডল প'রে একাকিনী শবরী সেই বনে ঘুরে

বেড়ায়। সেকালের অরণ্যচারী মানুষের সহজ স্বাভাবিক জীবনের ছবি এখানে স্বল্প কয়েকটি কথায় সুন্দর ফুটেছে। অন্যত্র পাওয়া যাচ্ছে—

হেরী সো মোরি তইলা বাড়ী খসমে সমতুলা।
সুকল এ মোরে কপাসু ফুটিলা।।
তইলা বাড়ীর পাসে'রে জোহ্না বাড়ী তাএলা।
ফিটেলি অন্ধারী রে আকাস ফুলিলা।।

অরণ্যের মধ্যে উ'চু টিলায় বাড়ি—আকাশের গায়ে যেন ছবির মতো বিরাজ করে তা: সেই বাড়ীর পাশে কাপাস যখন ফুটে তখন মনে হয়, সেখানে জ্যোৎস্না-বাটিকা তৈরী ক'রে দিয়ে গেছে কে যেন। একরাশ সাদা কাপাশ যখন উ'চু পাহাড়ের উপর ফুঠে ওঠে তখন মনে হয় যেন আকাশই ছেয়ে গেছে ফুলে ফুলে, আর তার শুভ্রতায় ঘুচে গেছে সকল অন্ধকার—। এমনি পরিবেশে বাস করে শবর-শবরী। যখন সেখানে কঙ্গুচিনা পেকে ওঠে তখন তা দিয়ে মদ তৈরী ক'রে শবর-শবরী মহানন্দে মদে-মাতাল দিন যাপন করে।—

কঙ্গুচিনা পাকেলা রে সবরা সবরি মাতেলা।
অণুদিন সবরে কিম্পি ণ চেবই মহাসুহে' ভোলা।।

এইভাবে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, তৎকালীন দৈনন্দিন জীবনের সুন্দর সুন্দর ছবি বেশ কবিত্বপূর্ণ ভাষায় চিত্ররূপ লাভ করেছে চর্যাগীতিকা গুলিতে।—

সসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগই।
কানেট চোরে নিল কাগই মাগই।।

বৃদ্ধ শ্বশুরটি ঘুমিয়ে গেছেন, তাঁর জেগে থাকার শক্তি নেই। চোরের উপদ্রব। তাই বধূ জেগে আছে। তবু সুচতুর চোর চোখে ধুলো দিয়ে 'কানেট' চুরি ক'রে নিয়ে গেছে। এমন চোরকে কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে!—সেকালের অসহায় গৃহস্থ ঘরের চিত্র এটি।

খুব চমৎকার একটি ছবি পাচ্ছি কাপালিকের। সংসার ছেড়ে আত্মীয় স্বজনের সমস্ত স্নেহ-বন্ধন উপেক্ষা ক'রে কানু কাপালিক হলেন। কথাটিকে ব্যক্ত করা হয়েছে এইভাবে—

মারি সাসু ননন্দ ঘরে সালী।
মাঅ মারি কাহ্ন ভইঅ কবালী।।

মারা নয়ত কি? বহু আশা নিয়ে মা যাকে লালন-পালন করেছিলেন, যাকে শক্ত-সামর্থ যুবা পুরুষ দেখে শাশুড়ী তার কন্যা সমর্পণ করেছিলেন, যাকে কেন্দ্র ক'রে শ্যালিকার হাস্যামোদ স্ফূর্তিলাভ করেছিল—সেই ব্যক্তিটি যখন সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে পড়ে তখন কি অবস্থার সৃষ্টি হয়! সকলের মিলিত বেদনাকে একটি শব্দেই রূপ দিলেন কবি—তাদেরকে মেরে রেখে গেল সে। এমনি পরিমিতি-বোধ চর্যাগীতিকাগুলিতে অনেক পাওয়া যাবে। এখানে কবি একটি সূক্ষ্ম চাতুর্যের পরিচয় দিয়েছেন স্ত্রীর উল্লেখ না ক'রে। কেউ কাপালিক সন্ন্যাসী হয়ে গেলে সব চেয়ে বেশী অসহায় হয়ে পড়ে স্ত্রী, তার বেদনা হয় সর্বাধিক, তাই তার কথাটিই কেবল উহ্য রেখে তার বেদনা পাঠকের কল্পনার উপর ছেড়ে দিয়ে চারপাশের সকলের কথা ব'লে গেলেন। কাব্যের শিল্প কৌশল হিসেবে এটি অনবদ্য। অতঃপর লক্ষ্য করা যাক, কাপালিক কানুর ছবিটি—

আলি কালি ঘন্টা নেউর চরণে।
রবি শশী কুন্ডল কিউ আভরণে।।
রাগ দেশ মোহ লইআ ছার।
পরম মোখ লভই মুক্তিহার।।

কাপালিক কানুর চরণে আলি-কালির নূপুর, কানে রবিশশী-রূপ কুন্ডল আর রাগ-দ্বেষ-মোহ পুড়ানো ছাই তার সারা শরীরে।

চর্যাগীতিগুলির প্রকাশ-ভঙ্গিতে যে পরিমিতি-বোধ লক্ষ্য করা যায় তা আজকের পাঠকের কাছেও অনেকখানি বিস্ময়কর ঠেকবে। বলাই বাহুল্য,

পরিমিত প্রকাশভঙ্গি যে কোনো শিল্পী-সাহিত্যিকেরই পরম কাম্য। এ ব্যাপারে চর্যাগীতিকারদের সাফল্য কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে তুলে ধরা যেতে পারে।—

ভব ণই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী।
দুআন্তে চিখিল মাঝেঁ ন থাহী॥
ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই।

একটি নদী গহন গম্ভীর বেগে প্রবাহিত হচ্ছে, দুপাশে তার কাদা, মধ্যে অথই জল। এর উপর দিয়ে একটি সাঁকো তৈরী ক'রে দিয়েছেন চাটিল পা।—বর্ণনাতে বাহুল্য নেই, মিত-ভাষণের চূড়ান্ত উদাহরণ এটি। অনুরূপ-ভাবে একটি হরিণের ট্র্যাজেডি কতো সংক্ষেপে অল্প কয়েকটি আঁচড়ে এঁকে দেখানো হয়েছে এই চরণ কটিতে—

অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।
খনহ ন ছাড়ই ভুসুকু অহেরী॥
তিণ ন ছুবই হরিণা পিবই ন পাণী।

হরিণ তার আপন মাংসের জন্য জগতের সকলেরই শত্রু হয়ে উঠল। তার মাংসের জন্য সকলেই তাকে হত্যা করতে চায়। শিকারী সারাক্ষণ তাকে অনুসরণ করে, এক মুহূর্তও ছাড়তে চায় না। হরিণ তাই তৃণ স্পর্শ করছেনা, মনের দুঃখে জলও পরিত্যাগ করেছে। এই অবস্থায় হরিণী তাকে উপদেশ দিচ্ছে—

হরিণী বোলই হরিণা সুণ তো।
এ বন ছাড়ী হোহু ভান্তো॥

এই উপদেশ পাওয়ার পর হরিণ কিভাবে বন ছেড়ে চ'লে গেল তার বর্ণনায় কবি একটি মাত্র ছত্রে সমগ্র ছবিটি ফুটিয়ে তুলেছেন—

তরঙ্গেতেঁ হরিণার খুর ন দীসই।

হরিণের দ্রুত উল্লম্ফনের ফলে তার খুর পর্যন্ত দেখা যায় না। দ্রুত পলায়নের বর্ণনায় এর চেয়ে সুন্দর সুমিত ভাষা আর আশা যায় না। কী সুন্দর সংক্ষিপ্ত এবং পরিচ্ছন্ন এই ভাষা—

কাআ তরুবর পাঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চিত্র পইঠা কাল।।

শরীর বৃক্ষসদৃশ, তার পাঁচ ইন্দ্রিয় যেন পাঁচটি ডাল, চঞ্চল চিত্তে কাল প্রবিষ্ট হয়।

অথবা,

কাঅ ণাবড়ি খাণ্টি মণ কেড়ুআল।
সদ্‌গুরু-বঅণে ধর পতবাল।।

শরীর যেন একটি নৌকা, খাঁটি মন হচ্ছে দাঁড়, সদ্‌গুরু-বচনে তার হাল ধর।—এই ধরণের সংক্ষিপ্ত ও পরিচ্ছন্ন বাক্‌বিন্যাস চর্যার একটি বৈশিষ্ট্য।

প্রেম ও দুঃখ বেদনার আবেদন কাব্যে চিরকালই সমাদর লাভ করেছে। চর্যাগুলির মধ্যে বহুক্ষেত্রেই শৃঙ্গার রসাশ্রিত রূপক লক্ষ করা যায়। রজনীর অকুতোভয় অভিসারিকার ছলনাময়ী মূর্তিকে বড়ো সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এই দুটি চরণে—

দিবসহি বহূড়ী কাউহি ডাই।
রাতি ভইলে কামরু জাই।

দিনের বেলা বউটি কাকের ভয় পায়, অথচ রাত্রিকালে অভিসার-যাত্রায় যতো দূরেই যেতে হোকনা কেন তাতে পিছপা নয় সে। অসতী রজ্যার পদ হিসেবে রসাস্বাদ-মধুর এই চরণ দুটি অতুলনীয়। প্রেমের আকৃতি প্রকাশে স্মরণীয় দুটি চরণ হচ্ছে –

জোইনি তঁই বিণু খনহিঁ ন জীবমি।
তো মুহ চুম্বী কমলরস পিবমি।।

যোগিনী, তোকে ছেড়ে এক মুহূর্তও বাঁচব না। ওগো আয়, তোর মুখ চুম্বন ক'রে কমলরস পান করি।

একটি পদে বিবাহ এবং তৎপরবর্তী মিলন-প্রসঙ্গ অতি অল্প কয়েকটি কথায় সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে—

জঅ জঅ দুন্দুহি সাদ উছলিআঁ
কাহ্ন ডোম্বি বিবাহে চলিআ।।
ডোম্বী বিবাহিআ আহারিউ জাম।
জউতুকে কিঅ অনুত্তর ধাম।।
অহণিসি সুরঅ পসঙ্গে জাই।
জোইণি-জালে রঅণি পোহাই।।
ডোম্বী-এর সঙ্গে জো জোই রত্ত।
খণহ ন ছাড়ই সহজ উন্মত্ত।।

চরণগুলি সেকালের বিবাহে চিত্র হিসেবেও উল্লেখযোগ্য। দুন্দুভিতে জয় জয় শব্দ তুলে কানু যাচ্ছে ডোম্বীকে বিয়ে করতে। বিয়ে ক'রে যৌতুক লাভ করছে এবং পরবর্তী দিনগুলি কেটে যাচ্ছে সুরত কর্মে। ডোম্বী-যোগিনীর প্রেমজালে রাত্রি অতিবাহিত হচ্ছে। ডোম্বীর সঙ্গে প্রেমে রত হ'লে তাকে আর ক্ষণেকের জন্যও ছাড়া যায় না।

অন্যত্র,—

নৈরামণি কণ্ঠে লইআ মহাসুহে রাতি পোহাই।

প্রিয়াকে কন্ঠ-সংলগ্ন ক'রে রাত্রিযাপনের কথাটি যতোই আধ্যাত্মিক অর্থ বহন করুক, আদি-রসাত্মক কাব্য হিসেবেও এর গৌরব অটুট।

দুঃখানুভূতির অভিব্যক্তি কয়েকটি চর্যায় বেদনাঘন পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। একটি চর্যার প্রারম্ভসূচক চরণ দুটিতে বলা হয়েছে—

কাহেরে ঘিনি মেলি আছহু কীস।
বেঢ়িল হাক পড়ই চৌদীস।।

এর পরেই হরিণের প্রসঙ্গে এসেছে, সুতরাং কথাগুলি একটি হরিণের বিপদাপন্ন অবস্থার ছবি। তবু পদটির প্রথমেই এ দু'টি চরণ মনের মধ্যে একটি বিপদাপন্ন অসহায় জীবনের সকরুণ অবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। —কাকে নিয়ে কাকে ছেড়ে কীভাবে যে আছি! আমার চারপাশ ঘিরে হাঁক পড়েছে আমাকে মারবার জন্য: একথার মধ্যে তৎকালীন সাধারণ মানুষের দীর্ঘনিঃশ্বাস ধ্বনিত হচ্ছে।

একটি দরিদ্র সংসারের বাস্তব আলেখ্য পাওয়া যাচ্ছে—

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেসী
হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী।।

নগরের উপান্তে একখানি ঘর, আশেপাশে কোনো প্রতিবেশী নেই। দিন চলে না, হাড়িতে ভাত নেই। এমনি সকরুণ অবস্থায় দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে সেখানে লম্পট পুরুষ এসেছে প্রেম জমাতে। সর্বহারা মানুষের অসহায়তা এখানে মনকে স্পর্শ করে। অন্য একটি চর্যায় এমনি দরিদ্রের সংসারে গর্ভিণী রমণীর হৃদয়-বেদনা প্রকাশ পেয়েছে এইভাবে—'হউ' নিরাসী খমণ-ভতারী'—আমি আশাহীন, আমার স্বামী কাপালিক। কাপালিক হয়ে সংসার পরিত্যাগ করেছে এমন স্বামীর স্ত্রী যদি গর্ভিণী থাকে তবে সংসারে তার বেদনা রাখবার স্থান কোথায়! যাকে লক্ষ ক'রে সে বলেছে—

ফিটিলিউ গো মাই অন্তউড়ি চাহি।
জা এথু চাহম সো এথু নাহি।
পহিলে বিআণ মোর বাসন পুড়া।
নাড়ি বিআরন্তে সেঅ বাপুড়া।।

জীবনের বড়ো ট্রাজেডি বোধ হয় এইখানেই যে, কোনো পাওয়াই এখানে চির-স্থায়ী নয়। যে জীবনকে আমরা এতো ভালোবাসি সেই জীবনকেও একদিন স্বাভাবিক নিয়মেই ছেড়ে যেতে হয়। কবিকন্ঠে তাই ধ্বনিত হয়েছে আক্ষেপোক্তি —'জে জে আইলা তে তে গেলা', যা কিছু এসেছিল সবি তো কালের অতলে হারিয়ে গেল। এখন বেদনাভারাক্রান্ত হওয়া ছাড়া পথ কোথায়! তাই, অবনা-গবনে কাহ্ন বিমনা ভইলা'। সমস্ত চর্যাতেই এই বেদনা থেকে মুক্তির আকুতি। ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার লিখেছেন—"চর্যাগীতির মধ্যে ইতস্তত যে সব খন্ড ও পরিপূর্ণ চিত্র ছড়ানো রয়েছে তার আলোচনা করলে একটা গভীর শূন্যতাবোধ এবং দারিদ্র্যের চিত্রই ফুটে উঠে।" কথাগুলিকে আরো বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা ক'রে তিনি বলেন—

"চর্যাগীতির ভাবসম্পদ আলোচনা করলে সর্বপ্রথম যা মনে রেখাপাত করে সে হলো ভাবের অন্তরালে লুকানো অপরিসীম শূন্যতার বেদনা।—গীতি-কারগণ ইন্দ্রিয়কে, চিত্তকে বিনষ্ট করার কথা ঘোষণা করেছেন। কারণ যে আশা চরিতার্থ করার উপায় নেই তাকে প্রশ্রয় দিয়ে লাভ কি? —মানুষের না পাওয়ার বেদনা অপরিসীম; চেয়ে না-পাওয়ার বেদনায় সংকুচিত হওয়ার চেয়ে না-চাওয়ার বৈরাগ্যকেই অনেক সময় শ্রেয় ব'লে মনে হয়।

চাওয়ার এই প্রেরণাকে জোর ক'রে নাশ করা অত্যন্ত দুঃখকর ঃ মানুষের চাওয়ার. কিছু হওয়ার, নিজেকে সৃষ্টি করার চেতনাকে বাদ দিলে প্রকৃতপক্ষে তার জীবনকেই যে অস্বীকার করতে হয়। কিন্তু জীবনকে অস্বীকার করা কি সহজ? না মানুষ তাই পারে কখনও? সিদ্ধাচার্যগণও জীবনের মূল প্রেরণাকে অস্বীকার করতে পারেনি। তাঁরা ইন্দ্রিয়কে বিলোপ করতে চেয়েছেন, ইন্দ্রিয়ের মূলাধার চিত্তকে বিনষ্ট করতে চেয়েছেন, কিন্তু সুখের যে-চেতনা, আনন্দের সে চেতনা মানুষের জীবনে সদা-জাগ্রত থাকে, তাকে বিনষ্ট করতে চাননি। সুখ, আনন্দ সবই তাঁদের কাম্য; শুধু আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পৃথিবীতে তার আস্বাদ সম্ভব হচ্ছেনা বলেই তাঁরা অন্যত্র সুখ ও আনন্দের অনুসন্ধান করছেন। কাহ্নপাদ তার একটি গানে বলেছেন—

এবংকার দিঢ় বাখোড় মোড়িউ
বিবহ বিআপক বান্ধণ তোড়িউ।
কাহ্ন বিলসই আসব মাতা।
সহজ নলিনীবন পইসি নিবীতা
জিম জিম করিণা করিণিরে রিসই।
তিম তিম তথতা মঅগল বরিসই।

(অর্থাৎ, একটি মদদপ্ত হস্তীর ন্যায় কাহ্নপাদ সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করেছেন এবং মহানন্দে সহজনলিনীবনে বিহার করেছেন। হস্তীনীর সঙ্গ লাভ ক'রে হস্তী যেমন আসক্তিমদ বর্ষণ করে, তেমনি কাহ্নপাদও নৈরাত্মাদেবীর সঙ্গলাভ ক'রে তথতা বা নির্বাণমদ বর্ষণ করছেন।)

সুখ-রস-সিঞ্চিত এই চিত্রটি অপরূপ।...

অখন্ড সুখ ও আনন্দ লাভের চেতনা চর্যাগীতিকার মূলে। না-চাওয়া এবং না-পাওয়া নয়, পরিপূর্ণ পাওয়া। এই পাওয়ার পরিবেশকে, নির্মাণ-লাভের ক্রিয়াকে তাঁরা শবর-শবরীর মিলনের সুখকর অনুভূতি ও চিত্ররূপে কল্পনা করেছেন।"[৪৫]

মূল কথা, ইন্দ্রিয়ের ভোগ লিপ্সাই যেন চর্যাগুলির মূল উদ্দীপন বিভাব। অর্থাৎ বাহ্যতঃ জীবন-বিমুখ মনে হলেও জীবন থেকে স'রে যেতে তাঁরা পারেন নি। উপমা-রূপকে তার প্রমাণ আছে। এ চর্যাগুলিতে যে দেহ-প্রাধান্য লক্ষ করা যায় তার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা যতোই দেওয়া হোক না কেন, তার মধ্যে দিয়ে তাদের ইহবাদী দৃষ্টিভঙ্গিটি প্রচ্ছন্ন থাকেনি। তাই দেখা যাবে, চর্যাগুলিতে অতি সজীব এবং মনোহর যৌন-সম্ভোগের চিত্রই বারে বারে ফিরে এসেছে। অবশ্য "যৌন-সম্ভোগের চিত্র এবং যৌন-প্রতীক ব্যবহার ক'রেই প্রাচীন ও মধ্যযুগের লোকায়ত ধর্মমত ও পথের ব্যাখ্যা করা হতো। গভীর আধ্যাত্মিক আনন্দানুভূতিকে ইন্দ্রিয়সম্ভোগের চিত্র এঁকে প্রকাশ করার প্রবণতা থেকে এটা স্পষ্টই বোঝা যায়, ইন্দ্রিয়ের বাস্তবতা এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু ও পৃথিবীর সত্যতা সম্পর্কে সিদ্ধাচার্যদের চেতনা কত প্রবল ও গভীর। অনুক্ষণ তাঁহা ইন্দ্রিয় ও বস্তুপৃথিবীর আকর্ষণ বোধ করেছেন।, তাই তাঁদের ভাবজগতেও তা অনায়াসেই প্রতিফলিত হয়েছে।"[৪৬]

এইখানেই ভাষা সম্পর্কে কথা উঠে। ভাবসম্পদের মতোই তাহাদের ভাষাও হয়ে উঠেছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য লৌকিক। পরিচিত জীবনের অতি সাধারণ ভাষায় তাঁরা কথা বলেছেন। শব্দও তাঁরা আহরণ করেছেন যেন একেবারে সাধারণ মানুষের মুখ থেকেই। কবিতার জন্য কোনো স্বতন্ত্র কাব্যগন্ধী শব্দরাজি তাঁরা অনুসন্ধান করেননি (এটা যে সর্বত্র প্রশংসাযোগ্য সে কথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়), কিংবা দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত কোনো শব্দকেই প্রয়োজন হ'লে গ্রহণ করতে তাঁরা ইতস্তত করেননি। যে শব্দ তাঁরা ভাব-প্রকাশের উপযুক্ত বিবেচনা করেছেন কোনো দ্বিধা ব্যতিরেকেই সে শব্দ তাঁরা ব্যবহার করেছেন।

কোনো শব্দই তাঁদের কাছে অশ্লীল বিবেচিত হয়নি।—'নরঅ নারী মাঝেং উভিল চীরা' (শহীদুল্লাহ্ সাহেবের ভাষ্য অনুসারে এর অর্থ—'নর ও নারী মাঝে উর্ধ্ব করিলাম লিঙ্গ')[৪৭], 'ডোম্বি তো আগলি নাহি ছিণালী' (ডোম্বি তোর মতো ছিনাল আর নেই), 'বান্ড কুরন্ড সন্তারে জাণী' (লিঙ্গ কুরন্ড টের পাওয়া যায় সাঁতার দেবার সময়)—এই সব বাক্-বিন্যাস এ যুগের কাছে যেমনই মনে হোক, সকালে নিশ্চয়ই এসব সাধারণের কাছে যথাসম্ভব পরিত্যাজ্য বিবেচিত হয়নি। তা ছাড়া নিম্নবর্ণের দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোক (চন্ডলী, ডোম্বী ইত্যাদি), মদ অবৈধ প্রেম প্রভৃতি ভালো মন্দ নির্বিশেষে সর্বপ্রকার সাধারণ রূপক চর্যাগুলিতে নির্বিচারে ব্যবহৃত হয়েছে। অবশ্য সর্বত্রই যে এগুলি রসসৃষ্টিতে খুব সার্থক হয়েছে তা বলা যায় না।

বাংলাদেশের অতি পরিচিত সাধারণ জীবন থেকে চর্যাকারগণ উপমা, রূপক সংগ্রহ করেছিলেন। নদী, নৌকা, দাঁড়, সাঁকো, ঘাট, পাটনী, মূষিক, তুলো, সোনা রূপা, কুঠার, থালা, বাসন, কাপাসফুল, দাবাখেলা প্রভৃতি চারপাশে ছড়িয়ে থাকা সাধারণ দ্রব্যসামগ্রীই চর্যাগীতিতে উপমা-রূপকের উপাদান জুগিয়েছে। তাই, এইগুলির মধ্যে দিয়ে সেকালের বাস্তব জীবনের মুখোমুখি হই আমরা, আর কাব্য হিসাবে এখানেই এর সার্থকতা।

পরিশেষে বলা যায়, অলংকার শাস্ত্র অনুযায়ী নানাপ্রকার অলংকারের সন্ধানও চর্যাগুলিতে মেলে। অনুপ্রাস, শ্লেষ, কাকুবক্রোক্তি প্রভৃতি শব্দালংকার এবং উপমা, রূপক, সন্দেহ, নিশ্চয়, সমাসোক্তি প্রভৃতি অর্থালংকার চর্যাগুলিতে সার্থকভাবেই ব্যবহৃত হয়েছে লক্ষ করা যায়। কিন্তু আজকের যুগের কাব্য বিচারে এই জাতীয় শাস্ত্রীয় বিচার অপেক্ষা অনুভূতি ও রসের বিচারই মুখ্য—সেই দৃষ্টিকোন থেকেই আমরা এর কাব্যমূল্য উপলব্ধির চেষ্টা করেছি।

।। দেশ কাল ও সমাজ-জীবন ।।

চর্যাপদে যে দেশকালের ছায়া পড়েছে তার পরিচয় একালের পাঠকের কাছে যথেষ্ট কৌতুহলোদ্দীপক। সেকালের বাংলাদেশ ও বাঙালীর জীবন বাস্তব রসমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছে এই চর্যাগুলির মধ্যে।

চর্যাগুলির মধ্য দিয়ে কেউ যদি তৎকালীন ভৌগোলিক বাংলার একটি রূপ কল্পনা করতে চেষ্টা করে তবে প্রথমেই চোখের সামনে ভেসে উঠবে একটি সুন্দর নদীমাতৃক দেশ, তার মধ্যে প্রচুর অরণ্য আর কোথাও কোথাও ছোট-খাট টিলা। টিলাগুলি নিশ্চয়ই ছিল দেশের উপান্তে—পূর্ব অথবা পশ্চিম প্রান্ত ঘেঁষে। তিনদিকে পাহাড় ও একদিকে সমুদ্র ঘেরা এই দেশের নানা পরিচয়ে চর্যাগুলি সমৃদ্ধ। সমুদ্রের সঙ্গে পরিচয় যে খুব গভীর নয়, চর্যাগুলিতে তার প্রমাণ আছে। সমুদ্র আছে বাংলাদেশের কয়েক শত মাইল উপকূল জুড়ে অথচ চর্যাসমূহে এই সমুদ্রের উল্লেখ-মাত্র আমরা পাচ্ছি মোটেই চারবার—তাও জীবনের সংগে সম্পৃক্ত হয়ে নয়। 'ভবজলধি', 'মায়া-সমুদ্র' 'গগন-সমুদ্র' প্রভৃতি উল্লেখ সমুদ্র সম্পর্কে লেখকের কোনো সাক্ষাৎ পরিচয়ের ইঙ্গিত দেয় না। কেবল ৪২ সংখ্যক চর্যায় লেখক যেখানে বলেন 'ভাগ তরঙ্গ কি সোসাই সাঅর', তখনই সহসা যেন মনে হয় এ সাগর লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে এসে কবিতায় স্থান পাচ্ছে। কিন্তু এ ধরণের বর্ণনা এই একবারই। এতে মনে হয়, আমাদের সাগর উপকূল সেকালে আরো ঘন অরণ্যসংকুল ছিল এবং বাঙালী-জীবন তখন আদৌ সমুদ্র-বিহারী ছিল না। কিন্তু পাহাড় সম্পর্কে একথা বলা চলে না। যদিও বাংলার পাহাড়গুলি একেবারে প্রান্তসীমা ঘেঁসে প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে আছে, তবু সেই সব ছোট ছোট পাহাড়ে সেকালের বাঙ্গালী জীবনের যে বিকাশ হয়েছিল তার অপূর্ব জীবন্ত আলেখ্য চর্যাগুলিতে আমরা লাভ করি। উঁচু উঁচু পাহাড়ের উপর শবরী বালিকা বাস করে। তার জীবন যাত্রার একটি চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন কবি শবর পা। তিনি দুটি চর্যায় (২৮ ও ৫০) সেকালের পার্বত্য বাংলাকে একেবারে জীবন্ত অমর করে রেখে গেছেন। পাহাড়ের মাথায় বাঁশের চেঁচাড়ি দিয়ে তারা চমৎকার ঘর বানাত—ঘরের পাশে থাকত কার্পাসের ক্ষেত, তাতে সাদা সাদা ফুল ফুটত। রমণীরা মাথায় ময়ূরপুচ্ছ কানে কুণ্ডল এবং গলায় গুঞ্জার মালা প'রে ঘুরে বেড়াত। কঙ্গুচিনা পাকলে তা দিয়ে মদ্য প্রস্তুত ক'রে খেয়ে মাতাল হ'ত তারা। জীবনে তাদের দুঃখকষ্ট হয়ত ছিল, কিন্তু স্বাধীন বন্য জীবনের আনন্দে উদ্বেলিত ছিল তাদের দিনগুলি।

বাংলাদেশের অধিকাংশই সমতল ক্ষেত্র। সেই সমতলের উপর দিয়ে বয়ে গেছে আঁকা-বাঁকা কতো নদী। অনেক দূর পর্যন্ত নদীগুলিতে জোয়ার আসে, ফলে সব সময় দু'তীরে থাকে কাদা, কিন্তু মাঝখানে অথৈ জল। নদীগুলো পার হওয়ার জন্য আছে নৌকা, আছে সাঁকো। হাল ও দাঁড়ের সাহায্যে নৌকা বাওয়ার কথা বার বার চর্যাগুলিতে এসে ভীড় করেছে, কোথাও কোথাও গুন টেনে উজান যাওয়ার কথাও বলা হয়েছে। নদীমাতৃক দেশের জীবন নদী-নির্ভর হবে সেইটেইতো স্বাভাবিক। নদীগুলিতে ছিল জলদস্যু ও কুমীরের ভয়।

বাংলাদেশে যেমন ছিল অসংখ্য নদী, তেমনি ছিল সুগভীর অরণ্যের বিপুল বিস্তার। প্রচুর রোদ বৃষ্টি এবং পলিমাটি-পড়া উর্বর জমি—খুব সহজেই অরণ্য সৃষ্টির অবকাশ ছিল এখানে। বিশেষত জনসংখ্যা ছিল তখন খুবই কম। সেই বিপুল অরণ্যে খুব বেশী পাওয়া যেত হাতী এবং হরিণ। আশ্চর্য এই যে, বাঘের কথা একবারও পাওয়া যায় না। বাংলাদেশের অরণ্য ব্যাঘ্র-সংকুল হওয়ারই কথা, অথচ বাঘের রূপক একবারও ব্যবহৃত হয়নি। সিংহ, শৃগাল ও শশকের কথা আছে। হরিণ শিকারের প্রসঙ্গ একাধিক চর্যায় পাওয়া যাচ্ছে। বাংলা মঙ্গলকাব্যে ব্যাধ-সমাজের দেবী চন্ডী একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে আছেন। মনে হয়, বাংলাদেশের আদিম অধিবাসীদের একটি বৃহত্তম অংশ ব্যাধ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। হাতীর প্রসঙ্গ যেভাবে উল্লিখিত হয়েছে তাতে মনে হয়, বন্য হস্তীর অরণ্য-জীবনও কবির অভিজ্ঞতার বাইরে ছিল না।—

জিম জিম করিণা করিণিরে রিসই।
তিম তিম তথতা মঅগল বরিসই।।

হাতী যেমন ক'রে স্ত্রী-হাতীর উপর আসপ্তিমদ বর্ষণ করে তেমনি কানুপা তথতা বা নির্বাণমদ বর্ষণ করেছেন।—এ ধরণের পদ যে সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা থেকে লেখা সে কথা বুঝতে অসুবিধা নেই। মনে হয়, হাতী সে সময় বাংলাদেশের জঙ্গলে প্রচুর পাওয়া যেত। অনুরূপভাবে, হরিণের যে বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে তাতেও পদকর্তার বাস্তব পর্যবেক্ষণলব্ধ অভিজ্ঞতাই মূর্ত হয়ে

উঠেছে দেখা যাবে। হরিণ শিকারীর ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, একথার বর্ণনায় বলা হয়েছে– 'তরঙ্গেতে' হরিণার খুর ন দীসই।' হরিণের পলায়নপর মূর্তি পদকর্তাদের বহুল অভিজ্ঞতার বিষয় ছিল, তাঁরা দেখেন—দ্রুত লম্ফ দিয়ে হরিণ যখন পালায় তখন তার খুর যেন অদৃশ্য হয়ে যায়। হরিণও তখন বাংলাদেশের যত্রতত্র পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যেত।

এই ভাবেই নদী-অরণ্য-পর্বত বেষ্টিত হাজার বছরের পুরোনো বাংলাকে জীবন্ত হয়ে উঠতে দেখি চর্যাগুলির মধ্যে। নদীর মধ্যে গঙ্গা, যমুনা ও পদ্মার নাম আছে। ভাগীরথী নদী স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে গঙ্গা নামেও পরিচিত। এই ভাগীরথী, পদ্মা ও যমুনা মিলে বাংলার প্রাণধারাকে চির-সজীব রেখেছে। নদী ছাড়াও অসংখ্য খাল-বিলে ভরা এই বাংলাদেশ—সেখানে ফুটে থাকত প্রচুর পদ্ম। পদ্মবনের প্রসঙ্গ স্বাভাবিকভাবেই চর্যাগুলিতে একটু বেশী স্থান অধিকার ক'রে আছে।

এই ভৌগোলিক বাংলাকে প্রত্যক্ষ করার পর আমরা এক্ষণে সেকালের সমাজ-জীবনের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করতে পারি। ইতিহাস-পাঠে জানা যায়, পাল ও সেন আমলে বাংলাদেশে বর্ণবিন্যস্ত সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেন যুগে তো বটেই, পাল যুগেও ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য ছিল সমাজে। সমস্ত বাঙ্গালী সমাজ তিনটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত ছিল—ব্রাহ্মণ, শূদ্র এবং অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য। "বৃহদ্ধর্ম পুরাণের মতে ব্রাহ্মণ বাদে অন্য সমস্ত জাতিই শূদ্র। ব্যাপকভাবে এই শূদ্র-পদবীর ব্যবহার সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত History of Bengal গ্রন্থে (পৃঃ ৫৭৮) ব্যাখ্যা করিয়া বলা হইয়াছে যে, পুরাণাদিতে শূদ্র বলিতে 'not only the members of the fourth caste, but also those members of the three higher castes who accepted any of the heretical religions or influenced by tantric rites' বুঝাইত। বৃহদ্ধর্ম কারণ পুরাণের ব্যাপক অর্থে শূদ্র পদবীর ব্যবহারের কারণ এখানে জানা গেল। যাহাই হউক–একটি তথ্য এখানে স্পষ্ট হইয়া যাইতেছে যে বাঙালা দেশে বর্ণবিন্যস্ত সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবার পরও ক্ষত্রিয় বৈশ্য ইত্যাদি বর্ণের সামাজিক প্রতিষ্ঠা বর্ণগতভাবে বিশেষ কিছুই ছিল না। সকলেই শূদ্র পর্যায়ে গৃহীত হইত; এবং দুইটি (অথবা চারিটি) বর্ণ ছাড়াও

অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য বলিয়া শূদ্রের নিম্নেও আর একটি শ্রেণীর অস্তিত্ব তখন ছিল, বিভিন্ন স্মৃতি গ্রন্থেও ইহার প্রমাণ আছে।"[৪৮]—এই অন্ত্যজ- অস্পৃশ্য সমাজের মানুষের জীবন ও আচার-ব্যবহার চর্যাগুলিতে প্রতিফলিত হয়েছে লক্ষ করা যায়। কাপালিক যোগী, ডোম্বী, চণ্ডালী, শবরী, ব্যাধ, তাঁতি, ধুনরী, শুঁড়ি, মাহুত, নট-নটী পতিতা প্রভৃতি নিম্নস্তরের মানুষই চর্যাগুলিতে উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হয়েছে। এই সকল নিম্নবর্ণের মানুষ উচ্চবর্ণের দ্বারা অস্পৃশ্য তো ছিলই, আর্থিক দুর্গতিও ছিল চরম। তদুপরি ছিল সামাজিক অবিচার ও নির্যাতন। ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার কয়েকটি চর্যা ব্যাখ্যা ক'রে দেখিয়েছেন, বাইরে অন্য একটা অর্থ পাওয়া গেলেও, রূপকের অন্তরালে চোখ বাড়ালে আমরা দেখব, মূলতঃই সেগুলি অন্ত্যজ-জীবনের প্রতিচ্ছবি। ডঃ পোদ্দারের অনুসরণে ৬ সংখ্যক চর্যাটির অন্তরালে প্রবেশ করতে চেষ্টা করা যাক—

কাহেরে ঘিনি মেলি অচ্ছহু কীস।
বেঢ়িল হাক পড়ই চৌদিস।।
অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।
খনহ ন ছাড়ই ভুসুকু অহেরী।।
তিন ন ছুবই হরিণা পিবই ন পাণী।
হরিণা হরিণির নিলঅ ণ জাণী।।
হরিণী বোলই হরিণা সুণ তো।
এ বন ছাড়ী হোহু ভান্তো।।

"হরিণ এখানে মন। ব্যবহারিক পৃথিবীর দিকে সে সর্বদাই প্রসারিত হ'তে চায়, তাই বস্তু-সংস্পর্শে তাকে আহত হ'তে হয়। কেননা মনের তৃষ্ণা সেখানে তৃপ্ত হয় না, এই অতৃপ্তি থেকেই আসে দুঃখ। এই সব দুঃখই মনকে ব্যাধের মত চেপে ধরে। হরিণের স্থানে মনকে না বসিয়ে যদি ভুসুকুকে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বাস্তব সমাজে বিচরণশীল মানুষটিকে বসাই, তাহ'লে চিত্রটা এইরূপ দাঁড়ায়ঃ ভুসুকুকে মারবার জন্য চারিদিকে ষড়যন্ত্রের কলরব শোনা যাচ্ছে: তার নিজের গুণের জন্যই তার এই বিপদ। তাই মনের দুঃখ সে

পানাহার ত্যাগ করেছে, কিন্তু মুক্তির পথ কি তা সে জানে না। মুক্তির প্রেরণা তাকে বলছে, এই এলাকা ছেড়ে আর কোথাও চলে যাও। সেই আহবানেই সে দ্রুতগতিতে চ'লে এসেছে এবং এসে নিজেকে বাঁচিয়েছে। সমকালীন সমাজের যে চিত্র আমরা পেয়েছি, এবং সামাজিক নিম্নবর্ণের প্রতি উচ্চবর্ণের অনুদার ব্যবহারের যে পরিচয় আমরা পেয়েছি, তাতে এই চিত্রটিকে এবং ভুসুকুর অচেতন অব্যক্ত মুক্তি-প্রেরণাকে বিন্দুমাত্রও অসংগত মনে হয় না।"[৪৯]

ডঃ পোদ্দারের এই ব্যাখ্যা আমাদের কাছে যুক্তিসংগতই মনে হয়। কিন্তু কেউ যদি একে একান্তই আরোপিত ব্যাখ্যা ব'লে উড়িয়ে দিতে চান তাহ'লেও একান্ত স্থূলভাবে দেখলেও, চর্যাগুলিতে যে মূলতই অস্পৃশ্য মানুষের কথাই চিত্রিত হয়েছে সে কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। অস্পৃশ্য ডোম্বীটিকে বাস করতে হয় নগরের বাইরে এমটি কুড়েঘরে। শবরী বালিকারও বাস নগরের মধ্যে সকলের সঙ্গে নয়—পবিত্র অঞ্চলে টিলার উপর সে বাস করে যেখানে সমতলের তথাকথিত উচ্চবর্ণের মানুষের গতিবিধি বড়ো একটা নেই। সব চেয়ে সকরুণ ছবিটি পাওয়া যাচ্ছে ৩৩ সংখ্যক চর্যায়। নগরের এমন একটি অংশে তার বাস যেখানে তার কোনো প্রতিবেশী নেই। অত্যন্ত দরিদ্র সে। সব দিন হাঁড়িতে ভাত থাকে না। সেজন্য কারো সহানুভূতি নেই। বরং তার সেই দারিদ্রের সুযোগে লম্পট প্রেমিকের নিত্য ভীড় জমে তার বাড়িতে। উচ্চকোটি লোকদের নিম্নসম্প্রদায়ের প্রতি যে নিষ্ঠুর অশ্রদ্ধার মনোভাব এখানে প্রকাশ পেয়েছে তা তৎকালীন সমাজের খাঁটি প্রতিচ্ছবি মনে করতে বাধা নেই। তান্ত্রিক সাধক যেখানে সমাজের কোন বাধা বা রীতি-নীতিকে মানছেন না। সেখানে তাঁর সেই উদ্ধত বিদ্রোহকে তিনি প্রকাশ করেছেন এই ভাষায়—

আলো ডোম্বি তোএ সম করিব মো সাঙ্গ।

ওলো ডোম্বি, তোকেই আমি বিয়ে করব। অর্থাৎ এই ডোম্বী সমাজের চোখে এমন একজন জীব যাকে বিয়ে করতে চাইলে সমাজকে কঠিনতম অবজ্ঞা দেখানো সম্ভব হয়।

সেকালেও সমাজে যে-যতো ছিল ভন্ড ধড়িবাজ সেই তত বলবান ছিল। সমাজ জীবনে খুব একটা সঙ্গতি যে ছিল না, অত্যাচার-উৎপীড়নের দ্বারা অন্যায়-ভাবে যে জীবনকে বহুক্ষেত্রেই দুর্বিষহ ক'রে তোলা হ'ত চর্যাগীতিগুলিতে সে কথার সমর্থন মেলে।

জো সো বুধী সোহি নিবুধী।
জো সো চোর সোহি সাধী॥
নিতি নিতি সিআলা সিহে সম জুঝই। (৩৩)

যে বুঝে সেই নির্বোধ, যে চোর সেই সাধু—প্রতিদিন শিয়াল যুদ্ধ করে সিংহের সঙ্গে। কথাগুলি রূপকার্থ যাই হোক; এ যে তৎকালীন বাস্তব সমাজ-পরিবেশেরও ছবি তাতেও সন্দেহ নেই। সিংহ হচ্ছে পশুর রাজা। রাজা যেখানে অত্যাচারী হয়ে ওঠে সেখানে প্রজার দুর্গতি সহজেই অনুমেয়। সেকালের হিন্দু রাজন্যবর্গ বৌদ্ধদের ওপর যে নির্মম অত্যাচার চালিয়েছিল—যার ফলে অনেক বৌদ্ধই যে নেপাল-তিব্বত প্রভৃতি অঞ্চলে পালিয়ে বেঁচেছিল সে কথা আজ ঐতিহাসিক সত্য। বৌদ্ধ সহজিয়াদের রচনায় সেই মর্মন্তুদ অত্যাচারের ছাপ পড়েছে। কী কঠিন ছিল সেই জীবন-সংগ্রাম যেখানে শেয়ালের মতো একটি ক্ষুদ্র প্রাণীও রাজার অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক'রে টিকে থাকবার চেষ্টা করছে !

৪৯ সংখ্যক চর্যাতে বলা হয়েছে—'বজ্র নৌকা পাড়ি দেওয়া হ'ল পদ্মার খালে, অদ্বয় বঙ্গাল দেশ লুণ্ঠিত হ'ল।...নিজ গৃহিণী চন্ডাল কর্তৃক গৃহীত হ'ল।...আমার সোনা রূপা কিছুই থাকল না। নিজ পরিবারে মহাসুখে থাকলাম। চতুষ্কোটি আমার ভান্ডার নিঃশেষ ক'রে দিল। জীবনেতে এবং মরায় পার্থক্য নেই।'—অশান্তি ও অরাজকতার সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি এই চর্যাটি। এমন একটি অবস্থায় পদকর্তা পতিত হয়েছেন যখন তিনি বেঁচে থাকা কিংবা ম'রে যাওয়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারছেন না। তাঁর সমস্ত ভান্ডার যে নিঃশেষ হয়ে গেছে।—এই হচ্ছে সাধারণভাবে সেকালের বঞ্চিত জনসাধারণের ছবি।

চোরের উপদ্রব খুব কম ছিল না। 'কানেট চোরে নিল অধরাতী'– এই স্পষ্ট উক্তি তো আছেই তা ছাড়াও ৩৩ ও ৩৮ সংখ্যক চর্যায় চোর-ডাকাতের উল্লেখ পাওয়া যায়। ৪ সংখ্যক চর্যায় চোরের ভয়ে ঘরে তালা-চাবি লাগানোর উল্লেখ আছে।

সমাজের নৈতিক অবস্থা খুব উন্নত ছিল এমন মনে করার কোন কারণ নেই। গৃহস্থ বধূও রাত্রে অভিসার যাত্রায় বের হয়। নাগরালী, কামচন্ডালী ছিনালী, পতিতা, লম্পট প্রভৃতি রূপক চর্যাগুলিতে একাধিক বার ব্যবহৃত হয়েছে। এগুলি নিঃসন্দেহে তৎকালীন সমাজের নৈতিক অধঃপতনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে। সেকালের বাংলাদেশের যৌন-অনাচারের উল্লেখ বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্রেও পাওয়া যায়। "বাৎস্যায়ন তাঁহার কাম সূত্রে গৌড়-বঙ্গের রাজান্তঃপুরে কামচাতুর্যলীলার এবং নির্লজ্জ কামক্রিয়ার উল্লেখ করিয়াছেন (তৃতীয়-চতুর্থ শতক), এবং বৃহস্পতি বলিয়াছেন যে, প্রাচ্যদেশের দ্বিজবর্ণের মেয়েরা যৌন-ব্যাপারে দুর্নীতিপরায়ণ।...ব্রাহ্মণ শূদ্র-নারীকে বিবাহ করিতে পারিত না, কিন্তু শূদ্র নারীর সঙ্গে বিবাহ-বহির্ভূত যৌন সম্বন্ধে তাহার বিশেষ কোনো বাধা ছিলনা, নামমাত্র প্রায়শ্চিত্তেই সে অপরাধ কাটিয়া যাইত– ইহাই সমসাময়িক বাংলার স্মৃতি শাস্ত্রের বিধান।"[১০] অতএব দরিদ্রা অস্পৃশ্যার বাড়িতে উচ্চ কোটির যুবকের আনাগোনার চিত্র (৩৩ সংখ্যক চর্যা) সেকালের স্বাভাবিক সমাজচিত্র হিসেবেই গৃহীত হবে।

সমাজের নৈতিক অধঃপতনের সঙ্গে মদের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা থাকে। একটি চর্যায় মদের দোকানে মদ তৈরী ক'রে বিক্রয় করার চিত্র পাওয়া যাচ্ছে (৩ সংখ্যক চর্যা)। মদের দোকানে চিহ্ন দেওয়া থাকত যা দেখে খদ্দের আসত সেখানে। এ ছাড়াও অনেকে নিজের বাড়িতেই মদ তৈরী ক'রে নিত। মদ তৈরীর উপাদানরূপে চিকণ ঃ বাকল এবং কঙ্গুচিনার উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। ৫০ সংখ্যক চর্যায় শবর-শবরীর মদে মাতাল হওয়ার চিত্র আছে।

সেকালে নৃত্যগীতবাদ্য ও অভিনয়-কলার ব্যাপক চর্চা ছিল। চর্যা গীতিগুলি রাগরাগিণী ও বাদ্যযন্ত্র সহকারে গীত হ'ত। চর্যার ডোম্বী নৃত্যকুশলা কলাবতী রমণী।

এক সো পদমা চউসট্‌ঠী পাখুড়ি।
তহিঁ চড়ি নাচই ডোম্বি বাপুড়ি।।

একটি পদ্মের চৌষট্টি পাপড়ীতে চ'ড়ে ডোম্বী নাচে। অসাধরণ নৃত্য-কুশলা ঐ ডোম্বী—এখানে বড়ো চমৎকার ভাষায় তা প্রকাশ পেয়েছে। আর একটি চর্যায় পাওয়া যায়—

নাচন্তি বাজিল গা অন্তি দেবী।
বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই।।

বজ্রধর নাচছেন, দেবী গাইছেন—এই ভাবেই বুদ্ধ-নাটকের কঠিন অভিনয় সুসম্পন্ন হচ্ছে। সম্ভবত নৃত্যগীতবাদ্যের মাধ্যমে বুদ্ধদেবের যে জীবনলীলা অভিনীত হ'ত তাকেই বলা হ'ত বুদ্ধনাটক। এই নাটকে যে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার হ'ত তারও বর্ণনা উক্ত চর্যাতেই পাওয়া যাচ্ছে—

সুজ লাউ সসি লাগেলি তান্তী।
অণহা দান্ডী চাকি কিঅউ অবধূতী।।
বাজই আলো সহি হেরুঅ বীণা।
সুণ তান্তি ধনি বিলসই করুণা।।

সূর্য হ'ল বীণার লাউ (অর্থাৎ খোল), চন্দ্রকে করা হ'ল তন্ত্রী। অনাহতকে করা হ'ল ডাণ্ডা এবং চাকি করা হ'ল অবধূতীকে। ওলো সখি, হেরুক-বীণা বাজছে, করুণাধ্বনি শূন্যতা-তন্ত্রিত বিলসিত হচ্ছে। স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে লাউ-এর খোলা আর বাঁশের ডান্ডাতে তার লাগিয়ে তার সঙ্গে চাকি জুড়ে দিয়ে এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র তৈরী হ'ত। বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের নাম চর্যাগুলিতে পাওয়া যাচ্ছে, যেমন—পটহ, মাদল, করন্ড, কসাল, দুন্দুভি, ডমরু, ডমরুলি, বীণা ইত্যাদি। ধর্মীয় উৎসব কিংবা বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়াকর্মে বাদ্য সহযোগে নৃত্যগীতাদি অনুষ্ঠিত হ'ত। ১৯ সংখ্যক চর্যায় একটি বিবাহ-যাত্রার বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে—

ভব ও নির্বাণ হ'ল যথাক্রমে পটহ ও মাদল। মন ও পবন হ'ল দু'টি বাদ্যযন্ত্র, যথা করন্ড ও কশালা। দুন্দুভিতে জয় জয় শব্দ উচ্ছলিত হ'ল' কানু চললেন ডোম্বীকে বিয়ে করতে।

এই বিবাহ উপলক্ষেই পদটির পরবর্তী চরণ থেকে যৌতুক লাভের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। মনে হয়, বিয়ে ক'রে সেকালে বরপক্ষ যৌতুক লাভ করত।

তৎকালীন বাঙালীর একেবারে ঘরোয়া-জীবনের পরিচয়ও চর্যাগুলিতে দুর্নিরীক্ষ্য নয়। বধূরা শ্বশুর-শাশুড়ী-ননদ প্রভৃতিদের সঙ্গে একত্রে ঘর করত, বাপ-মায়ের সঙ্গে শ্যালিকার উল্লেখ থাকায় মনে হয়, অনেক সংসারে শ্যালিকারাও সেকালে প্রতিপালিত হ'ত। হাঁড়িতে ভাত না থাকাটাই সংসারের চরম বিপর্যয়কর অবস্থা বিবেচিত হওয়ায় মনে হয় ভাতই ছিল প্রধান খাদ্যবস্তু। হরিণ শিকারের উল্লেখ থাকায় বুঝা যাচ্ছে হরিণের মাংসও তখন বাঙালীর প্রিয় খাদ্য ছিল। তবে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণরা মাংসাশী ছিলেন না—এই অনুমানই অধিকতর যুক্তিসংগত হ'তে পারে। কেননা চর্যাতে মূলতঃই নিম্নবর্ণের সাধারণ মানুষের পরিচয়ই মূর্ত হয়ে উঠেছে। দুধের উল্লেখ একাধিক চর্যায় পাওয়া যায়। দুধ-ভাত চিরদিনই বাঙালীর প্রিয় খাদ্য।

দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর একটি তালিকা চর্যাগুলি থেকে তৈরী করা যায়—

বাসন-পত্র :—পীঢ়া (দুধ দুইবার পাত্রবিশেষ), ঘড়ি (ঘড়া), ঘড়ুলী (ছোট ঘটী), হাঁড়ি ইত্যাদি। অলংকার ও প্রসাধন সামগ্রী: বাজন-নূপুর (ঘন্টা নেউর), কুন্ডল, মুক্তাহার, কাঁকণ, সোনা-রূপা, তেল, আয়না ইত্যাদি। সংসারে নিত্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্য:—কুঠার, টাঙ্গি, পিঁড়ি, চাঙ্গারি, পেটরা ইত্যাদি।

এ ছাড়া সাঁকো তৈরী (৫ সংখ্যক চর্যা), গৃহ নির্মাণ (৫০ সংখ্যক চর্যা) প্রভৃতি বাঙালী-জীবনের অবিচ্ছেদ্য কর্মসূচীর অংশ ছিল। ঘর সাধারণতঃ বাঁশের চাঁচাড়ি এবং খড় দ্বারা তৈরী হ'ত। খড়ের ঘর আগুন লেগে পুড়ে যাওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে ৪৭ সংখ্যক চর্যায়।

বিভিন্ন বৃত্তিজীবী বাঙালীর পরিচয় কয়েকটি চর্যায় পাওয়া যায়। নৌকা বাওয়া, হরিণ শিকার, মদ্য প্রস্তুত, এবং দস্যুবৃত্তির কথা পূর্বেই প্রসঙ্গক্রমে লক্ষ করেছি। ধুনরীদের তুলা ধুনার চিত্রও এখানে লক্ষ করা যেতে পারে—

তুলা ধুণি ধুণি আঁসুরে আঁসু
আঁসু ধুণি ধুণি নিরবব সেসু ॥

সেকালের কর্মরত মানুষকে বড়ো সুন্দরভাবে পাওয়া যায় এখানে। কুঠার দ্বারা বৃক্ষ ছেদনের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে ৪৫ সংখ্যক চর্যায়।

আমন ধানে ইঁদুরের উপদ্রবের কথা পাচ্ছি ২১ সংখ্যক চর্যায়। কৃষিকার্যের কোনো স্পষ্ট উল্লেখ অন্যত্র না থাকলেও এখানে তার ইঙ্গিত অত্যন্ত স্পষ্ট। ইঁদুরের উপদ্রবে সেকালের কৃষি হয়ত অনেক সময়ই বিপর্যস্ত হ'ত।

'তান্তি বিকণহ ডোম্বী অবর ণো চাঙ্গেড়া'—এই চরণের ইঙ্গিত থেকে মনে হয় ডোম্বীদের জাতীয় বৃত্তি ছিল তাঁত বোনা ও চাঙ্গারি তৈরি করা।

সেকালের গৃহপালিত পশুর মধ্যে গরুই ছিল প্রধান। একাধিক চর্যায় বলদ ও গাভির উল্লেখ পাওয়া যায়। হাতীও যে সেকালের গৃহপালিত পশুর মধ্যে ছিল তাও স্বচ্ছন্দে অনুমান করা চলে। হাতী বাঁধার স্তম্ভ ও শিকলের উল্লেখ একাধিক চর্যায় পাওয়া যাচ্ছে। সম্ভবত হাতী ছিল কেবলি ধনীদের গৃহপালিত পশু। তবে সেকালে অরণ্য-ভূমির প্রাচুর্য হেতু সাধারণের পক্ষেও হাতী পোষা খুব একটা ব্যয়বহুল হ'ত ব'লে মনে হয় না।

এইভাবে চর্যাগীতিগুলি ভালোভাবে পর্যালোচনা করলে তৎকালীন জীবনের অনেক বাস্তব চিত্র এতে পাওয়া যাবে। আগেই বলেছি, এই যে বাস্তব চিত্র চর্যাগুলিতে পাওয়া যাচ্ছে তা হচ্ছে অন্ত্যজ-জীবনের। দেশের রাজনৈতিক অথবা উচ্চকোটির মানুষের সামাজিক জীবন চর্যাগুলিতে বড়ো একটা প্রতি-ফলিত হয়নি। তবে একেবারে হয়নি বললে কিছুটা ভুল বলা হবে। পূর্বের আলোচনাতেই আমরা দেখছি 'উচ্চবর্ণের মধ্যে সেকালে যৌন-অনাচার ছিল খুব বেশি।' উচ্চবর্ণের লোকেরা নিম্নবর্ণের লোকদের যেমন অস্পৃশ্য বিবেচনা করত তেমনি নিম্নবর্ণের মানুষের কাছে তারা ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের পাত্রও হ'ত কখনো কখনো। একটি চর্যায় তো ব্রাহ্মণদের প্রতি প্রকাশ্য ব্যঙ্গ প্রদর্শিত হয়েছে, তাদের বলা হয়েছে 'নেড়ে বামুন'। উচ্চবর্ণের লোকদের মধ্যে সোনা-রুপার ব্যবহার ব্যাপক ছিল মনে হয়। ৮ সংখ্যক চর্যায় সোনা-রুপায় নৌকা

ভ'রে বেয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। এইভাবে ধনরত্ন বোঝাই ক'রে চলতে পথে যে জলদস্যুর দ্বারা হৃত-সর্বস্ব হওয়ার ভয় ছিল তাও জানা যাচ্ছে দু'টি চর্যায় (৩৮ ও ৪৯)।

দাবা খেলার রূপক একটি চর্যায় (১২ সংখ্যক) ব্যবহৃত হয়েছে। দাবা খেলা ছিল অবসর বিনোদনের একটি প্রিয় পন্থা। অনুমান করা চলে, সমাজের উচ্চতর সম্প্রদায়েরই প্রিয় খেলা ছিল এটি।

রাজা ও রাজ্যসংক্রান্ত ব্যাপারও দু-একটি পদে লক্ষ করা যাচ্ছে—

দাঢ়ই হরিহর বামহ ভট্টা।
ফীটা হই নবগুন শাসন পট্টা॥

সেকালের রাজারা শাসন-পট্ট প্রচার করতেন। এখানে চরণ দুটি থেকে সেকালের রাজ্য-সংক্রান্ত কোনো দুর্যোগের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।—হরি-হর-ব্রহ্ম দগ্ধ হয়। দগ্ধ হয় নবগুণ শাসন-পট্ট। স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে, হরি-হর-ব্রহ্মা শব্দ গুলির দ্বারা রাজ্যের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সর্বব্যাপী ধ্বংসের মুখে রাজার শাসন-পট্ট (সুবিচার ?) বিলুপ্ত। ৪৮ সংখ্যক চর্যাটি পাওয়া যায়নি। কিন্তু তার তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে সুকুমার সেন যে কল্পিত পাঠ্য স্থির করেছেন তাতে দেখা যায়—

বিষয় ইন্দিপুর সব্ জিতেল
শূনরাঅ মহাসুহে ভইল॥
তুর শাঙ্খ ধ্বনি অনহা গাজই
মোহ ভববল দূরে ভাজই॥

"বিষয়েন্দ্রিয়ের দুর্গসমূহ জিত হইল, শূন্যরাজ মহাসুখী হইলেন। তূর্য-শঙ্খ–ধ্বনি অনাহত গর্জন করিল, সংসার-মোহ (রূপ) সৈন্য দূরে পালাইল।"[৫১]

বলাই বাহুল্য, এটি যুদ্ধ-বর্ণনা। রাজ্য-চালনা সংক্রান্ত আরো দু'একটি খুঁটি নাটি সংবাদ অন্যান্য চর্যা থেকেও পাওয়া যায়। 'উআরি' ও 'দুষাধি' শব্দ দুটি পাওয়া যাচ্ছে যথাক্রমে ১২ ও ৩৩ সংখ্যক চর্যায়। উআরি হচ্ছে কাছারি আর দুষাধি অর্থ চর বা গুপ্তচর। এ সব ছিল রাজ্য-শাসনের অপরিহার্য

অঙ্গ। ১৫ সংখ্যক চর্যায় 'গুমা' শব্দটি পাওয়া যাচ্ছে থানা অর্থে। জানা যাচ্ছে, নদীঘাটে যেখানে বাণিজ্যিক পণ্যের চলাচল অধিক হ'ত সেখানেই শুল্ক-আদায়ের জন্য কর্মচারী বসানো হ'ত। রাজ্যশাসন ব্যাপারে এর অধিক কিছুই জানা যায় না।

এতোক্ষণের আলোচনা থেকে এ কথা আশা করি স্পষ্ট হয়েছে যে, তৎকালীন দেশ-কাল ও সমাজ-জীবনের নানাবিধ পরিচয়ে চর্যাগীতিকাগুলি সমৃদ্ধ। এগুলির মধ্য দিয়ে আমাদের অতীতকে যেন জীবন্তরূপে স্পর্শ করতে পারি।

পাদটীকা

১—অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১ম), ২য় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৬৩, পৃঃ ১৫৭

২—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—বৌদ্ধগান ও দোহা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, কলিকাতা, ১৩৫৮, পৃঃ মুখবন্ধ ৩

৩-ঐ পৃঃ মুখবন্ধ ২

৪—ঐ, পৃঃ মুখবন্ধ ৪

৫—অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬১

৬—ঐ, পৃঃ ১৬২

৭—সুকুমার সেন—চর্যাগীতি-পদাবলী, বর্ধমান, ১৯৫৬. পৃঃ ১

৮—মণীন্দ্র মোহন বসু—চর্যাপদ, পৃঃ /০

৯—ঐ, পৃঃ ৵০

১০—তিব্বতে যে সকল ভারতীয় গ্রন্থের অনুবাদ সেকালে হয়েছিল, সেগুলো দুভাগে বিভক্ত ক'রে তালিকাভুক্ত করা হ'ত (১) কেঙ্গুর, (২) তেঙ্গুর। কেঙ্গুর তালিকায় সেই সকল গ্রন্থ স্থান পেত যেগুলোতে বুদ্ধদেবের বাণী থাকত; অবশিষ্ট অন্যান্য গ্রন্থ তেঙ্গুর তালিকায় স্থান পেত।

১১—S. K. Chatterjee–Origin and Development of Bengali Language vol I. p. 120-123.

১২—অসিত কুমার বন্দ্যোপধ্যায়—প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৭

১৩—মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্—বাংলা সাহিত্যের কথা (১ম খন্ড), (পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, ঢাকা ১৯৬৩) পৃঃ ১-৮

১৪—ঐ, পৃঃ ৮

১৫—ঐ, পৃঃ ৩

১৬—S. K. Chatterjee Op. Cit. p. 122

১৭—নলিনীনাথ দাশগুপ্ত—বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম, পৃঃ ১০৮

১৮—মুহম্মদ শহীদুল্লাহ—প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫

১৯—ঐ পৃঃ ২৭-৭২

২০—ঐ, পৃঃ ২৭-২৮

২১-সুকুমার সেন—প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫ ও ১০

২২—ঐ, পৃঃ ৬

২৩—মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্—প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫১

২৪—K. L. Barua– Early History of Kamarupa p. 149

২৫—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—প্রাগুক্ত পৃঃ ৮

২৬—S. B. Dasgupta-Obscure Religious Cults as background of Bengali Literature, Calcutta 1946, p. 27

২৭—শশীভূষণ দাসগুপ্ত—ভারতীয় সাধনার ঐক্য, কলিকাতা ১৩৫৮, পৃঃ ২০

২৮—মণীন্দ্র মোহন বসু—প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৮৶০

২৯—ঐ; পৃঃ ৪/০

৩০—শশিভূষণ দাসগুপ্ত—প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪

৩১—সুকুমার সেন—প্রগুক্ত, পৃঃ ৩[illegible]

৩২—মুহম্মদ শহীদুল্লাহ—প্রাগুক্ত পৃঃ ৮৪

৩৩—সুকুমার সেন—প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৯

৩৪—সত্যব্রত দে - চর্যাগীতি পরিচয়, কলকাতা ১৯৬০, পৃঃ ২৫

৩৫—মুহম্মদ শহীদুল্লাহ—প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৮

৩৬—বিধুশেখর শাস্ত্রী—Indian Historical Quarterly vol. IV, 1923

৩৭—P. C. Bagchi—Studies in the Tantras, p. 27

৩৮—সত্যব্রত দে—প্রাগুপ্ত পৃঃ ৩২

৩৯—নীহার রঞ্জন রায়–বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব) কলিকাতা, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ পৃঃ ৭০৫-০৬

৪০—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮০

৪১—ঐ, পৃঃ ১৭৯-৮০

৪২—রাজ্যেশ্বর মিত্র–বাঙলার সঙ্গীত (১ম খন্ড) পৃঃ ৪৫

৪৩—নীহার রঞ্জন রায়—প্রগুক্ত পৃঃ ৭৬৪

৪৪–সুকুমার সেন—প্রাগুক্ত, পৃঃ ২

৪৫—অরবিন্দ পোদ্দার—মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ, কলিকাতা, ১৯৫২ পৃঃ ২৮-৩৩

৪৬ ঐ, পৃঃ ৩৭

৪৭—মুহম্মদ শহীদুল্লাহ—Buddhist Mystic Songs, Dacca, 1966, p. 12.

৪৮—সত্যব্রত দে—প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১১-১২

৪৯—অরবিন্দ পোদ্দার—প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০

৫০—নীহার রঞ্জন রায়—প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫২৬

৫১—সুকুমার সেন - প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১১

চর্যাগীতিকা

মূল ও অনুবাদ (শব্দার্থ ও টীকাসহ)

সংকেত-বিবৃতি

(ক) বৌদ্ধগান ও দোহা (চর্যাচর্য্যবিনিশ্চয়)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

(খ) Buddhist Mystic Song (Revised and Enlarged Edition : 1966)
—মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্)

(গ) Materials for a Critical Edition of the Old Bengali Caryapadas
—প্রবোধ চন্দ্র বাগচী

(ঘ) চর্যাগীতি-পদাবলী —সুকুমার সেন

(ঙ) মূল পুথির পাঠ

॥ ১ ॥

লুইপাদানাম্

রাগ- পটমঞ্জরী

কাআ তরুবর পাঞ্চ[১] বি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠা[২] কাল ॥ [ধ্রু] ॥
দিঢ়[৩] করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।
লুই ভণই গুরু পুছিঅ[৪] জাণ ॥ ধ্রু ॥
সঅল সমাহিঅ[৫] কাহি করিঅই।
সুখ দুখেতে[৬] নিচিত মরিঅই[৬] ॥ ধ্রু ॥
এড়িঅউ[৭] ছান্দ[৮] বান্ধ করণ[৯] কপটের[১০] আস।
সুনু[১১] পখে ভিড়ি[১২] লাহু রে পাস ॥ ধ্রু ॥
ভণই লুই আমহে ঝাণে[১৩] দীঠা[১৪]।
ধমণ চবণ[১৫] বেণি পিন্ডি[১৬] বইঠা[১৭] ॥ ধ্রু ॥

পাঠান্তর :-

১. পঞ্চ (ক) ২. পইঠো (ক) ৩. দিটু (ক) ৪. পুচ্ছিঅ (ক, ঘ) ৫. সহিঅ (ক) ৬. মরিআই (ক, ঘ) ৭. এড়িএউ (ক) ৮. ছান্দক (ক) ৯. করণক (ক, ঘ) ১০. পাটের .ক, ঘ) ১১. সুনু (ক, ঘ) ১২. ভিতি (ক) ১৩ সাণে (ক, ঘ) ১৪. দিঠা (ক, ঘ) ১৫. চমণ (ক, ঘ) ১৬ পান্ডি)ক গ) ১৭. বইণ (ক)

শব্দার্থ, টীকা, ব্যুৎপত্তি :-

কাআ–কায়। পাঞ্চ বি—পাঁচটিই; বি—অপি-জাত। চীএ—চিত্ত+এ (সপ্তমীর চিহ্ন) > চীঅ+এ=চীএ। পইঠা—প্রবিষ্টঃ> পইট্‌ঠ>পইঠ+ আ। দিঢ় < দৃঢ়। করিঅ < করিত * < কৃত। মহাসুহ < মহাসুখ। পরিমাণ—প্রমাণম্ > পরিমাণম্ > পরিমাণ। ভণই < ভণতি। পুছিঅ < পুঁছিঅ<পৃচ্ছিত*। জাণ—জানথ> জাণহ > জাণঅ > জাণ। সঅল< সকল। সমাহিঅ<সমাধিভিঃ। কাহি—কস্য>কা+হি। করিঅই < কর্যতে* < ক্রিয়তে—করা হয়।

দ্বখেতে'—দ্বঃখ>দ্বখ+ত (অন্ত-জাত)+এঁ (<এন)। নিচিত< নিশ্চিত মরিঅই—ম্রিয়তে > মর্য'তে* > মরিঅই। এড়িঅউ ছাড় (অন্বজ্ঞা)। ছান্দ—ছন্দ, আদি হ্রস্বস্বর দীর্ঘ হয়েছে (চর্যাপদের স্বরের হ্রস্বদীর্ঘ উচ্চারণের কোনো সম্পষ্ট নিয়ম পাওয়া যায় না)। বান্ধ<বন্ধনম্। করণ—ইন্দ্রিয়। আস<আশা। সন্নপাখ <শূন্যপক্ষ। ভিড়ি-অসমাপিকা ক্রিয়া, ভিড়িয়া। লাহ—লও; লভ > লহ > লাহ+উ (অন্বজ্ঞায়)। পাস<পার্শ্ব। আম্হে<অস্মাভিঃ। ঝাণে— ধ্যানেন>ঝাণে। দিঠা<দিট্‌ঠ<দৃষ্ট। ধমন<ধ্যান পূরক বায়্ু। চবণ<চ্যবণ; রেচক বায়্ু। বেণি—দ্বীণি>বেন্নি>বেণি; দুই। পিন্ডী —পিঁড়ি। বইঠা—উপবিষ্ট>বইঠ+আ।

আধ্বনিক বাংলায় রূপান্তর ঃ—

শ্রেষ্ঠ তর্ (সদৃশ) এই শরীর, পাঁচটাই তার ডাল। চঞ্চল চিত্তে (ধ্বংস-রূপী) কাল প্রবেশ করে। (এই চিত্তকে) দৃঢ় ক'রে মহাসুখ পরিমাণ কর। লুই বলেন, গুরুকে শুধিয়ে জেনে নাও (কিভাবে তা করতে হয়)। কেন করা হয় সমস্ত সমাধি? সুখে-দুঃখে সে নিশ্চিত মারা যায়। (যোগাচারের) ছন্দ-বন্ধ (এবং) কপট ইন্দ্রিয়ের আশা পরিত্যাগ কর। শূন্যতা-পক্ষে ভিড়ে পার্শ্বে নাও (শূন্যতা-পক্ষের দিকে এগিয়ে যাও)। লুই বলেন—আমি ধমন চমন (নামক) দুই পিঁড়িতে উপবিষ্ট হয়ে ধ্যানে (শূন্যতাকে) দেখেছি।

অন্তর্নিহিত ভাব ঃ—

শরীরের পাঁচ ইন্দ্রিয় পাঁচটি ডাল স্বরূপ। এই পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা বাইরের বস্তুজগতের সঙ্গে মানুষের নিত্য জানাশোনার পালা চলেছে—জানাশোনা যতোই বাড়ে ততই বেশী ক'রে প্রীতির সঞ্চার হয় এবং বস্তুজগৎকেই চরম ও পরম জ্ঞান ক'রে মানুষের তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু বস্তুজগতের মায়ামোহ-বন্ধন মানুষের জন্য ধ্বংসের পথ। বাঁচার পথ দেখাতে পারেন গুরু। সেই গুরুর নির্দেশে ইন্দ্রিয়ের পথ পরিহার ক'রে যোগ-সাধনার পথ বেছে নিতে হবে। সিদ্ধাচার্য লুইপাদ সে কথা বুঝেছেন, এবং তাই যোগ সাধনায় উপবিষ্ট হয়েছেন।

।।২।।

কুক্কুরীপাদানাম্

রাগ—গবড়া

দুলি দুহি পীঢ়া[১] ধরণ ন জাই।
রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাই[২] ।।ধ্রু।।
আঙ্গন ঘরপন সুন ভো বিআতী।
কানেট চোরে[৩] নিল অধরাতী।। ধ্রু।।
সসুরা[৪] নিদ গেল বহুড়ী জাগই[৫]।
কানেট চোরে নিল কা গই মাগই[৬]।।ধ্রু।।
দিবসহি[৭] বহুড়ী কাউঁহি[৮] ডর[৯] ভাই[১০]।
রাতি ভইলে কামরু জাই[১১]।।ধ্রু।।
অইসনী[১২] চর্য্যা কুক্কুরীপা এঁ গাইল[১৩]।
কোড়ি মাঝেঁ[১৪] একু হিঅহিঁ[১৫] সমাইল[১৬]।।ধ্রু।।

পাঠান্তর :—

১. পিটা (ক, ঘ) ২. খাঅ (ক, ঘ) ৩. চৌরি (ক, গ, ঘ) ৪. সুসুরা (ক) ৫. জাগঅ (ক, ঘ) ৬. মাগঅ (ক, ঘ) ৭. দিবসই (ক, ঘ) ৮. কাড়ই (ক), কাউই (ঘ) ৯. ডরে (ক) ১০. ভাঅ (ক, ঘ) ১১. জাঅ (ক, ঘ) ১২. অইসন (ক), (অইসনি (ঘ) ১৩. গাইড (ক), গাইড (ঘ) ১৪. মঝেঁ (ক, ঘ) ১৫. একুড়ি অহিঁ (ক) ১৬. সনাইড় (ক), সমাইউ (ঘ)

শব্দার্থ, টীকা, ব্যুৎপত্তি :—

দুলি—কচ্ছপী; এখানে মহাসুখকমল, যেখানে দ্বয়াকার বা দ্বৈতভাব লীন হয়। দুহি—√দুহ্ + ক্তাচ্ (>ইঅ>ই)। পীঢ়া—ভাঁড়; বজ্রমানিরূপ পিঁড়ি। ধরণ - √ধৃ> ধর + ন (অস্তি-জাত)। ন—না। জাই—যাই < যাতি। রুখের—

বৃক্ষ>রুক্খ> রুখ + এর (কেরব-জাত)। তেন্তুলি<তিন্তিড়ী—তেঁতুল। খাই—খদতি>খাঅই>খাঅ খাএ খাই। আঙ্গন-অঙ্গন। ঘরপণ—ঘরসংসার; গৃহত্বন*>ঘরপণ—। সুন<শ্রুণু*<শৃণু—শোন। ভো—সম্বোধন সূচক তৎসম শব্দ। বিআতী - বাদয়িন্তিকা> বাএন্তিআ>বিআতী; স্ত্রীবাদ্যকর। কানেট<কন্যাপট্ট। অধরাতী< অদ্ধরত্তিএ<অর্দ্ধরাত্রৌ। সসুরা শ্বশুর। নিদ<নিদ্রা। বহুড়ী—বধূটিকা>বধূটী>বহুড়ী। জাগই—জাগতি'>জাগ্রতি* >জাগই। কা—কাহাকে, কি; কস্য>কা। গই—গিয়ে; গমিত>গইঅ>গই। মাগই<* মাগতি। দিবসহিঁ দিবস+হি (অধিকরণে)। কাউহি—কাক হইতে; কাক>কাঅ, কাউ+হি (পঞ্চমীর চিহ্ন)। ভাই—ভীত হয়; ভায়তি*>ভাঅই>ভাই। ভইলে—হইলে; ভইল (ভূত+ইল্ল) +এ (<ই<হি)। অইসনী ঈদৃশীন>অইসন+ঈ স্ত্রীলিঙ্গে); এমন, এ হেন। গাইল—গীত ইলি (<ই) কোড়ি<কোটি। মাঝেঁ—মধ্য>মজ্ঝ > মাঝ + এঁ (অধিজাত)। একু<একো<একঃ। হিঅহিঁ—হৃদয়>হিঅ + হি (সপ্তমী)। সমাইল - সম্মাপয়তি> সম্মাবেই>সামাই + ইল।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর :

কচ্ছপ দোহন ক'রে ভাঁড়ে ধরা যাচ্ছেনা। কুমীরে খেয়ে নিচ্ছে গাছের তেঁতুল। শোনো ওগো বাদ্যকরী, ঘরের পানে অর্থাৎ মধ্যে অঙ্গন। অর্ধরাত্রে 'কানেট' নিল চোরে। শ্বশুর ঘুমিয়ে গেল, বধূ জেগে। চোরে নিল কানেট, কি (আর) খোঁজ করবে গিয়ে; দিনের বেলা বউটি কাকের ভয়ে ভীত হয়। (কিন্তু) রাত হ'লেই (সে) কামরূপ যায়। এমন চর্যা গাইছেন কুক্কুরীপাদ। কোটি জনের মধ্যে (কেবল) একটি হৃদয়েই তা প্রবেশ করে।

অন্তর্নিহিত ভাব :—

মহাসুখকমল দোহন ক'রে বজ্রমণিরূপ পিঁড়তে রাখা যাচ্ছেনা অর্থাৎ ইড়াপিঙ্গলাকে বশীভূত ক'রে দ্বৈতভাব দূর করা এবং বোধিচিত্তকে নির্বাণমার্গে

চালিত করা যাচ্ছেনা, তার ফলে সহজানন্দ-লাভও সম্ভব হচ্ছেনা। দেহতরুর ফল তেঁতুলরূপী চিত্তকে কুমীরে খায় অর্থাৎ কুম্ভক সমাধি দ্বারাই চিত্তকে নিঃস্বভাব করা যেতে পারে। দেহরূপ ঘরের ভিতরেই অঙ্গন—মহাসুখরূপ বা সহজানন্দরূপ সেই অঙ্গনে নির্বাণ লাভ করা যায়। অর্ধরাত্রি হচ্ছে প্রজ্ঞাজ্ঞানের অভিষেক দানের সময়—ঐ সময় সহজানন্দরূপ চোর কানেট-রূপী প্রকৃতি-দোষ হরণ করে। শ্বাসবায়ু যখন স্থির তখন জেগে থাকে পরিশুদ্ধ প্রকৃতি-রূপিণী বধূ। এই বধূ দিনের বেলা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির সজাগ অবস্থায় বস্তু-জগতের ভয়াবহ পরিণতি দেখে ভীত সংকুচিত হয়। কিন্তু রাত্রে ইন্দ্রিয়াদি সুষুপ্ত হ'লে সে পরিশুদ্ধাবস্থায় নির্বিকল্পাকারে কামরূপে অর্থাৎ মহাসুখসঙ্গমে গমন করে।

॥ ৩ ॥

বিরুবাপাদানাম্

রাগ—গবড়া

এক সে শুণ্ডিনী[১] দুই ঘরে সান্ধই[২]।
চীঅণ বাকলত[৩] বারুণী বান্ধই[৪]॥ ধ্রু॥
সহজে থির করি[৫] বারুণী সান্ধ[৬]।
জে অজরামর হোই দিঢ়[৭] কান্ধ॥ ধ্রু॥
দশমি দুআরত চিহ্ন দেখিআ[৮]।
আইল গরাহক আপণে[১০] বহিআ॥ ধ্রু॥
চউশঠী ঘড়িয়ে দেউ[১১] পসারা।
পইঠেল গরাহক নাহি নিসারা॥ ধ্রু॥
এক খড়ুলী[১২] সরুঅ[১৩] নাল।
ভণন্তি বিরুআ থির করি চাল॥ ধ্রু॥

পাঠান্তর ঃ—

১৷ শুন্ডিনিণী (ঙ) ২৷ সান্ধঅ (ক) ৩৷ বাকুলঅ (ক) ৪৷ বান্ধঅ (ক) ৫. করী (ক, ঘ) ৬৷ সান্ধে (ক, ঙ), বান্ধ (ঘ) ৭৷ দিট (ক) ৮৷ কান্ধঃ (ক) ৯৷ দেখইআ (ক) ১০৷ অপণে (ক) ১১৷ দেট (ক), দেত (ঘ) ১২. স ড়ুলী (ক) ১৩৷ সরুই (ক)

শব্দার্থ, টীকা, ব্যুৎপত্তি ঃ—

শুন্ডিনী—শুঁড়িনী, শৌন্ডিকের স্ত্রী; শৌণ্ডিক>শুণ্ড—স্ত্রীলিঙ্গে শুণ্ডিনী। সান্ধই - সান্ধায়, প্রবেশ করে; সন্ধয়তি>সান্ধই। চীঅণ <চিক্কণ। বাকলত—বাকল দ্বারা; বল্কল>বাকল+ত (করণ কারকে)। বারুণী—মদ; তৎসম শব্দ। বান্ধই<বন্ধয়তি—বাঁধে, এখানে চোলাই করে। সহজে — সহজ+এ (এখানে দ্বিতীয়া)। থির<স্থির। সান্ধ মদ গাঁজায় (?), তুঁ — ধোঞাউরি ধানে মদিরা সাঁধ (বিদ্যাপতি — কীর্তিলতা), সন্ধাপয়তি*> সান্ধ>সান্ধ। জে<যেন। হোই - হয়; ভবতি > হোই। কান্ধ <স্কন্ধ—দেহ; এটি বৌদ্ধ মতের পারিভাষিক শব্দ; বৌদ্ধ মতে আমাদের দেহ রূপ, বেদনা সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান—এই পঞ্চ স্কন্ধের সমাহার; আত্মা সম্পর্কে বৌদ্ধ মতে কোন কথা বলা হয়নি। দশমি দুআরত — দশমিক > দশমি, দ্বার> দুআর+ত (অধিকরণে); নবদ্বারের অতিরিক্ত যে দ্বার—বৈরোচনদ্বার, নির্বাণরূপ দশম দ্বার। দেখিআ<দৃক্ষিত*—দেখিয়া। আইল< আরাত + ইল্ল। গরাহক < গ্রাহক (বিপ্রকর্ষ)। আপণে— আত্মন > আপ্পণ > আপণ + এ (<এন, তৃতীয়ার চিহ্ন)। বহিআ—বহ+ইআ (ক্তাচ্)। চউশঠী<চতুঃষষ্টি। ঘড়িয়ে— ঘড়ায়; ঘটী>ঘড়ি+এ (কারণে অথবা অধিকরণে)। দেউ <দিতকঃ* — দেওয়া হইয়াছে। পসারা — পণ্যশালা > পন্নসারা >পণসারা > পসারা। পইঠেল — প্রবিষ্ট + ইল্ল > পইট্ঠ +ইল > পইঠেল। নিসারা।<নিঃসার। ঘড়ুলী—ঘট>

ঘড়+উলী (ক্ষুদ্রার্থে) >ঘড়ুলী। সরুঅ <সরু+ক, অথবা সরূপ>সরুঅ। বিরুআ<বিরূবা।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর :–

এক সে শুঁড়িনী দু-ঘরে ঢোকে। চিকন বাকল দিয়ে সে বারুণী মদ চোলাই করে। (ওলো শুঁড়িনী)! সহজকে স্থির রেখে (তুই) বারুণী চোলাই কর, যাতে তোর দেহ অজর অমর ও দৃঢ় হয়। দশম দ্বারে চিহ্ন দেখে খদ্দের নিজেই (পথ) বেয়ে এল। চৌষট্টি ঘড়ায় মদের পসরা সাজিয়ে দেওয়া হ'ল। খদ্দের ঘরে ঢুকল, আর তার নিষ্ক্রমণ নেই। একটি ছোট্ট পাত্র, সরু তার নল। বিরূবা বলছেন—চাল সে স্থির ভাবে।

অন্তর্নিহিত ভাব :—

ইড়া ও পিঙ্গলাকে অবধূতিকায় প্রবিষ্ট করানো ব্যাপারটিকে এখানে রূপকভাবে বলা হয়েছে যে—শুঁড়িনী দু-ঘরে ঢোকে। শুঁড়িনী হচ্ছে অবধূতিকা, দু-ঘর হচ্ছে যথাক্রমে ইড়া ও পিঙ্গলা। বৌদ্ধ-তন্ত্র অনুসারে ইড়া-পিঙ্গলার মধ্যবর্তী সুষুম্না বা অবধূতিকায় পথে নিবৃত্তি-সাধন বা উল্টাসাধন ক'রে দেহের অমৃত রক্ষা করা যায়। দেহের অমৃত থেকে মস্তিষ্কদেশে সহস্রার পদ্মে, সেখান থেকে নিম্নগামী হ'লে দশমিদ্বার বন্ধ করে তাকে রক্ষা করতে হয়। সদজানন্দ স্থির করে এই বারুণীসন্ধানী বোধিচিত্তকে সংযত করতে হবে, তাহ'লেই দেহ অজর অমর হবে। বোধিচিত্ত যেন সেইখদ্দের, দেহমৃতারূপ মদ্যপানে মহাসুখে নিমগ্ন হওয়াই যার একমাত্র লক্ষ্য। সে দশমিদ্বারে চিহ্ন দেখে অবধূতি মার্গে প্রবেশ করে। সরু সেই অবধূতি মার্গে তাকে চালাতে সিদ্ধাচার্য উপদেশ দিচ্ছেন।

———

॥ ৪ ॥

গুন্ডরীপাদানাম্

রাগ—অরু

তিঅড্ডা[১] চাপী জোইনি দে অংকবালী
কমলকুলিশ ঘান্টে[২] করহু বিআলী ॥ ধ্রু ॥
জোইনি তঁই বিণু খনহিঁ ন জীবমি।
তো মুহ চুম্বী কমলরস পিবমি[৩] ॥ ধ্রু ॥
খেপহু[৪] জোইনি লেপন[৫] জাই[৬]।
মণিমূলে[৭] বহিআ ওড়িআণে সমাই[৮] ॥ ধ্রু ॥
সাসু ঘরে[৯] ঘালি কোঞ্চা তাল।
চান্দসুজ্জ[৯] বেণি পাখা[১০] ফাল ॥ ধ্রু ॥
ভণই গুন্ডরী[১১] আমু হেঁ[১২] কুন্দুরে বীরা।
নরঅ নারী মাঝে[১৩] উভিল[১৪] চীরা ॥ ধ্রু ॥

পাঠান্তর :—

১. তিঅড্ডা (ক) ২. ঘান্ট (ক,গ), ৩. পীবমি (ক) ৪. খেঁপহু (ক) ৫. লেপন (ক) ৬. জায় (ক,ঘ) ৭. মণিকুলে (ক, ঘ) ৮. সগাঅ (ক) সমাঅ (ঘ) ৯. সুজ্জ (ক) ১০. পখা (ক) ১১. গুড়রী (ক, ঘ) ১২. অহ্মে (ক, ঘ) ১৩. মঝেঁ (ক) ১৪. উভিল (ক)

শব্দার্থ, টীকা, ব্যুৎপত্তি :—

তিঅড্ডা < ত্রিযুক্ত, তিন তার যুক্ত; অথবা – ত্রিবৃতক > তিঅড্ডা; জঘন। চাপী <চাপইআ <চাপিঅম্বা। জোইনি <যোগিনী। দে < দেই < দদাতি; অথবা, দয়তে> দে—দেয়। অংকবালী—আলিঙ্গন; অংকপালী > অংকবালী।

কমলকুলিশ যথাক্রমে চিত্ত ও শূন্যতার রূপক; চিত্তরূপ কমলের সঙ্গে শূন্যোতারূপ বজ্রের সংযোগ সাধনের কথা এখানে বলা হচ্ছে। ঘান্টে—ঘাঁটাঘাঁটিতে; ঘৃষ্ট> ঘট্ট>ঘণ্ট, ঘান্ট+এ (করণে অথবা অধিকরণে)। করহু < করোথ ঃ—কর, মধ্যম পুরুষের ক্রিয়া। বিআলী—বিকাল, কালরহিত, বিকালিক> বিআলী। তঁই —ত্বয়া+এন > তএঁ >তঁই, তঁই। খনহিঁ - ক্ষণ>খন+হিঁ (হিম-জাত)। না—না, তৎসম শব্দ। জীবমি —জীব্ ধাতু লট্-এর উত্তম পুরুষের এক বচনে জীবামি> জীবমি। তো<তব—তোমার। মুহ<মুখ। চুম্বী<চুম্বিত; অথবা, চুম্বিতা > চুম্বিঅ > চম্বী - চুম্বন করিয়া। পিবমি <পিবামি, (পা ধাতুর লট্-এর উত্তম পুরুষ একবচনে)। খেপহুঁ < ক্ষেপেভ্যঃ; অপাদানে; বিক্ষেপ হইতে। মণিমূলে —মূলাধার অথবা মণিপুর ষটচক্রের অন্যতম চক্র বিশেষ। ওড়ি-আণে—মহাসুখচক্র < উড্ডীয়ান> ওড়িআণ + এ (৭মীর চিহ্ন)। সমাই<সমায়াতি—প্রবেশ করে। সাসু<শ্বশ্রূ। ঘালি—ঘল্ল >ঘাল+ই (অসমাপিকা), লাগাইয়া। কোঞ্চা < কুঞ্চিকা - চাবি। তাল—তলা। চান্দসুজ< চন্দ্রসূর্য। পাখা< পক্ষ। ফাল<ফাড়<স্ফাট। কুন্দুরে—কুন্দুর+এ (সপ্তমীর চিহ্ন); যোগ সাধনার অঙ্গীভূত সুরত ক্রিয়া। বীরা বীর+আ (বিশিষ্টার্থে)। নরঅ<নরশ্চ—নর এবং। মাঝেঁ মধ্য> মজ্ঝ>মাঝ+এঁ (সপ্তমী)। উভিল—উধ্ব করা হইল, উধ্ব করিলাম; উদ্ধ>উভ+ইল (উত্তম পুরুষের চিহ্ন। চীরা— "সূক্ষ্ম বস্ত্র যাহাতে পাগড়ি বা পতাকা হইত; এখানে পতাকা" সুকুমার সেন[১]; "চীরা is translated by Tib. as rtags-mtshan meaning লিঙ্গ the genital organ"— মুঃ শহীদুল্লাহ[২]।

১। চর্যাগীতিপদাবলী, বর্ধমান, ১৯৩৬, পৃঃ ১৬৩

২। Buddhist Mystic Song, (Revised & Enlarged Edition) Dacca, 1966, p. 14,

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর :–

তিন তারের (মেখলা) চেপে, যোগিনী, আলিঙ্গন দে। কমল ও কুলিশ ঘেঁটে বিকাল কর। যোগিনী, তোকে ছাড়া এক মুহূর্তেও আমি বাঁচিনে। আমি তোর মুখে চুমু দিয়ে কমলরস পান করি। বিক্ষেপ থেকেই যোগিনী লিপ্ত হয় (দোষে)। মণিমূল বেয়ে (অর্থাৎ অতিক্রম করে) উডিডয়ানে (বা মহাসুখ চক্রে) প্রবেশ করে। শাশুড়ীর ঘরে তালাচাবি দিয়ে চন্দ্রসূর্য দুই পাখা ফেড়ে ফেল। গুণ্ডরী বলছেন, আমি সুরত-কর্মে বীর। নর-নারীর মধ্যে আমি (বিজয়) পতাকা তুলে ধরলাম। অথবা, (শহীদুল্লা সাহেবের ভাষ্য অনুসারে)—নর ও নারী মাঝে লিঙ্গ ঊর্ধ্ব করলাম।

অন্তর্নিহিত ভাব :—

ইড়া-পিঙ্গলা সুষুম্না—এই তিনটি নাড়িকে আয়ত্তে এনে পরিশুদ্ধাবধূতিকা নৈরাত্মা গ্রাহ্যগ্রাহক-গ্রহণভাব নাশ ক'রে সাধককে আনন্দ দেয়। এই রকম অবস্থায় চিত্তরূপ কমলের সঙ্গে 'শূন্যতারূপ' বজ্রের সংযোগ কালরহিত অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু চিত্ত চঞ্চল হ'লে আর তা সম্ভব হয় না, নৈরাত্মা যোগিনী তখন নানা দোষে লিপ্ত হয়ে পড়ে। অতএব চিত্ত স্থির ক'রে চন্দ্রসূর্য রূপ গ্রাহ্য-গ্রাহকভাবে খণ্ডন করতে পারলেই সিদ্ধিলাভ সম্ভব। কবি এই ভাবেই সাধনা দ্বারা বীর আখ্যা লাভ করেছেন এবং নর-নারীর মধ্যে প্রকৃত যোগীন্দ্রের চিহ্ন ধারণ করেছেন।

— — —

॥ ৫ ॥

চাটিল্লপাদানাম্

রাগ—গুঞ্জরী

ভবণই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী।
দুআন্তে চিখিল মাঝেঁ ন থাহী ॥ ধ্রু ॥

ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই[১]।
পারগামী লোঅ নীভর[২] তরই ॥ধ্রু॥
ফাড়িঅ[৩] মোহতরু পাটী জোড়িঅ।
অদঅদিঢ়ি[৫] টাঙ্গি[৬] নিবাণে কোড়িঅ[৭] ।।ধ্রু।।
সাঙ্কমত চড়িলে দাহিণ বাম মা হোহি[৮]।
নিয়ড়ি[৯] বোহি দূর মা[১০] জাহি[১১] ।।ধ্রু।।
জই তুম্‌হে লোঅ হে হোইব পারগামী।
পুছহু[১২] চাটিল অনুত্তরসামী।।ধ্রু।।

পাঠান্তর :–

১. গটই (ক) ২. নিভর (ক, ঘ) ৩. ফাডিডঅ (ক, গ)
৪. পটি (ক ৫. আদঅদিটি (ক) ৬. টাঙ্গী (ক, খ)
৭. কোহিঅ (ক, গ) ৮. হোহী (ক) ৯. নিয়ডডী (ক)
১০. ম (ক) ১১. জাহী (ক, খ) ১২. পুচ্ছতু (ক)

শব্দার্থ, টীকা, ব্যুৎপত্তি :-

ভবণই<ভবনদী। বেগেঁ < বেগ+এঁ (<এন)। বাহী > রাহিঅ < বাহিত। দুআন্তে – দুই অন্তে, দু ধারে; দ্বৌ>দো>দু+আন্ত (< অন্ত)+এ (অধিকরণে)। চিখিল কাদা, কর্দমাক্ত জল; চিখল্ল > চিক্‌খল্ল*. চিক্‌খিল্ল > চিখিল। থাহী—থই; স্থাঘিক* > থাহী। ধামার্থে—ধমার্থে; ধর্ম্ম>ধম্ম>ধাম+অর্থে (উদ্দেশ্য)।
সাঙ্কম<সংক্রম—সাঁকো। গঢ়ই<গ্রথতি*—গড়ে; অথবা গঠতি> গঢ়ই—গঠন করে। পারগামি-পর পারের যাত্রী; (তৎসম শব্দ)। লোঅ<লোক। নীভর < নির্ভর। তরই < তরতি-উত্তীর্ণ হয়। ফাড়িঅ<ফাডিডঅ<স্ফাটিত। পাটী—পট্ট>পাট+ঈ (ক্ষুদ্রার্থে)। জোড়িঅ—যুক্ত>জুত্ত>জুট>জুড়, জোড়+ইঅ (অসমাপিকার চিহ্ন)। অদঅদিঢ়ি—অদঅ (<অদ্বয়) + দিঢ়ি (দৃঢ়)। টাঙ্গি— কুঠার, দেশী শব্দ। নিবাণে—নির্ব্বাণ>নিবাণ+এ (অধিকরণে)।

কোড়িঅ - কোড়া হইল; কুটিত>কোড়িঅ। সাঙ্কমত - সাঙ্কম+ত (অধিকরণে)। চড়িলে - চড়+ইল্ল+এ। দাহিণ<দক্ষিণ। মা - না। হোহি<ভঘহি; অনুজ্ঞাবাচক। নিয়ড়ি—নিকট>নিয়ডড>নিয়ড়+ই (সপ্তমীর চিহ্ন)। বোহি<বোধি। জাহি>যাহি; অনুজ্ঞাবাচক। জই—যদি। তুমহে<তুষ্মাভিঃ। হোইব—ভূ>হো+ইব (<তব্য)। পুছহু—পৃচ্ছ>পুচ্ছ>পুছ+হু (মধ্যম পুরুষের চিহ্ন)। অনুত্তর-সামী<অনুত্তরস্বামী।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর :

গহন ও গম্ভীর (এই) ভবনদী বেগে প্রবাহিত হয়। (তার) দুধারে কাদা, মাঝে থই মেলেনা। ধর্ম সাধনার্থে চাটিল সাঁকো তৈরী ক'রে দিলেন, পারগামী লোক নির্ভয়ে (এখন) পার হ'তে পারে। মোহতরু ফেড়ে ফেলে পাটি জোড়া দেওয়া হ'ল,। অদ্বয়রূপ শক্ত টাঙ্গি নির্বাণ খনন করল। সাঁকোয় চ'ড়ে (কিন্তু) ডান কিংবা বাম দিকে চেয়োনা। বোধি নিকটেই (রয়েছে,), দূরে যেওনা। যদি ওগো লোকেরা, তোমরা পরপারে যেতে চাও তবে অনুত্তরস্বামী চাটিলকে জিজ্ঞাসা কর।

অন্তর্নিহিত ভাব :—

নদীর দুতীরে যেমন কাদা থাকে তেমনি এই ভবনদীর দুকূলেই মোহপঙ্ক, সেই মোহপঙ্কে লিপ্ত হয়ে মানুষ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। চাটিল পাদ সেজন্য যোগ-সাধনরূপ সাঁকোর উপর দিয়ে পরপারে যাবার কথা বলছেন। সাঁকো নির্মাণ করা যাবে কিভাবে সেই কথাই অতঃপর বলা হয়েছে। প্রথমতঃ মোহতরু কেটে ফেলে তার পাটগুলি জ্ঞানালোকে জোড়া দিতে হবে, অর্থাৎ পাকাপোক্ত করতে হবে।

সেতুর ওপর চ'ড়ে মধ্যপথ অবলম্বন করতে হবে, ডান কিংবা বাম দিকে গেলে চলবেনা। ডান কিংবা বামদিকে হচ্ছে ইড়া পিঙ্গলার পথ, প্রবৃত্তির পথ; মধ্যের সুষুম্না-মার্গই হচ্ছে যথার্থ নিবৃত্তির পথ। সেই পথে এগুতে থাকলে বোধিলাভ সহজেই সম্ভব।

॥ ৬ ॥

ভুসুকুপাদানাম্

রাগ—পটমঞ্জরী

কাহেরে[১] ঘিনি মেলি আছহু[২] কীস।,
বেঢ়িল[৩] হাক পড়ই[৪] চৌদীস॥ ধ্রু॥
অপণা মাংসে[৫] হরিণা বৈরী।
খনহ ন ছাড়ই[৫] ভুসুকু[৬] অহেরী[৭]॥ ধ্রু॥
তিণ ন ছুবই[৮] হরিণা পিবই ন পাণী।
হরিণা হরিণির নিলঅ ণ জাণী॥ ধ্রু॥
হরিণী বোলই[৯] সুণ হরিণা[১০] তো।
এ বণ ছাড়ী[১১] হোহু ভান্তো॥ ধ্রু॥
তরঙ্গতে[১২] হরিণার খুর ন দীসই[১৩]।
ভুসুকু ভণই মূঢ়া-হিঅহি ণ পইসই[১৪]॥ ধ্রু॥

পাঠান্তর :—

১. কাহৌরি (ক) ২. অচ্ছহু (ক. ঘ) ৩. বেটিল (ক) ৪. পড়অ (ক, ঘ) ৫. ছাড়অ (ক, ঘ) ৬. ভুকু (ক) ৭ অহেরি (ক, ঘ) ৮. চ্ছুপই (ক, ঘ) ৯. বোলঅ (ক, ঘ) ১০. সুণ হরিআ (ক, ঘ), হরিণা সুণ (খ) ১১. চছাড়ী (ক, ঘ) ১২. তরঙ্গন্তে (ক), তরসন্তে (গ) ১৩. দীসঅ (ক, ঘ) ১৪. পইসঙ্গ (ক)

শব্দার্থ, টীকা, ব্যুৎপত্তি :—

কাহেরে—কাহাকে; কস্য>কাহ+র কেরক-জাত+এ) (দ্বিতীয়ায়)। ঘিনি—লইয়া; গৃহ্ণাতি>গেণ্হই>ঘেনি, ঘিনি; অথবা √ গ্রহ্> গেণ্হ+ইআ বা ইঅ (অসমাপিকা)>গেহিঅ>ঘেনি, ঘিনি। মেলি—ছাড়িয়া; √ মেল্ (পরিত্যাগ করা অর্থে)+ই (>ক্তাচ্) অথবা,

√মীল্ +ই>মিলি,মেলি। আছহু;—আছি; প্রা √অচ্ছ্ +হু; (অহম-জাত) কীস<কীদৃশ। বেঢ়িল—বেষ্টিত>বেট্‌ঠিঅ+ইল্ল>বেঢ়িল। পড়ই<পততি—পড়ে চৌদীস-চতুঃ>চৌ+দীস (<দিশ); চারিদিক। অপণা—আত্মনঃ>অপ্‌পণা>অপণা- (সম্বন্ধ পদ)। মাংসেঁ—মাংস+এঁ (<এন); মাংস দ্বারা। হরিণা - হরিণ+আ (বিশিষ্টার্থে), পুংলিঙ্গ খমহ<ক্ষণস্য—ক্ষণেকের জন্যও অথবা- ক্ষণ>খন+হ (>ইহ<ইধ), ক্ষণিকও, মুহূর্তও,। ছাড়ই<ছড্ডই<ছর্দতি—ছাড়ে। অহেরী<আহেড়িঅ<আখেটিক শিকারী। তিন<তৃণ। ছুবই>ছুপই<স্পৃশতি—স্পর্শ করে; অথবা ক্ষুভ্যাতি*>ছুপই>ছুপই, ছুবই। পিবই<পিবতি—পান করে। পানী<পানীয়ম্, —জল। নিলঅ<নিলয়। জাণী<জানিত*—জ্ঞাত। বোলই<বোল+ই (<তি)। তো<ত্বম্—তুমি। বণ - বন (তৎসম শব্দ)। ছাড়ী - ছাড়িয়া; √ছদ্>ছাড়্+ঈ (<ইঅ, অসমাপিকার চিহ্ন)। হোহু;<ভবথঃ—হও। ভান্তো<ভ্রান্ত -ভ্রাম্যমান অর্থে। তরঙ্গতেঁ—তরঙ্গ+তেঁ (দ্বারা, জন্য (প্রভৃতি অর্থে, তরঙ্গ অর্থে হরিণের লাফ; অথবা তরঙ্গতেঁ<তরং গতে<তৃণস্থ গতে দ্রুত গতিতে। হরিণার<হরিণায়<হরিণার- হরিণের। খুর<ক্ষুর। দীসই<দৃশ্যতে—দেখা যায়। মূঢ়া—মূঢ়দের; আ-কার যোগে বহু বচনের পদ নিষ্পাদন। হিঅহি—হৃদয়ে; হৃদয়>হিঅঅ+হি (সপ্তমী)>হিঅহি। পইসই>প্রবিশতি প্রবেশ করে।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর :—

কাকে নিয়ে, (বা কাকে) ছেড়ে কেমন ক'রে আছি। চারপাশ ঘিরে হাঁক পড়ে। আপন মাংসের জন্যই হরিণ (সকলের শত্রু। এক মুহূর্তের জন্যও শিকারী ভুসুক (তাকে) ছাড়ে না। হরিণ ঘাসও ছোঁয় না, জলও পান করেনা। হরিণ-হরিণীর নিলয় জানা যায় না। হরিণী বলে—হরিণ তুমি শোনো, এ বন ছেড়ে চ'লে যাও। (দ্রুত) লাফ দেওয়ার জন্য হরিণের খুর দেখা যায় না। ভুসুকু বলেন—(এ তত্ত্ব) মূঢ় ব্যক্তির হৃদয়ে প্রবেশ করে না।

অন্তর্নিহিত ভাব :-

পৃথিবীতে হরিণের মতোই চঞ্চল মানুষের চিত্ত চিত্তের চঞ্চলতাই বিনাসের হেতু। কালরূপ শিকারী তাকে বিনাশ করবার জন্য চারদিক বেষ্টন ক'রে আছে। তার আপন চঞ্চলতার জন্যই হরিণ জগতের শত্রু। সকলে তার ধ্বংস সাধনে প্রবৃত্ত এটি জানতে পেরে হরিণ পানাহার ত্যাগ ক'রে মুক্তিসন্ধানে তৎপর। এমন সময় হরিণী অর্থাৎ নৈরাত্মা দেবীর আহ্বানে সে সঠিক পথের সন্ধান পেল এবং দ্রুত প্রবৃত্তির এলাকা পরিত্যাগ ক'রে নিবৃত্তি মার্গে মহাসুখকমলবনের উদ্দেশে যাত্রা করল। তখন তার গমন এতোই দ্রুত হ'ল যে ক্ষুরের পতনটুকু পর্যন্ত দুর্নিরীক্ষ্য হয়ে উঠল।

॥ ৭ ॥

কাহ্নপাদানাম্

রাগ – পটমঞ্জরী

আলিএঁ[১] কালিএঁ বাট রুন্ধেলা।
তা দেখি কাহ্ন[২] বিমণা[৩] ভইলা॥ ধ্রু॥
কাহ্ন[২] কহি'[৪] গই করিম নিবাস।
জো মণ[৫] গোঅর সো উআস॥ ধ্রু॥
তে তীনি[৬] তে তীনি[৬] তীনি[৬] হো ভিন্না।
ভণই কাহ্ন[২] ভব পরিচ্ছিন্না॥ ধ্রু॥
জে জে আইলা তে তে গেলা।
অবণাগবণে কাহ্ন[২] নিঅড়ি বিমণা[৩] ভইলা[৭]॥ ধ্রু॥
হেরি সে কাহ্ন নিঅড়ি জিনিউর বট্টই।
ভণই কাহ্নি[২] মো হিঅহি ন পইসই॥ ধ্রু॥

পাঠান্তর ঃ—

১. অলি এ' (ক) ২. কাহ্ন (ক) ৩. বিমন (ক,ঘ) ৪. কহিঁ'ব (ঙ) ৫. মন (ক, ঘ) ৬. তিনি (ক, ঘ) ৭. ভইইলা (ক) ৮. মোহিঅহি (ক)

শব্দার্থ, টীকা, ব্যুৎপত্তি ঃ—

আলিএ'—আলি+এ' (<এন, তৃতীয়ার একবচনে); আলি দ্বারা; সংস্কৃত টীকা অনুসারে আলি অর্থে লোকজ্ঞান। কালিএ' —কালি+এ' (<এন, তৃতীয়ার একবচনে), কালি দ্বারা; সংস্কৃতি টীকা অনুসারে কালি অর্থে লোকভাস। বাট < বট্ট <বত্ত<বর্ত্ম—পথ। রুন্ধেল —√ রুধ্ > রুন্ধ (রুধাদিগণীয় ধাতু ব'লে 'ন' আগম হয়েছে) + ইল (<ইল্ল)+আ (১ম পুরুষে) রোধ করা হইল। কাহ্ন<কাণ্হ<কৃষ্ণ। বিমণা — দুঃখিত; বি (উপসর্গ) +মন+ আ (বিশেষণবোধক)। ভইয়া—হইল; ভূ+ ইল্ল +আ (১ম পুরুষে)। কহিঁ'—কোথায়; কধি>কহিঁ'। গই< গম্বা ;অথবা গমিত>গই—গিয়া। করিব-কৃ+তব্য>কর+ইব। জো <যঃ—যে। মণগোঅর<মনগোচর। সো—সে; সঃ>সো। উআস <উদাস। তে—তদ্ শব্দের পুংলিঙ্গে প্রথমার বহু বচনের রূপ; তাহারা। তীনি<তিণ্ণি < ত্রীণি—তিন। হো<হোই<ভবতি। ভিন্না—শেষের 'আ'-কার বিশিষ্টার্থে। পরিচ্ছিন্না—পরিচ্ছন্ন+ আ (বিশিষ্টার্থে)। জে—। যাহারা; যদ্ শব্দের পুংলিঙ্গে প্রথমার বহুবচনের রূপ 'যে'>জে। আইলা—আগত>আঅঅ+ইল্ল> আইল্ল>আইল—+আ (১ম পুরুষ, বহুবচনে)। গেলা—গত> গঅ+ইল্ল>গইল্ল>গেল+আ (১ম পুরুষ, বহুবচনে)। অবণাগমনে —আনাগোনায়; আগমনগমন>অবণাগমণ+এ (করণ, অধিকরণ)। হেরি—হের+ই (<ইঅ<ক্তাচ, অসমাপিকার চিহ্ন)। নিঅড়ি— নিকট>নিঅডড>নিঅড়+ই (সুপ্ বিভক্তিতে সপ্তমীর একবচনে ঙি বা ই হয়)। কাহ্নি—কাহ্ন শব্দের সম্বোধনে কাহ্নি। জিনউর

<জিনপুরম্—মহাসুখপুর। বট্টই < বর্ত্ততে—বটে, হয়, আছে
মো <মম—আমার । পইসই<প্রবিশতি প্রবেশ করে।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তরঃ—

আলি কালি দ্বারা রুদ্ধ হ'ল পথ। কানু তা দেখে দুঃখিত হ'ল। কোথায় গিয়ে কানু বাস করে করবে। যে (যোগী) মনোগোচর, সে উদাস। তারা তিন, তারা তিন—(সেই) তিন হচ্ছে ভিন্নতাসূচক। কানু বলেন—ভব পরিচ্ছিন্ন হ'ল অর্থাৎ বিনিষ্ট হ'ল। যারা যারা এল, তারা তারা গেল। আনাগোনা দেখে কানু দুঃখিত হ'ল। (হে) কানাই, সে জিনপুর নিকটেই আছে দেখি। কানু বলে—আমার হৃদয়ে প্রবেশ করে না।

অন্তর্নিহিত ভাব ঃ—

আলি-কালি অর্থ যথাক্রমে লোকজ্ঞান ও লোকভাস। রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় এই জগৎ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা হচ্ছে লোকভাস। লোকজ্ঞানকে এখানে লোকবাসের সঙ্গে অভিন্নরূপে গ্রহন করা হয়েছে; ভ্রান্তিবশতঃ এই লোকজ্ঞান ও লোকভাসকেই প্রকৃতরূপে গ্রহন করাতে নির্বাণলাভের পথ অবরুদ্ধ হয়। এই-ভাবে বিকল্পভাবেই ভেদোপলব্ধি হয়ে থাকে। এই ভেদোপলব্ধি হচ্ছে বিনাশের পথ।

জগতে যা কিছুই উৎপত্তি হয়, তা বিনাশ লাভ করে—এ দেখে কানুপা দুঃখিত হয়ে মুক্তির পথ সন্ধান করছেন। জিনপুর বা মহাসুখপুর নিকটে হ'লেও চিত্ত এখনো অবিদ্যাবিমোহিত ব'লে কানু তা উপলব্ধি করতে পারছেন না।

———

।। ৮ ।।

কম্বলাম্বরপাদানাম্

রাগ — দেবক্রী

সোণে[১] ভরিলী[২] করুণা নাবী।
রুপা থোই নাহিকে[৩] ঠাবী।। ধ্রু।।
বাহ তু কামলি গঅণ উবেসে[৪]।
গেলী জাম বাহুড়ই[৪] কইসে[৪]।। ধ্রু।।
খুন্টি উপাড়ী মেলিলি কাচ্ছি[৫]।
বাহ তু কামলি সদ্গুরু পুচ্ছি[৬]।। ধ্রু।।
মাঙ্গত চাঁড়িলে[৭] চউদিস চাহই[৮]।
কেড়ুআল[৯] নাহি কে[৯] কি বাহবকে পারই[১০]।। ধ্রু।।
বাম দাহিণ চাপী মিলি মিলি মাঙ্গা[১১]।
বাটত মিলিল মহাসুহ[১২] সাঙ্গা[১৩]।।ধ্রু।।

পাঠান্তর :—

১. সোনে (ক, ঘ) ২. ভরিতী (ক) ৩. নাহিক (গ), নাহি কে (ঘ) ৪. বহু উই (ক), বহুড়ই (ঘ) বহুডেই (ঙ) ৫ কাচ্ছি (ক, ঘ) ৬. পুচ্ছি (ক, ঘ) ৭. চন্হিলে (ক), চাঁঢ়লে (ঘ) ৮. চাহঅ (ক, ঘ), ৯. কেড়ুয়াল (ক) ১০. পারঅ (ক, ঘ) ১১. মাগা (ক, ঘ) ১২. মহাসুখ (ঘ) ১৩. সঙ্গা (ক. ঘ) সুঙ্গা (ঙ)

শব্দার্থ, টীকা, ব্যুৎপত্তি :—

সোণে—সোনার. রুপাকার্থে শন্যতায়; স্বর্ণ>সোণ+এ (<এন, করণ)। ভরিলী—ভরা; √ভৃ>+ইল (বিশেষণ বাচক)+ঈ (স্ত্রী প্রত্যয়)। করুণা – বৌদ্ধ-সহজিয়া মতের পারিভাষিক শব্দ; বোধি-চিত্তের অন্যতম সহজাত ধর্ম করুণা। নাবী - নৌকা; নৌ >নাব+ঈ (<ইকা)। রুপা<রৌপ্য – রুপকার্থে 'রুপ' যাহা

পঞ্চস্কন্ধের অন্যতম। থোই<স্থাপিত*—রাখিয়া, থুইয়া। মহিকে—মহীর; মহী+কে (ষষ্ঠীর অর্থে)। ঠাবী-ঠাঁই; স্থান>ঠাণ ঠাঁই>ঠাবী। বাহ>বাহয়-বেয়ে চল। তু<ত্বম্—তুমি। গঅণ<গগণ। উবেসেঁ<উএসেঁ<উদ্দেশেন-উদ্দেশে। গেলী—গত>গঅ+ইল্ল > গইল্ল>গেল+ঈ (স্ত্রী-প্রত্যয়)। জাম<জম্ম<জন্ম। বাহুড়ই<ব্যাঘুটতি-ফিরিয়া আসে। কইসেঁ<কীদৃশেন-কেমন করিয়া। খুণ্টি—খুঁটি (দেশী শব্দ)। উপাড়ী<উৎপাট্য—উৎপাটিত করিয়া। মেলিলি-√ মেল্ (পরিত্যাগ করা করা অর্থে) +ইল্ল+ই (তুচ্ছার্থে)। কাছি<কচ্ছিকা-মোটা দড়ি। পুছি<পুচ্ছি<পুচ্ছিঅ<পৃচ্ছিত*; জিজ্ঞাসা করিয়া। মাঙ্গত—মার্গ>মাঙ্গ+ত (অধিকরণে); নৌকার গলুইয়ে। চউদিস—চতুঃ>চউ+দিস (< দিশ)। চাহই<চক্ষতে—খোঁজে, চাহে। কেড়ুআল<*কঈড়নাল<কূপীটপাল। কেঁ<কেন-কাহার দ্বারা। কি<কিম্। বাহবকে—বাহব (<বাহিতব্য)+কে (নিমিত্তার্থে)। পারই<পারয়তি—পারে। মিলি<মিলিত্বা-মিলিয়া (অসমাপিকা); মিলি মিলি—মিলিয়া গেল। মাঙ্গ<মার্গ। বাটত—বর্ত্ম>বট্ট বাট+ত (অধিকরণে)। মিলিল—মিলিত+ইল্ল>মিলিল। সাঙ্গা<সঙ্গম।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর :—

করুণা-নৌকা সোনায় ভ'রে (এবং) মাটির সঙ্গে রূপা রেখে, হে কামলি, তুমি (নৌকা) বেয়ে চল গগন উদ্দেশ্যে। গত জন্ম কেমন ক'রে ফিরে আসে? খুঁটি উপড়িয়ে কাছি মেলে দিয়ে, (হে) কামলি, তুমি সদ্গুরুকে জিজ্ঞাসা ক'রে বেয়ে চল। নৌকার গলুইয়ে চ'ড়ে চারদিকে তাকায়। দাঁড় নেই, (এ অবস্থায়) কে কি বাইতে পারে! বাম-ডান দিকে চেপে (যখনই) মার্গ মিলে গেল (তখনই) পথে মিলে গেল মহাসুখ-সঙ্গম।

অন্তর্নিহিত ভাব :—

চিত্তরূপ করুণা-নৌকা শূন্যতায় পূর্ণ ক'রে এবং রূপের অর্থাৎ বাহ্য

জগতের মিথ্যা অস্তিত্বের জ্ঞান মাটিতেই পরিত্যাগ ক'রে লক্ষ্য পথে অগ্রসর হ'তে হবে। লক্ষ্য হচ্ছে সেই গগন অর্থাৎ নির্বাণ যেখানে পেঁছিতে পারলে পুনরায় আর জন্ম নিতে হবে না। খুঁটি হচ্ছে সংবৃতি বোধিচিত্তের সৃষ্টি করা মিথ্যা জ্ঞান এবং কাছি হচ্ছে অবিদ্যাসূত্র যে সবের দ্বারা মানুষ ভববন্ধনে বাঁধা থাকে। এই সব বন্ধন থেকে মুক্ত ক'রে চিত্ত-নৌকাকে বেয়ে নিয়ে যেতে হবে। সে জন্য সদগুরুর উপদেশ নিয়ে চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি মেলে দেওয়া প্রয়োজন। যাত্রাপথে বাম-ডান চেপে অর্থাৎ উভয়ের মাঝখান দিয়ে বিরমানন্দ-মার্গের সঙ্গে যুক্ত থেকে অগ্রসর হ'তে হবে। তাহ'লেই মহাসুখসঙ্গমে উপনীত হওয়া যাবে।

॥ ৯ ॥

কাহ্নুপাদানাম্

রাগ—পটমঞ্জরী

এবংকার দিঢ়[১] বাখোড় মোড়িউ[২]।
বিবিহ বিআপক বান্ধণ তোড়িউ[৩] ॥ ধ্রু ॥
কাহ্নু[৪] বিলসই[৫] আসব-মাতা।
সহজ নলিনীবন পইসি নিবীতা[৬] ॥ ধ্রু ॥
জিম জিম করিআ[৭] করিণিরে' রিসই[৮]।
তিম তিম তথতা মঅগল বরিসই[৯] ॥ ধ্রু ॥
ছড়গই সঅল সহাবে সুধ।
ভাবাভাব বলাগ ন ছুধ[১০] ॥ ধ্রু ॥
দশবল[১১]-রঅণ হরিঅ দশ দিসে'।
বিদ্যা[১২] করিকু'[১৩] দম[১৪] অকিলেসে' ॥ ধ্রু ॥

পাঠান্তর ঃ—

১· দৃঢ় (ক, ঘ) ২. মোস্তিউ (ক, গ), মোড়িঅ (ঘ) ৩.

তোড়িঅ (ঘ) ৪. কাহ্ন (ক) ৫. বিলসঅ (ক) ৬. নিবিতা (ক, ঘ), ৭. করিণা (ক), করিয়া (ঘ) ৮. রিসঅ (ক, ঘ) ৯. বরিসঅ (ক, ঘ) ১০. ছুধ (ক, ঘ) ১১. দশবর (ঘ) ১২. অবিদ্যা (গ) ১৩. করি (ক, ঘ) ১৪, দমকঃ (ক, ঘ)

শব্দার্থ, টীকা, ব্যুৎপত্তি :—

এবংকার—এ + বংকার. এ=চন্দ্র; বং=সূর্য উভয়ে মিলে দিবারাত্রির জ্ঞান, দ্বৈতবোধ; পারিভাষিক শব্দ। বাখোড় বংশ +খম্ভ > বাঁশ + খুন্ট > বাঅ + খুড় > বাখোড়; হাতী বাঁধার স্তম্ভ। মোড়িউ < মোড্ডিউ < মোড্ডিইআ < মর্দয়িত্বা —মর্দন করিয়া। বিবিহ < বিবিধ। বিআপক < ব্যাপক। বান্ধণ < বন্ধন। তোড়িউ < তোড়িইআ < তোড়ইত্বা <ত্রোটয়িত্বা—ভাঙ্গিয়া। বিলসই < বিলসতি – বিলাস করে। মাতা<মত্ত। পইসি< পইসিঅ < প্রবিশ্য – প্রবেশ করিয়া। নিবীতা<নিবৃত—পরমসুখী, শান্ত। জিম—যেমন; প্রাকৃতের জেব্ব > জেব্ঁ > জেম্ম > জেম>জিম। করিআ>করিক* -পুরুষ হস্তী। করিণিরেঁ — করিণী (হস্তিনী)+র (কেরক-জাত)+এ (সপ্তমী, মতান্তরে ৪র্থী)। রিসই — ঈর্ষ্যা (আসক্তি অর্থে) > রিস+ই (<তি লট্-এর প্রথম পুরুষ এক বচনে) =রিসই। তিম—তেমন; প্রাকৃতের তেব্ব > তেব্ঁ > তেম্ম >তেম>তিম। তথতা— তদ্ + ত্ব > তথত্ত > তথতা; প্রজ্ঞা-পারমিতাবস্থা (পারিভাষিক শব্দ)। মঅগল < মদকল — খাদে পতিত হস্তী; অথবা, মদগল>মঅগল—মদের স্রাব। বরিসই <বর্ষতি-বর্ষণ করে। ছড়গই<ষড়্গতি — যাবতীয় জীবের উদ্ভব ছয় প্রকার—অন্ডজা, জরায়ুজা, উপপাদুকাঃ, সংস্বেদজা, দেবাসুরা-দিপ্রকৃতিকাঃ। সঅল< সকল। সহাবে< স্বভাবেন। সুধ<শুদ্ধ। ভাবাভাব—ভাব+অভাব। বলাগ— বাল (কেশ) +অগ্র =বালাগ্র > বালাগ। ছুধ <ছুদ্ধ< ক্ষুব্ধ। দশবলরঅণ – তথতারত্ন, জিনরত্ন, চতুর্থানন্দ; রত্ন > রতন > রঅন।

হরিঅ < ফরিঅ < স্ফুরিত (অথবা, হৃতম্)> হরিতম্ > হরিতঃ> হরিঅ)। দিসে'—দিশ + এ' (সপ্তমী)। করিকঁ – করী (হাতী) কু' (এখানে কে অর্থে)। আঁকিলেসে' অক্লেশ>আঁকিলেস+এ' (<এন)।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর :–

এবংকার দৃঢ় বন্ধনস্তম্ভ মর্দিত ক'রে, বিবিধ ব্যাপক (যতো) বন্ধন ভেঙে ফেলে আসবমত্ত (হয়ে) কানু বিলাস করে। (সে) শান্ত হয় সহজ নলিনীবনে প্রবেশ ক'রে। হস্তী যেমন যেমন হস্তিনীতে আসক্ত হয় তেমনি তেমনি মদকল (অর্থাৎ খাদে পতিত হস্তী) তথতা বর্ষণ করে। ষড়গতি সকল (অর্থাৎ যাবতীয় জীব) স্বভাবে শুদ্ধ। ভাবে ও অভাবে এক চুলও (কিছু) ক্ষুব্ধ হয় না, অর্থাৎ বিচলিত হয় না। দশদিকে দশবল রত্ন আহরণ ক'রে বিদ্যারূপ হস্তীকে অক্লেশে দমন কর।

অন্তর্নিহিত ভাব :—

হাতীকে যেমন স্তম্ভে আবদ্ধ ক'রে রাখা হয় তেমনি মানুষও আবদ্ধ হয়ে আছে সূর্যচন্দ্রাভাসরূপ দুটি স্তম্ভের সঙ্গে। সূর্যচন্দ্রাভাস হচ্ছে যথাক্রমে দিবারাত্রি-জ্ঞান—অর্থাৎ কালের জ্ঞান। ভববিকল্পের কারণই হচ্ছে এই কাল। কালের বন্ধনে মানুষ আবদ্ধ। আরো নানা পার্থিব বন্ধন রয়েছে তার সারা শরীরে। এই সকল বন্ধন এবং স্তম্ভদ্বয় ভেঙে কানু পা মহাসুখরূপ সহজনলিনী বনে প্রবেশ ক'রে খেলা করেন। হস্তী যেমন হস্তিনীর প্রতি আসক্ত হয়, তেমনি খাদে পতিত হস্তী অর্থাৎ সংসারের মায়ায় আবদ্ধ মানব জগতের প্রতি তীব্র আকর্ষণরূপ মদ্য বর্ষণ করে। তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, জীব সকল স্বভাবতই শুদ্ধ, সকলেই ধর্মকায় হ'তে উদ্ভূত। কেবল অবিদ্যা-জনিত প্রবৃত্তি থেকেই মানুষ বস্তুস্বরূপ বিস্মৃত হয়। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় দশবলরত্ন আহরণ করে–দশবলরত্ন হচ্ছে জিনরত্ন বা চতুর্থানন্দ যার উপলব্ধিতে চরম মোক্ষলাভ ঘটে। দশবলরত্ন আহরণ দ্বারাই ভবজ্ঞানরূপ বিদ্যাকে দমন করা যায়।

— ——

॥ ১০ ॥

কৃষ্ণপাদানাম্ (কাহ্নপাদানাম্)

রাগ—দেশাখ

নগর বাহিরি রে[১] ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
ছোই[২] ছোই জাসি[৩] বাম্‌হণ[৪] নাড়িআ ॥ ধ্রু ॥
আলো ডোম্বি তোএ সম করিব[৫] মই[৬] সাঙ্গ।
নিঘিণ কাহ্ন কাপালি জোই লাঙ্গ[৭] ॥ ধ্রু ॥
এক সো পদমা[৮] চউসট্‌ঠী[৯] পাখুড়ি[১০]।
তহিঁ চড়ি নাচই[১১] ডোম্বি বাপুড়ি[১২] ॥ ধ্রু ॥
হালো ডোম্বি তো পুছমি[১৩] সদভাবে।
আইসসি[১৪] জাসি ডোম্বি কাহেরি[১৫] নাবেঁ ॥ ধ্রু ॥
তান্তি বিকণহ[১৬] ডোম্বি অবর নো[১৭] চাঙ্গেড়া[১৮]।
তোহোর অন্তরে ছাড়ি নড়-পেড়া[১৯] ॥ ধ্রু ॥
তু লো ডোম্বি হউঁ[২০] কপালী[২১]।
তোহোর অন্তরে মোএ ঘালিলি[২২] হাড়েরি মালী ॥ ধ্রু ॥
সরবর ভাঞ্জিঅ[২৩] ডোম্বি খাহ[২৪] মোলাণ।
মারমি ডোম্বি[২৫] লেমি পরাণ ॥

পাঠান্তর :—

১. বারিহিরেঁ (ক), বাহিরে (গ) বাহিরেঁ (ঘ) ২. ছই (ক) ৩. যাই সো (ক), জাইসো (গ), যাইসি (ঘ) ৪. বাহ্ম (ক) ৫. করিবে (ক, ঘ) ৬. ম (ক, ঘ) ৭. লাগ (ক) ৮. পাদুমা (গ) ৯. চৌষঠ্‌ঠী (ক, ঘ), চোষঠী (গ) ১০. পাখুড়ী (ক, ঘ) ১১. নাচঅ (ক, ঘ) ১২. বাপুড়ী (ক, ঘ) ১৩. পুছমি (ক, ঘ) ১৪. আইসসি (ক, ঘ) ১৫. কাহরি (ক, ঘ) ১৬. বিকণঅ (ক, ঘ) ১৭. না (ক, ঘ) ১৮. চঙ্গতা (ক, ঘ), চাংগেড়া (গ) ১৯. এট্টা (ক), এড়া

(ঘ) ২০. হাউঁ (ক, ঘ) ২১. কপালী (ক, ঘ) ২২. ঘলিলি (ক, ঘ), ঘেণিলি (গ) ২৩. ভাজ্ঞীঅ (ক, ঘ) ২৪. খাঅ (ক, ঘ) ২৫. ডোম্বি (ঘ)

শব্দার্থ, টিকা, ব্যুৎপত্তি :—

বাহিরি—বাহির+ই (<হি: সপ্তমীর চিহ্ন)। ডোম্বি—নৈরাত্মার রূপক, ডোম-জাতীয়া স্ত্রীলোক যেমন অস্পৃশ্য হয়, তেমনি নৈরাত্মাও সকল স্পর্শের অতীত; পারিভাষিক অর্থে ডোম্বি বায়ুস্কন্ধের অধিদেবতা যোগিনী। তোহোরি—তব> তো+হ (<ইহ <ইধ) +র (কেরক-জাত)>তোহোর +ই (স্ত্রীপ্রত্যয়)। কুড়িআ<কুটী+ইকা—কুঁড়ে ঘর। ছোই < ক্ষুভিত; অথবা, √ছুপ্+ইঅ > ছোইঅ > ছোই। জাসি<যাসি। (অনুজ্ঞা)—যাও। সো <সঃ—সে। বামহণ < ব্রাহ্মণ। নাড়িআ < নআড়িআ < নগ্নটিকা। আলো — ওলো, প্রাকৃতে হলা। তোএ—তব > তো + এ (< এন, তৃতীয়ার চিহ্ন)। সম < সমম্ — সহিত। করিব — কৃ > কর + ইব (<তব্য)। মই <ময়া—আমি। সাঙ্গ < সঙ্গম; অথবা সাঙ্গা > সাঙ্গ — বিধবা বিবাহ। নিঘিণ < নিঘৃণঃ। কাপালি < কাপালিক। জোই<যোগী। লাঙ্গ < নগ্ন। পদমা — পদ্ম > পদম + আ (বিশিষ্টার্থে)। চউসট্‌ঠী<চতুঃষষ্টি। পাখুড়ী; পাপড়ি পক্ষটিকা>পাখুড়ী। তহিঁ—তদ্ > ত+হি (< ধিং); তাহাতে। চড়ি—চড়িয়া; অপভ্রংশ চড়্ (<চট*) +ই (অসমাপিকা)। নাচই<নৃত্যতি (নৃত্য > নচ্চ > নাচ)। বাপুড়ী—বেচারী, হতভাগ্য; মধ্য যুগের বাংলায়—'হাসি বলে কোথা হৈতে আইলি বাপুড়া' কৃত্তিবাস, অপভ্রংশে 'কাবালিয় বপপুড়া' (হেমচন্দ্র ৩৮৭, ত); বাপুড় থেকে স্ত্রীলিঙ্গে বাপুড়ী; সম্ভবত শব্দটি সংস্কৃত বপ্র>বাপা থেকে আদরার্থে বাপুড়ী। হালো—ওলো, প্রাকৃতে হলা। তো

<ত্বা—তোমাকে। পুছমি<পৃচ্ছামি—জিজ্ঞাসা করি। সদভাবে—সদ্ভাবে (তৎসম শব্দ)। আইসিস<আবিশসি—আসিস। কাহেরি—কস্য>কাহ+র (কেরক-জাত)+ই (স্ত্রীলিঙ্গে)। নাবেঁ—নৌ>নাব+এঁ (<এন, তৃতীয়ার চিহ্ন)। তান্তি<তন্ত্রী। বিকণহ<বিকণঅ<বিক্কিণীএ<বিক্রীণিষে—বিক্রয় কর। অবর<অপর—আর, এবং। মো<মাম্—আমাকে। চাঙ্গড়া<চাঙ্গারিআ<চাঙ্গালিকা—চাঙ্গারি। তোহোর—তোহোরি দ্রষ্টব্য। অন্তরে—জন্য; ‘তোহ্মার অন্তরে পথে সাধোঁ মহাদান’—বড়ু চণ্ডীদাস। ছাড়ি—ছদ্>ছাড়+ই (উত্তম পুরুষের বিভক্তি)। নড়-পেড়া>নটপেটক—নলের পেটরা, মতান্তরে নটসজ্জা। তু<ত্বম্—তুমি, তুই। হউঁ<অহকম্—আমি। কাপালী—কাপালিক। মোয়<ময়া—আমার দ্বারা। ঘালিলি—ঘল্ল>ঘাল+ইলি (অতীত কালের উত্তম পুরুষের চিহ্ন, কর্মবাচ্যে)—গৃহীত হইআ। হাড়েরি—হডড>হাড়+এর (কেরক জাত)+ই (স্ত্রীলিঙ্গে)। মালী>মালিকা। ভাঙ্গীঅ—ভঞ্জ+ইয়া (<ত্বাচ)>ভঞ্জিয়া>ভাঞ্জিঅ, ভাঙ্গীঅ—ভাঙ্গিয়া। খাহ—খাও। মোলাণ—মৃণাল>মুণাল>মোলাণ (বর্ণ-বিপর্যয়ের ফলে)। মারমি<মারয়ামি—মারি। লেমি—লভ>লহ>লে+মি (উত্তম পুরুষের বিভক্তি)। পরাণ<প্রাণ।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর :-

ওগো ডোম্বি, তোমার কুঁড়েখানি নগরের বাইরে। তুমি সে ব্রাহ্মণ নেড়েকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাও। ওগো ডোম্বি, আমি তোমাকে সাঙ্গা করব। আমি কানু-কাপালিক, নিঘৃণ এবং উলঙ্গ যোগী। একটি সেই পদ্ম, তার চৌষট্টি পাপড়ি। ডোম্বি বেচারী তার উপর চড়ে নাচে। ওগো ডোম্বি, সদ্ভাবে তোমাকে আমি শুধাই—তুমি, ডোম্বি, কার নৌকোয় আসা-যাওয়া কর? ডোম্বি, তুমি তন্ত্রী বিক্রয় কর, আমাকে (বিক্রয় কর) চাঙ্গারি। তোমার জন্যই নলের

পেটরা পরিত্যাগ করলাম। তুমি লো ডোম্বি, আমি কাপালিক। তোমার জন্যই হাড়ের মালা গ্রহণ করেছি। ডোম্বি, সরোবর ভেঙে মৃণাল খাও। ডোম্বি, তোমাকে মারব, প্রাণ নেব।

অন্তর্নিহিত ভাব :—

ইন্দ্রিয়াতীত ব'লে পরিশুদ্ধাবধূতী নৈরাত্মা অস্পৃশ্যা ডোমরমণীরূপে কল্পিতা হয়েছে। যাবতীয় লোকাচার ও শাস্ত্রীর গোঁড়ামী পরিত্যাগ করে কানুপা তার সঙ্গে মিলিত হবেন। নৈরাত্মা দেবীর সঙ্গে মিলিত হ'লে চৌষট্টি দলযুক্ত নির্মাণচক্রে উপনীত হবেন তিনি। সেই ডোম্বীতো সংবৃতি বোধি-চিত্তরূপ নৌকায় যাওয়া আসা করে না। সে অবিদ্যারূপ তন্ত্রী ও বিষয়া-ভাসরূপ চেঙ্গাড়ী ত্যাগ করেছে। কানুপাও তাকে পাবার জন্য নলের পেটরা অর্থাৎ সংসারের সাজসজ্জা ছেড়ে দিয়েছেন এবং কাপলিক হয়ে হাড়ের মালা ধারণ করেছেন।

প্রথমে যে ডোম-রমণীর কথা বলা হ'ল সে পরিশুদ্ধাবধূতিকা নৈরাত্মা; পরে শেষ দু ছত্রে অন্য এক ডোমজাতীয়া রমণীর কথা বলা হচ্ছে, যে অবিদ্যারূপীণী অপরিশুদ্ধাবধূতী। কায়াসরোবরের মূল মৃণালরূপ বোধি-চিত্তকে বিনাশ করাই হচ্ছে এর কাজ। সে জন্য কানুপা একে মেরে ফেলবেন অর্থাৎ এই অপরিশুদ্ধাবধূতিকা ডোম্বিকে পরিশুদ্ধাবধূতীতে রূপান্তরিত করবেন।

———

॥ ১১ ॥

কৃষ্ণাচার্য্যপাদানাম্

(কাহ্নপাদানাম্)

রাগ—পটমঞ্জরী

নাড়ি শক্তি দিঢ়[১] ধরিঅা[২] খাটে[৩]।
অনহা ডমরু বাজই[৪] বীর নাদে ॥ ধ্রু ॥
কাহ্ন কাপালী জোই[৫] পইঠ অচারে[৬]।
দেহ নঅরী বিহরই[৭] একারে[৮] ॥ ধ্রু ॥
আলি কালি ঘণ্টা নেউর চরণে।
রবি শশী কুণ্ডল কিউ আভরণে ॥ ধ্রু ॥
রাগ দেশ[৯] মোহ লইআ[১০] ছার।
পরম মোখ লভই[১১] মুক্তিহার ॥ ধ্রু ॥
মারি[১২] সাসু[১৩] ননন্দ ঘরে সালী[১৪]।
মাঅ মারি[১৫] কাহ্ন ভইঅ কবালী ॥ ধ্রু ॥

পাঠান্তর :—

১. দিট (ক, ঘ) ২. ধরিঅ (ক, ঘ) ৩. খট্টে (ক, ঘ) ৪. বাজএ (ক, ঘ) ৫. যোগী (ক, ঘ) ৬. পচারে (খ) ৭. বিহরএ (ক, ঘ) ৮. একাকারে (গ, ঘ) ৯. দ্বেষ (ঘ) ১০. লাইঅ (ক, ঘ) ১১. লবএ (ক, ঘ) ১২. মারিঅ (ক, ঘ) ১৩. শাসু (ক, ঘ) ১৪. শালী (ক, ঘ) ১৫. মারিআ (ক, ঘ)

শব্দার্থ, টীকা, ব্যুৎপত্তি :—

নাড়িশক্তি-বত্রিশ নাড়ির মধ্যে বিরমানন্দরূপা প্রধানা অবধূতিকার কথা এখানে বলা হচ্ছে, "দ্বাত্রিংশন্নাড়িকা-শক্তিস্তাসাং মধ্যে প্রধানা-বধূতিকা বিরমানন্দরূপা"—টীকা। ধরিয়া < ধৃত্বা। খাটে < খট্টে < খট্টে

—শূন্যতায়। (খং—শূন্যতা)। অনহা < অনাহত—ষট্‌চক্রের অন্যতম হচ্ছে অনাহত চক্র, এই অনাহত চক্রে পৌঁছতে পারলে সাধকের দেহের মধ্যেই একপ্রকার স্পন্দনহীন ধ্বনি উত্থিত হয়, এর নাম অনাহত ধ্বনি। ডমরু<ডম্বরু। বাজই<বাদ্যতি—বাজে। বীরনাদে—শূন্যতাসিংহনাদে। পইঠ<পইট্‌ঠ<প্রবিষ্ট। অচারে—আচারে অর্থাৎ যোগাচারে। নঅরী < নগরী। বিহরই<বিহরতি—বিহার করে। একারেঁ—একাকারেণ (তৃতীয়ার একবচনে)>একারেণ (সমাক্ষরলোপ >একারেঁ। নেউর< নূপুর। রবি শশী—যথাক্রমে পিঙ্গলা ও ইড়া; 'একারশ্চন্দ্রাভাসঃ বংকারঃ সূর্য্যঃ উভয়ং দিবারাত্রি জ্ঞানম্‌''—টীকা, অর্থাৎ রবি=বং এবং শশী=এ, তাহ'লে নবম চর্যায় 'এবংকার'-এর যা অর্থ এখানে 'রবি শশী' বলতে তা-ই বুঝাচ্ছে। কিউ<কিদং<কৃতম। আভরণে—আভরণরূপে। দেশ<দ্বেষ। লইআ<লভিত্বা। ছার<ক্ষার। মোখ <মোক্ষ। লভই<লভতে<লভছে। মুত্তিহার—মৌক্তিক>মুক্তি> মুত্তি+হার—মুক্তাহার; অথবা মুক্তি>মুত্তি+হার—মুক্তিরূপহার। মারি<মারয়িত্বা—মারিয়া। ননন্দ—ননদ; ''চক্ষুরিন্দ্রিয়াদি-বিজ্ঞানবাতং নানাপ্রকারং বোদ্ধব্যম্‌''—টীকা, অর্থ—চক্ষু প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ নানা প্রকারে নব নব আনন্দ দেয় ব'লে তারা ননদ। সালী<শালী< শ্যালিকা। মাঅ<মাতা; অথবা মায়া>মাঅ। ভইঅ—হইল; ভবিত >ভইঅ। কবালী<কাপালিক।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর :

নাড়িশক্তি দৃঢ়ভাবে খাট ধ'রে (আছে)। অনাহত ডমরু বীর নাদে বাজে। কাপালিক যোগী যোগাচারে প্রবিষ্ট হয়ে দেহ নগরীতে একাকারে বিহার করে। আলি কালি (তার) চরণে ঘণ্টানূপুর, রবি শশীকে করল (সে) কুণ্ডল আভরণ। রাগ-দ্বেষ-মোহের ছাই নিয়ে লাভ করেছে (সে) পরমমোক্ষের মুক্তাহার। শাশুড়ি ননদ শালীকে মেরে এবং মাকে মেরে কানু কাপালিক হ'ল।

অন্তর্নিহিত ভাব :—

বত্রিশ নাড়ির মধ্যে প্রধান যে বিরামানন্দরূপা অবধূতিকা, তাকে সাধনা দ্বারা

মণিমূল থেকে ঊর্ধ্বাভিমুখী করা হয়েছে এবং মস্তিষ্ক-দেশে প্রভাস্বর শূন্যতায় তাকে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ ক'রে কানু পা যোগাচারে প্রবিষ্ট হয়েছেন। শূন্যতারূপ ডমরু বাজছে, কানু পা স্বচ্ছন্দে দেহ-নগরীতে বিরাজ করছেন, অর্থাৎ কায়া-সাধনায় মগ্ন আছেন।

কানু পা এখন তান্ত্রিক যোগী, তাই আলি-কালি অর্থাৎ লোকজ্ঞান ও লোক-ভাসকে তিনি পায়ের ঘণ্টানুপুর করেছেন; রবি-শশী রূপ গ্রাহ্য-গ্রাহকাদি ভাবকে তিনি করেছেন কানের কুণ্ডল; আর রাগদ্বেষমোহকে পুড়িয়ে ফেলে তার ছাই শরীরে লেপন ক'রে নিয়েছেন। শাশুড়ি অর্থাৎ শ্বাসবায়ুকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে ননদ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণকে ধ্বংস ক'রে এবং মা অর্থাৎ অবিদ্যারূপিণী মায়াকে মেরে ফেলে কানু কাপালিক হয়েছেন।

॥১২॥

কৃষ্ণপাদানাম্
(কাহ্নপাদানাম্)

রাগ—ভৈরবী

করুণা পীঁড়িহি[১] খেলহু[২] নঅবল।
সদ্‌গুরু বোহে[২] জিতেল ভববল ॥ধ্রু॥
ফীটিউ[২] দুআ আদেসি রে[৩] ঠাকুর।
উআরি[৪] উএসে[৫] কাহ্ন[৬] ণিঅড় জিনউর ॥ধ্রু॥
পহিলে[৭] তোলিআ[৭] বড়িআ মরাড়িউ[৮]।
গঅবরে[৭] তোলিআ পাঞ্চজনা ঘোলিউ[৯] ॥ধ্রু॥
মতিএ[১০] ঠাকুরক পরিনিবিত্তা।
অবস[১১] করিআ ভববল জিত্তা[১২] ॥ধ্রু॥
ভণই কাহ্ন[৬] আম্‌হে[১৩] ভলি দাহ[১৪] দেহু[২]।
চউসট্‌ঠী[১৫] কোঠা গুণিআ লেহু ॥ধ্রু॥

পাঠান্তর :—

১. পিহাড়ি (ক), পিড়ি (ঘ) ২. ফীটউ (ক, ঘ) ৩. মাদেসিরে (ক, ঘ) ৪. তআরি (ক) ৫. উএস (ক, ঘ) ৬. কাহ্নু, (ক, ঘ) ৭. তোড়িআ (ক, ঘ) ৮. মরাড়িইউ (ক, ঘ), মারিউ (গ) ৯. ঘালিউ (ঘ) ১০, মন্তিএ (ঙ) ১১. অবশ (ক, ঘ) ১২. জিতা (ক) ১৩. আম্মে (ক, ঘ) ১৪. দায় (ঘ) ১৫. চউবঠ্‌ঠি (ক, ঘ)

শব্দার্থ, টীকা, ব্যুৎপত্তি :—

পীঢ়িহি—পীঠি>পীঢ়ি+হি(অধিকরণে)। খেলহু—খেল+হু (অহংমজ্জাত); আমি খেলা করি। নঅবল<নয়বল—দাবার বল, দাব খেলা; টীকাতে বলা হয়েছে "চতুর্থানন্দলম্"; নব> ন—চতুর্থ (বড়ো, মেজো, সেজোর পর ন, যেমন ন ভাই, নদিদি প্রভৃতি)+আনন্দ—কায় বাক্ চিত্তের অতীত আনন্দকে বলা হয় চতুর্থানন্দ। বোহে'—বোধ>বোহ+এ' (< এন, তৃতীয়ার চিহ্ন)। জিতেল—জিতম্+ইল্ল>জিত + ইল> জিতেল। ভববল—সংসার রূপ দাবার ঘুঁটি; "বিষয়াভাসবলম্"—টীকা। ফীটিউ<ফেটিঅ<স্ফেটিত; অথবা স্ফিট >ফিট্ট+উ>ফীটিউ—দূরীভূত হইল। দুআ—দ্বি>দু+ আ (নির্দেশক)—দাবা খেলায় চাল বিশেষ; টীকাতে— "অভাসদ্বয়ম্"। আদেসি—চালিয়া; আদেশ>আদেস + ই (অসমাপিকা)। ঠাকুর—দাবার রাজা, টীকা অনুসারে অর্থ' —অবিদ্যাবিমোহিত চিত্ত; প্রাকৃত ঠক্কুর>ঠাকুর। উআরি< উঅআরিআ<উপকারিকা—সদরমহল; মধ্যযুগে উয়ারি মেহার অর্থে যথাক্রমে ঘর ও ঘরণী। উএসে'<উপদেশেন (তৃতীয়ার একবচন)। ণিয়ড়<নিকট; নিয়ড়ি (৫নং চর্যায়) দ্রষ্টব্য। পহিলে'—প্রথমে; প্রথম + ইল্ল > পহিল (অধিকরণে)। তোলিঅ<তোড়িআ<তোড়য়িত্বা<ত্রোটয়িত্বা। ঘড়িআ<ঘটিকা; টীকা অনুসারে অর্থ'—১৬০ প্রকার প্রকৃতিদোষ। মরাড়িউ

—ময়াড়ি+ইউ (অহম্-জাত); ময়াড়ি সম্ভবত স্থানীয় উচ্চারণে বিকৃত ম্-ধাতুজাত কোনো শব্দ। গঅবরেঁ—গজবর>গঅবর+এঁ (এন, তৃতীয়ার চিহ্ন)। পাঞ্চজনা—পাঁচজনকে, পঞ্চ-স্কন্ধাত্মক পঞ্চ। বিষয়ের অহঙ্কারাদি—টীকা অনুসারে। ঘোলিউ—ঘায়েল করি; ঘল্ল ঘোল+ইউ (আহন-জাত)। মতিএঁ<মত্যা—প্রজ্ঞা দ্বারা; অথবা মন্ত্রিণা<মতিএঁ—মন্ত্রীর দ্বারা। ঠাকুরকে—ঠাকুরকে (দ্বিতীয়া); অথবা ঠাকুরের (ক—ষষ্ঠির চিহ্ন)। পরিনিবিত্তা<পরিনিবৃত। অবস>অবশ <অবশ্য। জিত্তা—√ জি+ত্বা—জিত্বা>জত্তা। ভলি<ভল্লিঅ<ভদ্রক*—ভালো। দাহ—দান। দেহু—দা+হু (অহম্-জাত); আমি দিই। কোঠা<কোষ্ঠক—দাবার ছক। গুণিআ—গুণ+ইআ (<ক্ত্বাচ্)। লেহু—লে+হু (অহম-জাত); লই।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর :—

করুণা-পিঁড়িতে খেলি নয়বল। সদ্‌গুরুবোধে ভববল জিতলাম। দুআ সরিয়ে দিলাম রাজা চেলে; (ওহে) কানু, ঘরের উপদেশে (দেখ) জিনপুর নিকটে। প্রথমে তোড়ে গিয়ে মারলাম বড়েগুলি; গজবর তুলে পাঁচজনকে ঘায়েল করলাম। মন্ত্রি দ্বারা প্রতিনিবৃত্তি করলাম রাজাকে। (এইভাবে) অবশ্য ক'রে ভববল জেতা হ'ল। কানু বলেন, আমি ভাল দান দিই, (ঠিক মতো) গুণে নিই চৌষট্টি কোঠা।

অন্তর্নিহিত ভাব :—

এখানে দাবাখেলার রূপকে ধর্মতত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে। করুণা-পিঁড়িতে অর্থাৎ করুণাময় চিত্তকে দাবার ছকে পরিণত ক'রে কানু পা চতুর্থানন্দবলরূপ দাবা খেলেছেন। গুরুর উপদেশে এই খেলায় প্রবৃত্ত হয়ে বিষয়াভাস জয় করেছেন। কিভাবে তা করেছেন ?

চিত্তের চার স্তর—শূন্য, অতিশূন্য মহাশূন্য ও সর্বশূন্য। প্রথম তিন স্তরে প্রকৃতি দোষ যুক্ত থাকে, চতুর্থ স্তরে সে হয় দোষশূন্য। প্রথমে দুইকে

সরিয়ে দেওয়া হ'ল অর্থে প্রথম দুটি শূন্যকে মারা হ'ল তারপর রাজা অর্থাৎ অবিদ্যাবিমোহিত চিত্তকে চালানো হ'ল পরবর্তী মহাশূন্যতার স্তরে, সেখানে থেকে জিনপুর অর্থাৎ মহাসুখপুর নিকটেই দেখা যায়। এখানেই অবিদ্যা-বিমোহিত চিত্তকে ধ্বংস ক'রে চতুর্থ সর্বশূন্যতার স্তরে পৌঁছতে হবে।

কথাগুলিকে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করে বলা হচ্ছে—প্রথমে বড়োগুলি অর্থাৎ ১৬০ প্রকার প্রকৃতিদোষ বিনষ্ট করা হ'ল। পরে চিত্তগজেন্দ্র অর্থাৎ সর্বশূন্যতারূপ তথতাচিত্ত দ্বারা পঞ্চস্কন্ধাত্মক পঞ্চ বিষয়ের অহঙ্কারাদি প্রত্যয়েকে বিনষ্ট করা হ'ল। অবশেষে প্রজ্ঞারূপ মন্ত্রী দ্বারা চিত্তরূপ ঠাকুর অর্থাৎ সংবৃতি বোধচিত্তকে পরিনিবৃত্ত করা হ'ল। এইভাবে রূপাদি-বিষয় সমূহরূপ ভলবল জয় করা হয়েছে।

॥ ১৩ ॥

কৃষ্ণাচার্য্যপাদানাম্

(কাহ্নপাদানাম্)

রাগ—কামোদ

তিশরণ ণাবী কিঅ আঠক মারী[১]।
নিঅ দেহ করুণা শূন মেহেরী[২] ।।ধ্রু।।
তরিত্তা ভবজলধি জিম করি মাঅ সুইণা[৩]।
মাঝ[৪] বেণী তরঙ্গ মই[৫] মুনিআ।।ধ্রু।।
পাঞ্চ[৬] তথাগত কিঅ কেড়ু আল।
বাহহ[৭] কাঅ কাহ্নিল মাআজাল।।ধ্রু।।
গন্ধ-পরসরস[৮] জইসো[৯] তইসো[১০]।
ণিংদ[১১] বিহুনে[১২] সুইণ[৩] জইসো।।ধ্রু।।

চিঅ কণ্ডহার [১৩] সুণত [১৪] মাঙ্গে।
চলিলা [১৫] কাহ্ন মহাসুহ সাঙ্গে।।

পাঠান্তর :—

১, অঠক মারী (ক), অঠকমারী (ঘ) ২, শুনমে হেরী (ক) ৩. সুইনা (ক, ঘ) ৪, মঝ (ক, ঘ) ৫. তরঙ্গম (ক), তরঙ্গম (ঘ) ৬. পঙ্গু (ক, ঘ) ৭. বাহঅ (ক, ঘ) ৮, পরসর (ক) ৯. জইসোঁ (ক, ঘ) ১০. তইসোঁ (ক, ঘ) ১১, নিংদ (ক), নিন্দ (ঘ) ১২. বিছনে (ক, ঘ) ১৩, কন্নহার (ক, ঘ) ১৪. সুণত (ক, ঘ) ১৫. চলিল (ক, ঘ)

শব্দার্থ, টীকা, ব্যুৎপত্তি :—

ত্রিশরণ<ত্রিশরণ, মূলে ত্রিশরণ বলতে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ বুঝায়; সহজযানে ত্রিশরণ হচ্ছে কায়বাকচিত্তের শরণ। ণাবী— নৌ >নাব, ণাব+ঐ (<ইকা)। কিঅ<কৃতম্। আঠক – অষ্ট> আঠ+ক (দ্বিতীয়ার চিহ্ন), আটকে; স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন ও পঞ্চে- ন্দ্রিয়—এই আটকে, টীকা অনুসারে—অঠকুমারী' অর্থাৎ আট কুমারী, এখানে বুদ্ধের আট প্রকার ঐশ্বর্যের কথা বলা হয়েছে, যথা — অণিমা, লঘিমা প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিতা' বশিতা কামাব- সায়িতা। নিজ নিজ। শুন <শূন্য। গেহেরী—অন্তঃপুর; মধ্য- যুগে শব্দটি মহিলা অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। তরিত্তা—√তৃ+ ক্ত্বাচ্ (অসমাপিকা-বাচক) উত্তীর্ণ হইয়া। মাঅ—মায়া। সুইণা —স্বপ্ন>সুবিণ>সুইণ+আ (বিশিষ্টার্থে)। মাঝ<মধ্য। বেণী <বেন্নী <দ্বীণি। মই<ময়া—আমার দ্বারা। মুনিআ— মনিত>মুণিঅ, মুণিআ—ভাবিয়া ঠিক করা। বাহুহ<বাহয়— বেয়ে যাও। কাঅ<কায়। কাহ্নিল—কৃষ্ণ>কাহ্ন + ইল (আদর বা অবজ্ঞাসূচক)। মাআজাল—মায়াজাল। জইসো < যাদৃশ। তইসো<তাদৃশ। ণিংদ<নিদ্রা। বিহুনে—বিহীন > বিহুন+ (<এন)। (চিঅ < চিত্ত। কণ্ডহার—কান্ডার শব্দের মধ্যে কোনো বিশেষ স্থানীয় উচ্চারণে 'হ' আগম হয়ে কান্ডহার বা

কন্ডহার হয়েছে ; এই কান্ডহার মধ্যযুগীয় বাংলায় হয়েছে কান্ডার ; এমনি 'হ' আগমের উদাহরণ মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে এখনো পাওয়া যায়— যেন, 'মাঝ' স্থানীয় উচ্চারণে 'মাহাঝ' সার' স্থানীয় উচ্চারণে 'সাহার ইত্যাদি। সুণত শুন্য> সুণ+ত (ষষ্ঠীর চিহ্ন)। মাঙ্গে>মাগে। চলিলা—চলিত+ ইল্ল>চলিল+আ (প্রথম পুরুষ)। সাঙ্গে—সঙ্গম>সাঙ্গ+এ।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর :—

ত্রিশরণকে নৌকা করে আট (অর্থাৎ অষ্টবিধ বিকল্পকে মারলাম। নিজ দেহ (হ'ল) করুণা ও শূন্য-গৃহিলা বা শূন্য- অন্তঃপুর। যেমন ক'রে মায়া স্বপ্ন (পার হই, তেমনি) উত্তীর্ণ হলাম এই ভবজলধি আমি মাঝ - নদীসঙ্গমে তরঙ্গ বুঝতে পারলাম। পঞ্চ তথাগতকে দাঁড় ক'রে, হে কাহ্ন, কায়া-(নৌকা) বেয়ে মায়াজাল (অতিক্রম)। গন্ধ স্পর্শ রস যেমন (আছে) তেমনি (থাকুক). (এরা) যেন স্বপ্ন-বিহীন নিদ্রা। শূন্যতা মার্গের কর্ণধার (হচ্ছে) চিত্ত। কানু মহাসুখ-সঙ্গমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

অন্তর্নিহিত ভাব :—

ত্রিশরণ অর্থে সাধারণত বুদ্ধ ধর্ম ও সংঘ—এই তিনের শরণ বুঝায়। কিন্তু টীকা অনুসারে ত্রিশরণ হচ্ছে কায়-বাক চিত্তের শরণ অর্থাৎ মহাসুখকায়। এই ত্রিশরণকে আশ্রয় ক'রে আটকে মারা হ'ল অর্থাৎ স্কন্ধ ধাতু-আয়তন ও পঞ্চেন্দ্রিয় —এই আট প্রকারের বিকল্পাত্মক জ্ঞান পরিহার করা হ'ল। এর ফলে দেহের মধ্যে মিলন হ'ল শূন্য ও করুণার। তখন সমস্ত জাগতিক ব্যাপার মায়া স্বপ্ন-সদৃশ্য মনে হ'তে লাগল। সাধনার পথে মাঝ নদীতে অর্থাৎ ইড়া-পিঙ্গলার মধ্যবর্তী সুষুম্নায় মহাসুখরূপ তরঙ্গ উপলব্ধি করা গেল।

অতঃপর কানুপা নিজেকেই সম্বোধন ক'রে বলছেন—দেহরূপ মায়াজাল অতিক্রম করতে হ'লে পঞ্চতথাগতকে দাঁড় ক'রে নাও অর্থাৎ দেহের মধ্যে পঞ্চতথাগতের স্বরূপ উপলব্ধি কর। তখন গন্ধস্পর্শরস প্রভৃতি বিষয়াদি জাগ্রত স্বপ্ন বলে মনে হবে। এইভাবে, কানুপা স্বীয় বোধিচিত্তকে শূন্যতারূপ নৌকার কর্ণধার ক'রে মহাসুখসঙ্গমের উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে পড়লেন।

———

॥ ১৪ ॥

ডোম্বীপাদানাম্

রাগ - ধনসী

গঙ্গা জউনা মাঝেঁ রে বহই নাঈ।
তহিঁ চড়িলী[১] মাতঙ্গি পোইআ[২] লীলে পার করেই ॥ ধ্রু ॥
বাহ তু[৩] ডোম্বী বাহ লো[৪] ডোম্বী বাটত ভইল উছারা।
সদ্ গুরু পাঅ-পসাএঁ[৫] জাইব পুণু জিণউরা ॥ ধ্রু ॥
পাঞ্চ কেড়ু আল পড়ন্তে মাঙ্গে পীঠত[৬] কাছী[৭] বান্ধী।
গঅণ দুখোলেঁ সিঞ্চহু পাণী ন পইসই সান্ধি ॥ ধ্রু ॥
চান্দ[৮] সূজ্জ দুই চাকা[৯] সিঠি সংহার পুলিন্দা।
বাম দাহিণ দুই মাগ ন চেবই[১০] বাহ তু ছন্দা ॥ ধ্রু ॥
কবড়ী ন লেই বোড়ী ন লেই সুচ্ছড়ে[১১] পার করেই।
জো রথে চড়িলা বাহবা ণ[১২] জানি[১৩] কুলেঁ কুল বুলই[১৪] ॥ ধ্রু ॥

পাঠান্তর ঃ -

১. বুড়িলী (ক) ২. যোইআ (ঘ) ৩. বাহতু (ক) ৪. বাহলো (ক) ৫. পাঅ পএে (ক) পাঅপএ' (ঘ) ৬. পিটত (ক, ঘ) ৭. কাচ্ছী (ক, ঘ) ৮. চন্দ (ক) ৯. চকা (ক, ঘ) ১০. রেবই (ক, ঘ) ১১. সুচ্ছড়ে (ক, ঘ) ১২. বাহবাণ (ক), বহিবান (ঘ) ১৩. জাই (ক, ঘ) ১৪. বুড়ই (ক, ঘ)

শব্দার্থ, টীকা, ব্যুৎপত্তি ঃ

গঙ্গা জউনা—গঙ্গা যমুনা যথাক্রমে চন্দ্র ও সূর্যের রূপক; রবি-শশী (১১নং চর্যায়) দ্রষ্টব্য। মাঝেঁরে—মধ্য>মাঝ+এ (<এন)+ রে (সম্বোধনে)। বহই<বহতি—বহে। নাই<নাবী (৮নং

চর্যা দ্রষ্টব্য)-নৌকা; অথবা নাঈ < নঈ < নদী। চড়িলী—চড়+ইল্ল+ঈ (স্ত্রী প্রত্যয়)। মাতঙ্গি প্রমত্তাঙ্গি (তৎসম শব্দ) পোইআ—শহীদুল্লাহ্ সাহেব শব্দটির অর্থ করেছেন জলমগ্ন; সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত) 'বৌদ্ধগান ও দোহা'য় শব্দটির অর্থ করা হয়েছে 'পুত্র সকলকে'। লীলে—লীলায়, অবলীলাক্রমে; লীলযা>লীলে। করেই < করোতি। বাটত—বাট (৭নং চর্যা দ্রষ্টব্য +ত (৭মীর চিহ্ন)। ভইল< ভূত + ইল্ল। উছাড়া — উৎসার>উছার+আ; অথবা, উৎসুর> উচ্ছুর > উছার+আ। পাঅ<পাদ। পসাএ<প্রসাদেন। জাইব <যাতব্য। পুণু <পুণঃ। পড়ন্তে—পত> পট > পড় + অন্ত (ঘটমান বিশেষণে)+এ। মাঙ্গে- নৌকার গলুইয়ে, মাগ > মাঙ্গ+এ (৭মী। পীঠত—পৃষ্ঠ>পীঠ+ত (৭মী)। বান্ধী< বন্ধিত*—বাঁধিয়া। গঅণ>গগনে দুখোলেঁ—দ্বি>দু +খোল +এঁ (>এন); সেঁউতি দ্রষ্টব্য। সিঞ্চহু—সেচন কর; সিঞ্চ+হু (অনুজ্ঞা)। সান্ধি—সন্ধি; সন্ধিস্থল। চান্দসুজ্জ<চন্দ্র সূর্য—(১১নং চর্যায় রবিশশী দ্রষ্টব্য)। চাকা<চক্র। সিঠি>সৃষ্টি। পুলিন্দা<পোলিন্দক- মাস্তুল। মাগ<মার্গ। চেবই<চেতয়তি। ছন্দা-স্বচ্ছন্দে। কবড়ী<কবড্ডঅ<কপর্দ্দক। বোড়ী<বোড্রী —পাঁচ গণ্ডা। লেই<লয়তি*—লয়। সুচ্ছলে- সু (উত্তম +ছলে (উপলক্ষে, ব্যপদেশে); অথবা স্বচ্ছন্দেন>সুচ্ছড়ে>সুচ্ছলে। বাহবা—বাহব (<বাহিতব্য) + আ; বাহিতে। কুলেঁ কুল —কূল হইতে কূল। বুলই—প্রাঃ বুল্ল>বুল+ই (<তি); বেড়ায়।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর :-

ওরে, গঙ্গা-যমুনা মধ্যে নৌকা বয়! তাতে চ'ড়ে প্রমত্তাঙ্গী (অর্থাৎ প্রমত্ত স্ত্রীলোক) নিমজ্জিত ব্যক্তিকে অবলীলাক্রমে পার ক'রে দেয়। হে ডোম্বী, তুই বেয়ে যা, বেয়ে যা ওরে ডোম্বী, পথেই বিকাল হয়ে এলো। সদ্গুরুর

পাদ-প্রসাদে পুনরায় আমি জিনপুরে যাব। নৌকার গলুইয়ে পাঁচটি বৈঠা ফেলে পিঠে কাছি বেঁধে গগন-সেঁউতি দ্বারা জল সেচক কর, (যেন কোন) জোড়ার ফাঁকে (জল) প্রবেশ না করে। চন্দ্র ও সূর্য (হচ্ছে) দুটি চাকা, সৃষ্টি ও সংহার মাস্তুল। বাম (কিংবা) ডান দুদিকের (কোনো) পথই বোধগম্য নয়। তুই স্বচ্ছন্দে বেয়ে যা। ডোম্বী কড়ি নেয়না, বুড়িও নেয়না, অমনি পার ক'রে দেয়। রথে যে চড়ল, (নৌকা) বাইতে জানল না, (সে) কূলে কূলে ঘুরে বেড়ায়।

অন্তর্নিহিত ভাব :–

গঙ্গা-যমুনা হচ্ছে দুপাশের দুটি নাড়ী ইড়া-পিঙ্গলা বসনা-রসনা—এদের মধ্যবর্তী সুষুম্না বা অবধূতিকা-পথে সাধককে এগুতে হবে। অবধূতিকায় রয়েছে প্রমত্তাঙ্গী হস্তিনী-স্বরূপিণী নৈরাত্মা। বাইরের সংসার-সমুদ্রে নিমজ্জিত ব্যক্তিকে সে অবলীলাক্রমে পার ক'রে দেয়। পদকর্তা ডোম্বীপাদ নিজেকেই সম্বোধন ক'রে বলছেন—সময় চলে যায়, তাড়াতাড়ি এগিয়ে চল তোমার সাধন মার্গে। সদ্‌গুরু-পাদপদ্মের প্রসাদে পুনরায় মহাসুখপুরে প্রবেশ করবে।

পঞ্চতথাগতকে পাঁচ দাঁড় ক'রে নিয়ে অর্থাৎ দেহের মধ্যেই পঞ্চতথাগতের তত্ত্ব অবগত হয়ে মনিমূলে বোধিচিত্তকে দৃঢ়রূপে বেঁধে নাও (মণিমূল=পীঠ; বোধিচিত্ত=কাছি)। অতঃপর শূন্যতারূপ সিঁউতি দ্বারা বিষয়তরঙ্গরূপ জল সেচন ক'রে ফেল, যেন কোনোমতেই বিষয়তরঙ্গের স্পর্শ না লাগে বোধিচিত্তে। চন্দ্র হচ্ছে প্রজ্ঞা জ্ঞান, অদ্বয়জ্ঞান হচ্ছে সূর্য—এই চন্দ্র সূর্যকে কল্পনা করা হয়েছে মাস্তুলের গায়ে লাগানো, পাল গুটাবার ও মেলবার কাজে ব্যবহৃত দুটি চাকা। মাস্তুল হচ্ছে সৃষ্টি-সংসারের রূপক। আর এই সব মিলে হচ্ছে বোধি-চিত্তরূপ নৌকা—ডান কিংবা বাম কোনো দিকে না তাকিয়ে অর্থাৎ ইড়া-পিঙ্গলার পথ পরিহার করে মধ্যবতী সুষুম্নার পথে নৌকা বেয়ে চল। পার করবার জন্য নৈরাত্মা কোনো কিছু নেয় না, অর্থাৎ এজন্য ব্যয়সাধ্য কোনো কিছু করার দরকার নেই। কিন্তু যা দরকার তা হচ্ছে নৌকা বাইতে জানা, সাধনা-মার্গে এগুবার পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন। যারা এ সাধনা সম্পর্কে অজ্ঞ হয় এবং সংসারের রথে

চ'ড়ে সংসারাসক্ত হয় তারা মুক্তির সন্ধান পায় না, ভবনদী উত্তীর্ণ হ'তে না পেরে কূলে কূলেই ঘুরে বেড়ায়।

॥ ১৫ ॥

শান্তিপাদানাম্

রাগ—রামক্রী

সঅ সম্বেঅণ সরুঅ বিআরেতে[১] অলকখ লক্খণ[২] ন জাই।
জে জে উজুবাটে গেলা অনাবাটা ভইলা সোই[৩]॥ ধ্রু॥
কুলেঁ কুল মা হোহি[৪] রে মূঢ়া উজুবাট সংসারা।
বাল তিল[৫] একু বাংক[৬]ণ ভূলহ রাজপথ কন্ধারা॥ ধ্রু॥
মা আমোহ[৭] সমুদারে অন্ত ন বুঝসি থাহা।
আগে[৮] নাব ন ভেলা দীসই[৯] ভান্তি[১০] ন পুছসি[১১] নাহা॥ ধ্রু॥
সুনা[১২] পান্তর[১৩] উই ন দীসই ভান্তি ন বাসসি জাঅন্তে[১৪]।
এথা[১৫] আঠমহাসিদ্ধি[১৬] সীঝই[১৭] উজুবাট জাঅন্তে॥ ধ্রু॥
বাম দাহিণ দো বাটা ছাড়ী[১৮] সান্তি[১৯] বুলথি[২০] সংকেলিউ।
ঘাট ন গুমা খড় তড়ি[২১] হোই আখি বুজিঅ বাট জাইউ॥ ধ্রু॥

পাঠান্তর :—

১, বিআরে'তে (ক) ২৷ অলক্খলক্খ (গ) ৩. সোঙ্গ (ক, ঘ) ৪. হোই (ক, ঘ) ৫. ভিণ (ক) ৬. বাকু (ক) ৭. মাআমোহা (ক, ঘ) ৮. অগে (ক) ৯. দীসঅ (ক ঘ) ১০. ভন্তি (ক) ১১. পুচ্ছসি (ক) ১২, সুনা (ক) ১৩. পান্তর (ব, ঘ) ১৪. জান্তে .ক) ১৫. এথা (ক) ১৬. অটমহাসিদ্ধি (ক) ১৭. সিঝএ (ক) ১৮, চ্ছাড়ী (ক) ১৯. শান্তি (ক) ২০. বুলথেউ (ক) ২১. নো (ক, ঘ)

শব্দার্থ, টীকা, ব্যুৎপত্তি :—

সঅ<স্ব। সম্বেঅণ<সংবেদন। সরূঅ<স্বরূপ। বিআরেতেং— বিআর (<বিচার) + এ'তে (করণের চিহ্ন)। অলক্‌খ<অলক্ষ্য। লক্‌খণ<লক্ষণ। উজুবাটে—ঋজু>উজু+বাট (<বর্ত্ম)+এ (সপ্তমী)। অনাবাটা<অনাবর্তক যে পুনরাবর্তন করে না। সোই—সো (৭নং চর্যা দ্রষ্টব্য)+ই (<হি)। বাল—জ্ঞানহীন, মূর্খ (তৎসম শব্দ)। তিল একু—এক তিলও; একু—এক+ও। বাঙ্ক—বঙ্ক, বাঁকা। ণ- না। ভূলহ—ভূল+হ (অনুজ্ঞা)। কন্ধারা <স্কন্ধবার—মধ্যযুগে পাওয়া যায় কান্ডার, অর্থ—ছাউনি, শিবির কানাত-ঘেরা স্থান। মাআমোহ—মায়ামোহ। সমুদারে—সমুদ্র >সমুন্দ<সমুদা+র (কেরক জাত)+এ (<হি)। বুঝসি— বুঝ+সি (মধ্যম পুরুষের বিভক্তি)। থাহা<স্তাঘ*। আগে< অগ্রে। নাব<নৌ। ভেলা<ভেলঅ<ভেলক। ভান্তি<ভ্রান্তি। পুছসি<পুচ্ছসি<পৃচ্ছসি—জিজ্ঞাসা কর। নাহা<নাথ। সুনা <শূন্য পন্তর—পান্থ+র (ষষ্ঠী); পথের। উহ<উহতে— লক্ষিত হয়; শহীদুল্লাহ সাহেব শব্দটিকে উদ্দেশ বা ঠিকানা অর্থে গ্রহণ করছেন[১]। বাসসি—বাস+সি (মধ্যম পুরুষের বিভক্তি)। জাআন্তে ·যাইতে (শতৃজাত অসমাপিকা)। এথা <এত্থ<অত্র—এখানে, ইহজন্মে। অঠ<অষ্ট। মহাসিদ্ধি—আট মহাসিদ্ধি যথা—খড়গ, অঞ্জন, পাদলেপ, অন্তর্ধান, রসরসায়ন, খেচর, ভূচর, পাতাল প্রমুখ সিদ্ধি। সীঝই<সিধ্যতে। দো< দ্বি। বাটা<বর্ত্ম। সান্তি<শান্তি; কবির নাম। বুলথি—বুল (< প্রা, বুল্ল)+থি (<তি); বেড়ায়। সংকেলিউ—সং (<সম্)+ √কেল্ +ইউ (<ইঅ); অথবা সুকুমার সেনের মতে—সংকলিতঃ >সংকেলিউ[২]—সংক্ষিপ্তভাবে। ঘাট<ঘট্ট—শুল্ক আদায়ের স্থান। গুমা—থানা—; গুমা শব্দটি সম্ভবত 'গুল্ম' শব্দের পরিবর্তিত রূপ, কিন্তু শব্দটিকে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও সুকুমার সেন থানা অর্থে গ্রহণ করেছেন।[৩] খড়—শহীদুল্লাহ সাহেবের মতে দীর্ঘ

(tall grass)[৪]; সুকুমার সেনের মতে খাদ > খড়।[৫] "তড়ি— তড়া, অগভীর জল যেখানে। বন্ধিঅ—বন্ধ করিয়া ; বন্ধ+ইঅ (অসমাপিকা)। জাইড<যায়তু।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর :—

স্বয়ং সংবেদন, স্বরূপ-বিচারে অলক্ষ্যকে লক্ষ্য করা যায় না। যারা যারা সোজা পথে গেল তারা ফিরে এল না। ওরে, কুলে কুলে কুলে মূঢ় হয়ে ঘুরোনা সংসার-পথ সোজা। মূর্খ ! বাঁকা পথে তিল মাত্রও ভুল কোরোনা, রাজপথ কানাত-ঘেরা। মায়ামোহ সমুদ্রের না বুঝ অন্ত, (না পাও) থই। সামনে নৌকা কিংবা ভেলা (কিছুই) দেখা যাচ্ছে না। (অথচ) তুমি গুরুকে ভুলের বিষয় জিজ্ঞাসা করছ না। শূন্য পথের ঠিকানা পাওয়া যায় না, (তবু) এগিয়ে চলতে ভ্রান্তি বোধ করছ না। সোজা পথে চলতে এখানে অষ্ট মহাসিদ্ধি লাভ হয়। বাম-ডান দুই পথ ছেড়ে শান্তি খেলা ক'রে বেড়ান। কূলঘাট নেই, নেই থানা, খড়ের (জঙ্গল) কিংবা চড়াও নেই, (তিনি) চোখ বন্ধ ক'রে পথে চলে গেলেন।

অন্তর্নিহিত ভাব :—

সহজানন্দের স্বরূপ এই যে, তা স্বসংবেদ্য। তা এমন একটি অতীন্দ্রিয় অনুভূতি যে, ভাষা দিয়ে তার ব্যাখ্যা হয় না। সহজ পথে যাত্রা করলে মহাসুখ লাভ হয়, আর সংসার-কূলে ফিরে আসতে হয় না। অতএব ওরে মূঢ়, সেই সহজ-পথের অনুগামী হও। এই মায়ামোহ-ঘেরা সংসারের পথই হচ্ছে প্রকৃত পক্ষে বাঁকা পথ, কিন্তু মূর্খেরা সে কথা বুঝে না। রাজপথ বলা হয়েছে অবধূতি-মার্গকে, সে পথের সন্ধান পেলে আর ভুল হবার জো নেই, কারণ তা কানাত-ঘেরা অর্থাৎ প্রজ্ঞা ও করুণারূপী কানাত দ্বারা সে পথ চিহ্নিত, সংসারের অবিদ্যাজাত মায়ামোহ সে পথের ধারে কাছে ঘেঁষতে পারে না। পক্ষান্তরে, মায়ামোহরূপ এই সংসার-সমুদ্র হচ্ছে খুবই গভীর ও অন্তহীন; পার হওয়ার কোনো উপায়ই মিলবে না যদি সদগুরুর কাছে পথের সন্ধান না নেওয়া যায়। গুরুর উপদেশ ভিন্ন শূন্য পথের অর্থাৎ সহজ শূন্যরূপ পথের ঠিকানা পাওয়া যাবে না, অতএব গুরু-উপদেশে এগিয়ে চলতে ভুল কোরোনা। এই সহজ পথে,

মনে রাখবে, অষ্ট মহাসিদ্ধি লাভ হয়। বাম-ডান দুই পথ ছেড়ে অর্থাৎ ইড়া-পিঙ্গলা বা রসনা-ললনার পথ পরিহার ক'রে মধ্যবর্তী সুষুম্না বা অবধূতিকার পথে পদ-কর্তা শান্তি পা এখন বিচরণ করছেন। এ পথের সকল ব্যাপার অবগত হয়ে তিনি বলছেন এখানে কোনো প্রকার বাধাবিঘ্ন নেই, নির্বিকারভাবে চোখ বন্ধ ক'রে এ পথে চ'লে যাওয়া যায়।

॥ ১৬ ॥

মহীধরপাদানাম্ (মহিত্তাপাদানাম্)

রাগ—ভৈরবী

তীনিএ[১] পাটে[২] লাগেলি রে অণহ[২] কসণ ঘণ গাজই।
তা সুনি মার ভয়ংকর বে বিসঅ[৩] মন্ডল সঅল[৪] ভাজই।ধ্রু॥
মাতেল চীঅ গয়েন্দা[৫] ধাবই।
নিরন্তর গঅণন্ত তুসে[২] ঘোলই॥ ধ্রু॥
পাপপুণ্য বেণি তোড়িঅ[৬] সিকল মোড়িঅ খম্ভা ঠাণা।
গঅণ টাকলি লাগি[৭] রে চিত্তা পইঠা[৮] ণিবানা।ধ্রু॥
মহারস পানে মাতেল রে তিহুঅন সঅল উএখী।
পঞ্চ বিষয়রে নায়করে বিপখ কোবী ণ দেখী।ধ্রু॥
খররবি-কিরন-সন্তাপে রে গঅণ-গঙ্গা[৯] গই পইঠা।
ভণন্তি মহিত্তা[১০] মই এথু বুড়ন্তে কিম্পি-ন দীঠা[১১]॥ ধ্রু॥

১—Buddhist Mystic Songs, p 48

২—চর্যাগীতি-পদাবলী, পৃ. ১৯১

৩—ঐ

৪ Buddhist Mystic Songs, p. 48

৫—চর্যাগীতি-পদাবলী, পৃ. ৬৭

পাঠান্তর ঃ—

১৷ তিনিএ (ক) ২. অণহ (ক) ৩৷ সঅ (ক) ৪. সএল (ক, ঘ) ৫. গঅন্দা (ক), গএন্দা (গ) ৬ তোঁড়িঅ (ক, ঘ) ৭. লাগেলি (গ) ৮. পইঠ (ক) ৯. গঅণাঙ্গণ (ক), গগনগঙ্গা (ঘ) ১০৷ মহিআ (গ). মহিন্ডা (ঘ) ১১. পিঠা (ক)

শব্দার্থ, টীকা, ব্যুৎপত্তি ঃ

তীনিএ—ত্রীণি <তীনি+এ (< এন, তৃতীয়ার চিহ্ন); অথবা, (কারো কারো মতে)-তীনি+এ (সপ্তমীর চিহ্ন)। পাটে - পট্ট>পাট + এ (অধিকরণে)। লাগেলি—লাগিল শব্দে স্ত্রীলিঙ্গে লাগেলি; অথবা, লগ্ন > লাগ+ইল্ল>লাগেল +ই (তুচ্ছার্থক বিভক্তি, বা স্ত্রী প্রত্যয়)। কসন- শব্দটি সুকুমার সেন মনে করেন কৃষ্ণ শব্দের পরিবর্তিত রূপ এবং অর্থ কালো[১]; মণীন্দ্র মোহন বসুর মতে কর্ষণ>কসন[২]; শহীদুল্লাহ্ সাহেব প্রথমে শব্দটি 'ভয়ানক' অর্থে গ্রহণ করেছিলেন[৩], পরে মত পাল্‌টে তিনি সুকুমার সেনকেই সমর্থন করেন[৪]। গাজই<গর্জতি। মার—বৌদ্ধ শাস্ত্র মতে শয়তান জাতীয় দেবতা: প্রলোভন ও মৃত্যুর অধিদেবতা। বিসঅ< বিষয়। ভাজই<ভজ্যতে—ভাগে, ভাগিয়া গেল। মাতেল < মত্ত+ইল্ল—মাতাল, মদমত্ত। চীঅ < চিত্ত। গয়েন্দা—গজেন্দ্র>গয়েন্দ+আ (<আক্)। ধাবই <ধাবতি—ধায়। গঅণন্ত<গগনান্ত। তুসে—তৃষ্ণা>তুস+এ (<এন)। ঘোলই—ঘোল্ল>ঘোল+ই (<তি); ঘুরিয়া বেড়ায় (সুকুমার সেন শব্দটিকে ঘোলায় অর্থে গ্রহণ করেছেন)[৫]। তোড়িঅ—তোড়িউ (৯ নং চর্যা) দ্রষ্টব্য। সিকল < শিকল। মোড়িঅ—মোড়িউ (৯নং চর্যা) দ্রষ্টব্য। খম্ভা - স্তম্ভ>খম্ভ+আ। ঠাণা—স্থান>ঠাণ+আ। টাকলি—এক প্রকার টক্‌টক্ শব্দ, অনাহত ধ্বনি; মণীন্দ্র মোহন বসু শব্দটিকে শিখর অর্থে গ্রহণ করেছেন[৬]। লাগি—জন্য; লগ্নিত>লাগি। তিহুঅন<

ত্রিভুবন। উঅখী>উপেক্ষিত; অথবা, উপেখ্য > উবেক্খিঅ > উঅখী। বিষয়রে—বিষয়+ রে (< এর, ষষ্ঠীর চিহ্ন)। নায়করে নায়কের। বিপখ<বিপক্ষ। কোবী<কোহপি—কেউ। দেখী—দৃক্ষিত*>দেখিঅ (কর্মবাচ্যে)>দেখী। গঅণ <গগন। গই < গত্বা; অথবা, গমিত>গই। এথু<এত্থ <অত্র। বুড়ন্তে —√বুডড (অবহট্ঠ)+অন্ত (ঘটমান বিশেষণ)+এ (৭মী) > বুড়ন্তে—ডুবিতে ডুবিতে। কিম্পি<কিম্+অপি—কিছুই।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর :–

ওরে, তিন পাটে লগ্ন অনাহত ধ্বনি, যেন কাল (মেঘ) ঘন গর্জন করে। তা শুনে, ওরে, ভয়ংকর যতো বিষয় (রূপী) মার পলায়ন করে। মত্ত চিত্ত-গজেন্দ্র ধাবিত হয়, তৃষ্ণায় গগন-প্রান্তে নিরন্তর ঘুরে বেড়ায়। পাপ-পুণ্য—দুই শিকল ছিঁড়ে ফেলে, স্তম্ভ-স্থান মর্দিত ক'রে, গগনের টক্ টক্ শব্দের জন্য (অর্থাৎ শব্দ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে) চিত্ত নির্বাণে প্রবেশ করল। ওরে, মহারস পানে মাতাল হয়ে সে সকল ত্রিভুবন উপেক্ষা করল। পঞ্চ বিষয়ের নায়কের বিপক্ষ কাউকেই দেখা গেল না। ওরে, খররবিকিরণ-সন্তাপে সে গগন-গঙ্গায় প্রবিষ্ট হ'ল। মহিত্তা বলেন, আমি এখানে ডুবতে ডুবতে কিছুই দেখলাম না।

অন্তর্নিহিত ভাব :—

কায়-বাক-চিত্ত সহজানন্দে যুক্ত হ'ল। তখন ঘন ঘন অনাহত ধ্বনি শোনা যেতে লাগল। তা শুনে বিষয়াকাঙ্ক্ষারূপ মার দূরীভূত হ'ল। মার হচ্ছে সাধন-পথের শত্রু, অমঙ্গলদায়িনী শক্তি বিশেষ। সাধক যখন দেহ-সাধনার পথে অগ্রসর হয় তখন সে নিজের মধ্যে একটা অনাহত ধ্বনি, একটা শক্তিকে উপলব্ধি করে—যার আবির্ভাবে পার্থিব চিত্তবিভ্রম-সৃষ্টিকারী শক্তির পরাভব ঘটে।

সহজানন্দে মত্ত চিত্ত-গজেন্দ্র বিরমানন্দরূপ শূন্য-গগনের দিকে ধাবিত হয়, সেখানে মহাসুখরসীতে কেলি করার তৃষ্ণা তার মনে। সংসারের পাপ

৮—

পুণ্যের শিকল জোড়া ছিন্ন ক'রে স্তম্ভস্থান অর্থাৎ লোকজ্ঞান ও লোকভাসরূপ অবিদ্যাস্তম্ভ মর্দিত ক'রে শূন্যতারূপ গগনের দিকে আকৃষ্ট হ'ল সে। শূন্য গগনের অশ্রুতপূর্ব শব্দের ইঙ্গিতে চিত্ত নির্বাণে প্রবেশ করল। সেখানে সে মহাসুখরসপানে মত্ত হ'ল, পার্থিব সব কিছুকেই করল উপেক্ষা। এখন সে পঞ্চবিষয়ের অর্থাৎ পঞ্চ স্কন্ধের উপর নিজ নায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে, তার মহাসুখের অন্তরায় হ'তে পারে এমন কোনো শক্তিকেই এখন সে আর উপলব্ধি করে না। পদকর্তা বলেন, এখন তিনি মহাসুখরূপ রবিতাপে অর্থাৎ বিরমানন্দে এরূপে মগ্ন যে, ও ছাড়া আর কিছুই অনুভব করতে পারছেন না।

।। ১৭ ।।

বীণাপাদানাম্

রাগ—পটমঞ্জরী

সুজ[১] লাউ সসি লাগেলি তান্তী।
অণহা দান্ডী চাকি[২] কিঅউ[৩] অবধূতী।। ধ্রু।।
বাজই আলো সহি হেরুঅ বীণা।
সুণ[৪] তান্তি ধনি বিলসই করুণা[৫]।। ধ্রু।।

১—চর্যাগীতি-পদাবলী, ১৫৯
২—চর্যাপদ, পৃ. ২৪০
৩—Buddhist Mystic Songs, Karachi, 1960 p. 35
৪—Buddhist Mystic Songs, (Revised & Enlarged Edition), Dacca 1966, p. 51
৫—চর্যাগীতি-পদাবলী, পৃ. ১৬৪
৬—চর্যাপদ, পৃ. ২৫২

আলি কালি বেণি সারি মুণিআ[৬]।
গঅবর সমরস সান্ধি গুণিআ॥ ধ্রু॥
জবে[৭] করহা[৮] করহকলে চাপিউ[৮]।
বতিস[৯] তান্তি ধনি সঅল[১০] বিআপিউ॥ ধ্রু॥
নাচন্তি বাজিল[১১] গান্তি[১২] দেবী।
বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই॥ ধ্রু॥

পাঠান্তর :—

১. সুজ (ক) ২. বাকি (ক), এাকি (গ) ৩. কিঅত (ক, ঘ) ৪. সুন (ক) ৫. রুণা (ক, ঘ) ৬. সুনেআ (ক সুণিআঁ (গ) ৭. জবে (ক) ৮-৮. করহক লেপি চিউ (ক) ৯. বতিশ (ক, ঘ) ১০, সএল (ক) ১১, বাজিল (গ) ১২, গাঅন্তি (গ)।

শব্দার্থ, টীকা, ব্যুৎপত্তি :—

সুজ<সূর্য্য। লাউ<অলাবু—একতারার খোল। সসি<শশী। তান্তী>তন্ত্রিকা; তাঁত। অণহা—অনহা (১১নং চর্যা) দ্রষ্টব্য দান্ডী<দণ্ডিকা ডাটি। চাকি<চক্রিকা—চাকতি। কিঅউ< কৃতম্। সহি>সখী। হেরুঅ<হেরুক—বৌদ্ধতন্ত্রে উল্লেখিত একজন দেবতা। ধনি<ধ্বনি। সারি<শারিকা; বীণার ছড়ি (শহীদুল্লাহ সাহেবের মতে)[১]; সুরের চাবি বা পঙ্‌ক্তি (সুকুমার সেনের মতে)[২]। মুণিআ—মুনিআ (১০ নং চর্যা) দ্রষ্টব্য। গঅবর<গজবর। সান্ধি<সন্ধি; তাঁতের বীণার ক্ষুদ্র অংশ যা বৃহৎ অংশকে জোড়া দেয়। জবে<যখন। করহা-করভ> করহ+আ—উট (শহীদুল্লাহ্)[৩]; পাণিপার্শ্ব (সুকুমার সেন)[৪]; হস্তীশাবক (মণীন্দ্রমোহন বসু)[৫]। করহকলে—করহ+কল+এ (তৃতীয়ার চিহ্ন)। চাপিউ<চাপিতম্—চাপা পড়ে, চাপা হইল। বতিশ<বত্রিশ। বিআপিউ<ব্যাপিতঃ। নাচন্তি< নৃত্যন্তি। বাজিল—বজ্র>বাজ+ইল (অস্ত্যর্থে)—বজ্রগুরু,

বজ্রধর। গান্তি<গায়ন্তি। বিসমা—বিষম>বিসম+আ।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর :—

সূর্য হ'ল (বীণার) লাউ অর্থাৎ খোল; চন্দ্রকে লাগানো হ'ল অর্থাৎ করা হ'ল তন্ত্রী। অনাহতকে (করা হ'ল) ডান্ডা (এবং) চাকি করা হ'ল অবধূতীকে। ওলো সখি, হেরুক-বীণা বাজছে, করুণা-ধ্বনি শূন্যতা-তন্ত্রিতে বিলসিত হচ্ছে। আলি-কালি দুটিকে জানলাম বীণার ছড়ি। গজবর-সমরসকে সন্ধি গণ্য করলাম। যখন উটের-জন্য-পাতা-কলে উট ধরা পড়ে (তখন) বত্রিশ তাঁতের সকল ধ্বনি ব্যাপ্ত হয়। বজ্রাচার্য নাচেন, দেবী গান করেন। বুদ্ধনাটক হয় বিষম (শক্ত)।

অন্তর্নিহিত ভাব :—

বাম ও ডান দিকের ইড়া-পিঙ্গলা যখন মধ্যপথ সুষুম্না বা অবধূতিকার সঙ্গে যুক্ত হয় তখন এক প্রকার অনাহত ধ্বনি উত্থিত হ'তে থাকে। সেই অনাহত ধ্বনিকারী বাণী কিভাবে প্রস্তুত করা হ'ল তারই বর্ণনা এই চর্যায় পাওয়া যাচ্ছে। সূর্যকে লাউ, চন্দ্রকে তন্ত্রী এবং অনাহতকে দন্ড ও অবধূতীকে চাকিরূপে নিয়ে এই অপূর্ব বীণাটি তৈরী করা হয়েছে অর্থাৎ লাউরূপী সূর্য এবং তন্ত্রীরূপী চন্দ্রকে অনাহত দন্ডের সঙ্গে সংযুক্ত করা হ'ল অবধূতি-চাকির দ্বারা। এই অপূর্ব বীণাকে বলা হয়েছে হেরুক-বীণা—হেরুক হচ্ছেন বৌদ্ধতন্ত্রে উল্লেখিত একজন দেবতা। এই হেরুক-বীণা যখন বাজে তখন তন্ত্রীর শূন্যতা-ধ্বনিতে করুণা ব্যাপ্ত হয়ে যায়।

পদকর্তা বলছেন, আমি আলি কালিকে সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন ক'রে তাকে এই বীণার ছড়ি করলাম অর্থাৎ আলি-কালিকে অবধূতিকার সঙ্গে যুক্ত করলাম। এর ফলে গজবর অর্থাৎ চিত্তরাজ সমরসীভাব প্রাপ্ত হ'ল। সমরস হচ্ছে শূন্যতা করুণার আভেদ-মিলনজনিত সহজাবস্থা। এই সহজাবস্থা হেরুক-বীণার সুরে সমতা রক্ষা করে।

এইভাবে সহজাবস্থা প্রাপ্ত হ'লে চিত্তরাজ দমন করে করভকে (অর্থাৎ চিত্তচাঞ্চল্যকে) এবং তখন বত্রিশ নাড়ি থেকে বত্রিশ প্রকার শূন্যতাধ্বনি

উত্থিত হয়ে সমস্ত দিকে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপেই চিত্ত তখন নির্বাণে আরোপিত হয়। এমন একটি অবস্থায় উপনীত হয়ে বজ্রাচার্য বীণাপাদ নৃত্য করেছেন, দেবী নৈরাত্মা গাইছেন—আর এইভাবে সমাপ্ত হচ্ছে বুদ্ধনাটক।

॥ ১৮ ॥

কৃষ্ণবজ্রপাদানাম্‌

(কাহ্নপাদানাম্‌)

রাগ—গউড়া

তীণি[১] ভূঅণ মই বাহিঅ হেলেঁ।
হউঁ[২] সুতেলী[৩] মহাসুহ লীলেঁ[৪] ॥ ধ্রু ॥
কইসণি হালো ডোম্বী তোহোরী ভাভরিআলী।
অন্তে কুলিণজন মাঝেঁ কাবালী ॥ ধ্রু ॥
তই[৫] লো ডোম্বী সঅল বিটালিউ[৬] ॥
কাজ ণ কারণ সসহর টালিউ ॥ ধ্রু ॥
কেহো[৭] কেহো তোহোরে বিরূআ বোলাই।
বিদুজণ লোঅ তোরেঁ কণ্ঠ ন মেলই[৮] ॥ ধ্রু ॥
কাহ্নে গাই তু[৯] কাম চণ্ডালী।
[১০] ডোম্বি তো আগলি[১০] নাহি ছিণালী[১১] ॥ ধ্রু ॥

১—Buddhist Mystic Song, Dacca 1966, P. 54

২—চর্যাগীতি পদাবলী পৃঃ ১৯৩

৩—Buddhist Mystic Song, P. 54

৪—চর্যাগীতি-পদাবলী—পৃঃ ১৫৯

৫—চর্যাপদ, পৃঃ ৯১

পাঠান্তর :—

১ তিনি (ক) ২. হাউ (ক) ৩. সুতেলি (ক, ঘ) ৪. লীড়ে' (ক, ঘ) ৫. ত'ই (ক ঘ) ৬. বিটলিউ (ক) ৭. কেহে (ক) ৮. মেলঈ (ক) ৯. গাইতু (ক), গাইউ (ঘ) ১০-১০. ডোম্বিতআগলি (ক. গ), ডোম্বিত আগলি (ঘ) ১১. চ্ছিণালী (ক, ঘ)

শব্দার্থ, টীকা, ব্যুৎপত্তি :-

তীণি <ত্রীণি; তিন। ভুঅণ <ভুবন। বাহিঅ <বাহিতম্। হেলে'—হেল (<হেলা)+এ' (<এন)। হউ'<অহকম্; আমি। সুতেলী - সুপ্ত>সুও>সুত+ইল্ল>সুতেল+ই (তুচ্ছার্থে)। লীলে'—লীলা+এ' (৭মীর চিহ্ন)। কইসণি—কীদৃশন>কইসন +ই (স্ত্রীলিঙ্গে)। ভাভরিআলী—ছেনালিপনা, নাগরীপনা; ভাবাটী>ভাভরি+আলী (স্বার্থবাচী প্রত্যয়, অথবা ভর্তরিকা + আলী>ভাভরিআলী। অন্তে—একপাশে; টীকা অনুসারে—বাহ্যে বা বস্তু জগতে। কুলিণজণ—টীকা অনুসারে তারাই কুলিণ-জণ বস্তু জগতে রূপাদিবিষয় সমূহে যারা লীন থাকে—"কৌ শরীরে লীনং ইতি কুলিণ।" বিটালিউ <বিট্টলিঅ <বিষ্টলিতঃ—অশুচি হইল। সসহর < শশধর। টালিউ < টালিতঃ। তোহোরে—তোহোর (১০নং চর্যা দ্রষ্টব্য +এ (দ্বিতীয়ার চিহ্ন)। বিরুআ < বিরূপম্। বিদুজন <বিদগ্ধজন। তোরে' - তব> তো+র (কেরক-জাত)+এ' (কর্মকারকের বিভক্তি)। মেলই—মেল (পরিত্যাগ করা অর্থে +ই (<তি)। কাহ্নে - কৃষ্ণ> কাহ্ন+এ (কর্তৃকারকে 'এ' বিভক্তির ব্যবহার); কিন্তু সুকুমার সেনের মতে—কৃষ্ণেণ > কাহ্নে (করণ)[১]। গাই < গায়তি—গায়। আগলি < অগ্রলিকা। ছিণালী--ছিন্ন+নাল (নাসা অর্থে)+ঈ (স্ত্রী প্রত্যয়) > ছিণালী; অবহট্‌ঠে চ্ছিন্নালিআ।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর :—

তিন ভুবন আমি অবলীলাক্রমে অতিবাহিত করলাম, (এবং) মহাসুখ-

লীলায় সুপ্ত হলাম। ওলো ডোম্বি, কেমন তোর নাগরীপনা! অন্তে কুলীনজন (অর্থাৎ স্বামী), মাঝে (অর্থাৎ ভিতরে) কাপালিক। ওলো ডোম্বি, তোর দ্বারা সব কিছু অশুচি হ'ল। বিনা কাজে (এবং) বিনা কারণে চন্দ্র বিচলিত হ'ল (তোর দ্বারা)। কেউ কেউ তোকে মন্দ বলে, (কিন্তু) বিদ্বজ্জন তোকে কণ্ঠ থেকে ছাড়ে না; কানু গাইলেন, তুই কামচণ্ডালী, ডোম্বি! তোর অধিক ছিনালী আর নেই।

অন্তর্নিহিত ভাব :—

তিন ভুবন অর্থ কায়-বাক-চিত্তের ত্রিভুবন—এই ত্রিভুবনে যতক্ষণ আবদ্ধ থাকা যায় ততক্ষণ চিত্ত অচিত্ততায় লীন হ'তে পারে না এবং সহজানন্দও উপলব্ধি করা যায় না। তাই পদকর্তা কানু পা মহাসুখলীলায় সুপ্ত হবার জন্য কায়বাক্‌চিত্তের অতীত লোকে উপনীত হয়েছেন। এখন তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারছেন—অবধূতিকা-ডোম্বীর প্রকৃত স্বরূপ কি। দুষ্টা স্ত্রীলোকের মতো মহাসুখরূপিণী ডোম্বীর দ্বিবিধ মূর্তি—বাইরে স্বামী-সঙ্গ ঠিকই থাকে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে অন্য এক কাপালিকের সঙ্গে লীলা চলে; অর্থাৎ দ্বিবিধ মূর্তিতে সে দুই ধরনের লোকের সঙ্গে লীলা করে। স্বামী অর্থে সাংসারিক মানুষ—অপরিশুদ্ধারূপিণী ডোম্বী সাংসারিক মানুষকে বিনাশের পথে নিয়ে যায়। তাদের উষ্ণীষ-কমলে অবস্থিত দেহের চন্দ্ররূপী অমৃত বিচলিত করে এই ডোম্বী—ফলে মানুষ হয় ধ্বংস-পথের যাত্রী। কিন্তু পরিশুদ্ধারূপিণী ডোম্বী গোপনে সঙ্গ দান করে কেবল সংসার-বিরাগী কাপালিককে, নৈরাত্মারূপে সে কাপালিককে মহাসুখ-সঙ্গমে নিয়ে যায়। এ সব কারণে সাধারণ লোকে সেই ডোম্বীকে খারাপ বলে গালাগালি করলেও সত্যকার তত্ত্বজ্ঞানী যিনি, তিনি কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও তার সঙ্গ ত্যাগ করতে চান না।

ডোম্বীর এই দ্বিবিধ মূর্তি লক্ষ্য করেই পদকর্তা তাকে কামচণ্ডালী ছিনালী ব'লে অভিহিত করেছেন।

১—চর্যাগীতি-পদাবলী পৃঃ ১৬১

॥ ১১ ॥

কৃষ্ণপাদানাম্‌ (কাহ্নপাদানাম্‌)

রাগ—ভৈরবী

ভব নিব্বাণে[১] পড়হ মাদলা।
মণ পবণ বেণ্ণি করন্ড কশালা ॥ ধ্রু ॥
জঅ জঅ দুন্দুহি সাদ উছলিআঁ[২]।
কাহ্ন ডোম্বী বিবাহে চলিআ[৩] ॥ ধ্রু ॥
ডোম্বী বিবাহিআ আহারিউ[৪] জাম।
জউতুকে কিঅ অণুত্তর[৫] ধাম ॥ ধ্রু ॥
অহণিসি[৬] সুরঅ পসঙ্গে জাই[৭]।
জোইণিজালে রঅণি[৮] পোহাই[৯] ॥ ধ্রু ॥
ডোম্বী-এর সঙ্গে জো জোই রত্তু[১০]।
খণহ ন ছাড়ই সহজ-উন্মত্ত[১১] ॥ ধ্রু ॥

পাঠান্তর:

১. নিব্বাণে (ক) ২. উছলিলা (গ) ৩. চলিলা (গ) ৪. অহারিউ (ক, ঘ) ৫. আণুতু (ক, ঘ) ৬. অহিণিসি (ক) ৭. জাঅ (ক, ঘ) ৮. রএণি (ক, ঘ) ৯. পোহাঅ (ক, ঘ) ১০. রত্তো (ক, ঘ) ১১. উন্মত্তো (ক, ঘ)

শব্দার্থ, টীকা, ব্যুৎপত্তি:—

নিব্বাণে- নির্ব্বাণ>নিব্বাণ+এ (< এন)। পড়হ< পটহ—বাদ্যযন্ত্র। মাদলা<মদ্দ'ল; বাদ্যযন্ত্র। করন্ড—এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র। কশালা<কাংস্যতাল—এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র। জঅ- জয়। দুন্দুহি <দুন্দুভি—এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র। সাদ<সদ্দ<শব্দ। উচ্ছলিআঁ <উৎসারিত—উচ্ছলিত হইল; অথবা, উচ্ছলিত্য>উচ্ছলিঅ> উছলিআঁ—উচ্ছলিত হইয়া। বিবাহে- বিবাহ+এ (৭মী)। চলিআ<চলিতক—চলিয়াছে। বিবাহিআ<বিবাহিত—বিবাহ করিয়া। আহারিউ < আহারিতঃ। জাম < জম্ম < জন্ম।

জউতুকে—যৌতুক>জউতুক+এ (এখানে ৪র্থী)। ধাম<ধর্ম্ম<ধর্ম্ম। অহণিসি<অহর্নিশ। সুরঅ<সুরত। পসঙ্গে—প্রসঙ্গ>পসঙ্গ+এ (<এন)। রঅণি<রজনী। পোহাই<প্রভাতি। রত্ত<রক্ত—অনুরক্ত অর্থে। খণহ—খনহ (৬নং চর্যা) দ্রষ্টব্য।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর ঃ

ভব ও নির্বাণ (হ'ল যথাক্রমে) পটহ ও মাদল। মন ও পবন (হ'ল) দুটি (বাদ্যযন্ত্র)—করন্ড ও কশালা। দুন্দুভিতে জয় শব্দ উচ্ছলিত হ'ল, কাহ্নপাদ চললেন ডোম্বীকে বিয়ে করতে। ডোম্বীকে বিয়ে ক'রে (তিনি) জন্ম আহার করলেন। অনুত্তর ধর্মকে করলেন যৌতুক। দিবারাত্রি সুরত-প্রসঙ্গে (কেটে) যায়। যোগিনী-জালে রজনী প্রভাত হয়। ডোম্বীর সঙ্গে যা যোগী অনুরক্ত (হয়), সে সহজে উন্মত্ত হয়ে ক্ষণেকের জন্যও (সেই ডোম্বীকে) ছাড়ে না।

অন্তর্নিহিত ভাব ঃ—

পরিশুদ্ধাবধূতিকা ডোম্বীর সঙ্গে পদকর্তা কানু-পার মিলন ও মহাসুখ-লাভের ব্যাপারটি এই পদে বিবাহের রূপকে বর্ণিত হয়েছে। বিবাহ যাত্রাকালে যেমন নানাপ্রকার বাদ্যধ্বনি সহকারে উৎসব করা হয় তেমনি কানুপার সাধন-মার্গে অগ্রসর হওয়ার পথে অনাহত ধ্বনি বেজে ওঠে;—এই অনাহত ধ্বনি তখনি উত্থিত হয় যখন ভাব-নির্বাণ ও মন-পবনাদি বিকল্প ধ্বংস ক'রে অবিদ্যার প্রভাব থেকে সাধক মুক্ত হন।

ডোম্বীকে বিবাহ ক'রে কানুপা জন্ম আহার করলেন এবং অনুত্তর ধাম যৌতুকস্বরূপ লাভ করলেন অর্থাৎ নৈরাত্মারূপিণী ডোম্বীর সঙ্গে মিলিত হয়ে কানুপা পুনর্বার জন্মগ্রহনের সম্ভাবনা থেকে মুক্ত হলেন এবং যৌতুকস্বরূপ লাভ করলেন নির্বাণাবস্থা। এখন তার সাহচর্যে তিনি সর্বক্ষণ পরমানন্দে যাপন করছেন এবং সহজজ্ঞান লাভ হওয়ার ফলে অজ্ঞানরাত্রি দূরীভূত হয়েছে। এইভাবে নৈরাত্মারূপিণী ডোম্বীর প্রতি অনুরক্ত হয়ে যে যোগী সহজানন্দে উন্মত্ত হয় সে আর ক্ষণেকের জন্যও সে ডোম্বীকে ছাড়তে পারে না।

॥ ২০ ॥

কুক্কুরীপাদানাম্

রাগ—পটমঞ্জরী

হউ'[১] নিরাসী খমণ ভতারী[২]
মোহোর বিগোআ কহণ ন জাই ॥ ধ্রু ॥
ফিটিলিউ[৩] গো মাই[৪] অন্তউড়ি চাহি ।
জা এথু চাহম[৫] সো এথু নাহি ॥ ধ্রু ॥
পহিলে[৬] বিআণ মোর বাসন-পুড়া[৭] ।
নাড়ি বিআরন্তে সেঅ[৮] বাপুড়া[৯] ॥ ধ্রু ॥
জা ণ[১০] জোবণ মোর ভইলেসি[১১] পুরা ।
মাঅ নিখলি[১২] বাপ সংঘারা ॥ ধ্রু ॥
ভণথি কুক্কুরীপাএ[১৩] ভব থিরা ।
জো এথু বুঝাই[১৪] সো এথু বীরা ॥ ধ্রু ॥

পাঠান্তর :—

১. হাঁউ (ক) ২. খমণভতারে (ক), খমণ সাঙ্গ (ঘ) ৩. ফেটলিউ (ক), ফিটেল (গ), ফিটলেসু (ঘ) ৪. মাত্র (ক) ৫. বাহাম (ক), চাহমি (ঘ) ৬. পাহিল (ক) ৭. বাসনপুড় (ক), বাসনয়ুড়া (ঘ) ৮ সেব (ক) ৯. বায়ুড়া (ঘ, ঙ) ১০. জাণ (ক) ১১. ভইলে সি (গ) ১২. মুলনখলি (ক) ১৩. কুক্কুরীপা এ (ঘ) ১৪. বুঝএ' (ক, ঘ)।

শব্দার্থ, টীকা, ব্যুৎপত্তি :—

হউ'<অহকম্ — আমি। নিরাসী<নীরাশী। খমণ<ক্ষপণক। ভতারী-ভর্তার>ভতার+ঈ (ইন্ত্যর্থে)। বিগোআ—টীকা অনুসারে অর্থ—বিশিষ্ট সংযোগ হেতু অসীম মহানন্দের অনুভব; এই অর্থ অনুসারে বিগোআ শব্দটি বিজ্ঞান পরিবর্তিত রূপ

হ'তে পারে। কহণ—কাহা, বলা। ফিটিলিউ—প্রসূত হইলাম; সুকুমার সেন 'গর্ভমোচন করিলাম অর্থে' ফিটলেস্ পাঠ নিয়েছেন।[১] মাই—'ই' সম্বোধনে। অন্তউড়ি<অন্তঃকুটী—আঁতুড়; অথবা অন্তঃপুটিকা*>অন্তউড়ী (সুকুমার সেন)[২]। জা>যম্; অথবা যস্য>জা—যা। চাহম—চাহমি অর্থাৎ 'আমি চাই' অর্থে। পহিলে- পহিলে (১২ নং চর্যা) দ্রষ্টব্য। বিআণ<বেদনা—প্রসব। বাসন<বাসনা। পুড়া<পুট্ট<পুত্র। বিআরন্তে—বিচার<বিআর+অন্তে>বিআরন্তে (শতৃজাত অসমাপিকা)। সেঅ>সেব<সৈব–সে-ও। বাপুড়া (১০ নং চর্যা) দ্রষ্টব্য; বাপুড়ী—স্ত্রীলিঙ্গ, পুংলিঙ্গে বাপুড়া, বাপুড়া। জা<যস্য; অথবা যস্মিন্>জা - যখন। ণ<নব। জোবণ<যৌবন। ভইলেসি—হইল। পুরা<পুরক—পূর্ণ। নিখলি<নিষ্কালিতম--তাড়ানো হইল। বাপ<বপ্র। সংঘারা—সংহার>সংঘার+আ (বিশেষণে)। ভণথি<ভণতি। পাএঁ—পা (<পাদ)+এ (কর্তৃকারকে 'এ' বিভক্তি আধুনিক বাংলাতেও দেখা যায়, যেমন—লোকে বলে)। থিরা<স্থির। বুঝই<বুধ্যতে।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর:

আমি নিরাশী। (আমার) স্বামী ক্ষপণক (অথবা, আকাশবৎ শূন্য মন)। আমার সুরত-সুখ (এমন যে) বলা যায় না। ওগো মা, আঁতুড় ঘরের দিকে তাকিয়ে প্রসূত হলাম। এখানে যা চাই, তা এখানে নেই। আমার প্রথম প্রসব বাসনা-পত্র। নাড়ী বিচার করতে গিয়ে দেখি সেও হতভাগ্য। যখন আমার নব যৌবন পূর্ণ হ'ল, মাকে তাড়ালাম, বাপকে সংহার করলাম। কুক্কুরীপাদ বলেন, সংহার স্থির। যে এখানে বোঝে, সে-ই এখানে বীর।

অন্তর্নিহিত ভাব:—

এখানে 'আমি' হচ্ছে স্বয়ং নৈরাত্মা দেবী। সে দেবী নিরাশী অর্থাৎ সর্বপ্রকার আসঙ্গরহিতা, তার স্বামী ক্ষপণক—সংসার-মুক্ত মনের অধিকারী। এই স্বামী

সংসর্গে সে অপরিসীম সহজানন্দের অধিকারী। অন্তউড়ি বা আঁতুড় ঘর হচ্ছে উৎপত্তি-সম্বন্ধীয় তত্ত্ব—এই তত্ত্ব অবগত হয়ে সে প্রসূত হ'ল অর্থাৎ বিষয়াদি জ্ঞান ঝেড়ে ফেলে দিয়ে মুক্ত হ'ল। বাহ্যজগতের বিষয়াদি যা প্রবলভাবেই সাধারণ মানুষ চায় এখানে তা নেই। তার প্রথম জ্ঞানোন্মেষ যখন হয় তখন বাসনাপুট এই দেহকেই সে আপন মনে করেছিল, কিন্তু পরীক্ষা ক'রে তার প্রকৃত রূপ যখন সে অবগত হ'ল তখন তাকেও হতভাগ্য মনে হ'ল তার। অতঃপর যখন সে নব যৌবন লাভ করল অর্থাৎ পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হ'ল তখন সংবৃতি বোধিচিত্তকে সংহার করল সে। কারণ সে জানে এই সংবৃতি বোধিচিত্তই সকল বাসনার মূল।

পদকর্তা বলেন, এই সংসার স্থির—যেমন ছিল তেমনিই আছে; প্রজ্ঞানেত্রে দেখলে বুঝা যায়, এখানে কিছু আসে না, এখানে থেকে যায়ও না কিছু। এসব যে বোঝে সে বীর, কারণ উৎপত্তি-বিনাশ জনিত্‌ীয় বিপরিবর্তনে সে বিচলিত হয় না।

॥ ২১ ॥

ভুসুকুপাদানাম্

রাগ—বরাড়ী

নিসিত[১] আন্ধারী[২] মুসার[৩] চারা।[৪]।
অমিঅ ভখই[৫] মুসা[৬] করই[৭] আহারা ॥ ধ্রু ॥
মার রে জোইআ মুসা[৬] পবণা।
জেঁণ[৮] তুটই[৯] অবণাগবণা ॥ ধ্রু ॥

১—চর্যাগীতি-পদাবলী, পৃ. ১৭৮

২—ঐ, পৃ. ১৫৪

ভববিন্দারই[১০] মূসা[৬] খণই[১১] গাতো[১২]।
চঞ্চল মূসা[৬] কলিআঁ নাশক থা তো[১৩]॥ ধ্রু॥
কাল[১৪] মূসা[১৫] উহ্ণ[১৬] বাণ।
গঅণে উঠি চরই[১৭] আমণ[১৮] ধাণ॥ ধ্রু॥
তাব[১৯] সে মূসা[১৫] পাঞ্চল।
সদ্‌গুরু বাহে করিহ সো নিচ্চল॥ ধ্রু॥
জবেঁ মূসাএর[২০] চারা[২১] তুটই[২২]।
ভুসুকু ভণই[২৩] তবেঁ বান্ধন ফীটই[২৪]॥ ধ্রু॥

পাঠান্তর :—

১. নিসিঅ (ক), নিসি (ঘ) ২. অন্ধারী (ক) ৩. সূসার, (ঙ) মূসা (গ) ৪. অচারা (গ) ৫. ভখঅ (ক, ঘ) ৬. মূসা (ক, ঘ) ৭. করঅ (ক) ৮. জে'ণ (ঘ) ৯. তুটঅ (ক,ঘ) ১০. বিন্দারঅ (ক) ১১. খনঅ (ক) ১২. গাতী (ক, গ, ঘ) ১৩. থাতী (ক, ঘ) ১৪. কলা (ক) ১৫. মূষা (ক) ১৬. উহ ণ (ক), উহণ (ঘ) ১৭. চরঅ (ক) করঅ (ঘ) ১৮. অমর্ণ (ক, ঘ) ১৯. তব (ক) ২০. মূষাএর (ক, ঘ), মূসা (গ) ২১. চা (ক), অচার (গ), চার ঘ) ২২. তুটঅ (ক, ঘ) ২৩. ভণঅ (ক, ঘ), ২৪. ফিটঅ (ক, ঘ)

শব্দার্থ, টীকা, ব্যুৎপত্তি :—

নিসিত—নিসি (<নিশি)+ত (সপ্তমীর চিহ্ন)। আন্ধারী—অন্ধকারময়। মূসার—মূসা (<মূষক+র) ষষ্ঠী। চারা<চার—খাদ্য। অমিঅ<অমৃত। ভখই—ভক্ষণ করে, ভক্ষতি>ভখই। করই<করোতি। মার<মারয়—(অনুজ্ঞা)। জোইআ <যোগিক—যোগী জে'—যদ শব্দের তৃতীয়ার একবচনে যেন> জে'। তুটই < ত্রুট্যতে টুটে। অবণাগবণা < আগমনগমণ। বিন্দারই< বিদারয়তি। খণই < খনতি—খনন করে। গাতো <গর্ত। কলিআঁ < কলিত—জানিয়া। নাশক—নাশ + ক

(ষষ্ঠীর চিহ্ন)। থা—থাক। তো<ত্বম্—তুমি, তুই। উহ <উহতে—লক্ষিত হয়। বাণ<বর্ণ। উঠি<উৎ+স্থিত উঠিয়া। চরই<চরতি—বিচরণ করে। আমণ—আমন ধান, অথবা অ+মন>আমন—অন্য মন। ধাণ—ধান, অথবা, ধ্যান>ধাণ। তাব <তাবৎ। উঞ্চল পাঞ্চল—আঁচড় পাচড়। বোহে—বোধ>বোধ+এ (তৃতীয়া)। করিহ < করিষ্যথ করিও। নিচ্চল < নিশ্চল। মূসাএর- মূষক<মূষা+এর (ষষ্ঠী.। তবে'—তখন। বান্ধন—বান্ধণ (৯) নং চর্যা) দ্রষ্টব্য। ফীটই>স্ফিটয়তি—টুটিয়া যায়, খুলিয়া যায়।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর :—

মূষিকের খাদ্য অন্ধকার রাত্রে। মূষিক অমৃত ভক্ষণ করে (এবং) করে আহার। যার জন্য বন্ধ হচ্ছে না আনাগোনা, (সেই) মূষিক-পবনকে, হে যোগী, তুমি মার। মূষিক বিদারণ করে গৃহকে এবং খনন করে গর্ত। মূষিককে চঞ্চল জেনে তাকে নাশ করবার জন্য তুই (প্রস্তুত) থাক। মূষিক কালো, (তার) রঙ দেখা যায় না। গগনে উঠে সে আমন ধানের উপর চ'রে বেড়ায় (অথবা অনামনস্কভাবে ধ্যান করে)। তাবৎ সে মূষিক চঞ্চল (যতক্ষণ না) সদ্‌গুরুর বোধে তাকে নিশ্চল কর (অর্থাৎ সদ্‌গুরুর উপদেশ অনুসারে তাকে নিশ্চল করতে না পারা পর্যন্ত সে মূষিক চঞ্চল থাকবেই)। তখন মূষিকের খাদ্য বন্ধ হয়, ভুসুকু বলছেন, তখনই বন্ধন খুলে যায়।

অন্তর্নিহিত ভাব :—

মূষিক হচ্ছে সংবৃতি বোধিচিত্ত যা সর্বদাই চঞ্চল এবং অজ্ঞানান্ধকারে যার আনাগোনা। সে দেহামৃত ভক্ষণ ক'রে মানুষকে বিনাশের পথে নিয়ে যায়। সে জন্য যোগীরা তাকে মেরে তার গমনাগমন বন্ধ ক'রে দেয়। এই সংবৃতি বোধিচিত্তই মানুষের মধ্যে ভবজ্ঞান অর্থাৎ সাংসারিক বিকল্পাদি সৃষ্টি করে এবং সংসারখাদে পতনের জন্য খনন করে মায়া-গর্ত। অতএব সে মূষিককে বিনাশ

করার জন্য যোগীকে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে। সেই সংবৃত্তি বোধিচিত্তের কোনো বর্ণ ব'লে তাকে কালো বলা হয়েছে। গগনে উঠে অর্থাৎ মহাসুখকমলে প্রবিষ্ট হয়ে সেখানকার সকল অমৃত সে নষ্ট ক'রে দেয়। অতএব সদ্‌গুরুর উপদেশে তার সকল চলাচল বন্ধ ক'রে দিতে হবে, তার চঞ্চলতা দিতে হবে নষ্ট ক'রে—তাহ'লেই ভববন্ধন বিদূরিত হবে।

———

॥ ২২ ॥

সরহপাদানাম্

রাগ–গুঞ্জরী

আপণে[১] রচি রচি ভব নিব্বাণা[২]।
মিছে লোঅ বন্ধাবই[৩] আপণা[৪] ॥ ধ্রু ॥
আমহে[৫] ন জানহু[৬] অচিন্ত জোই।
জাম মরণ ভব কইসণ হোই। ॥ধ্রু ॥
জইসো জাম মরণ বি তইসো।
জীবন্তে মইলে[৭] ণাহি বিশেসো ॥ ধ্রু ॥
জা এথু জাম মরণেরি[৮] সংকা[৯]।
সো করউ রস রসানেরে কংখা[১০] ॥ ধ্রু ॥
জে সচরাচর তিঅস ভমন্তি।
তে অজরামর কিমপি ন হোন্তি।
জামে কাম কি কামে জাম।
সরহ ভণন্তি[১১] অচিন্ত সো ধাম ॥ ধ্রু ॥

পাঠান্তর ঃ—

১. অপণে (ক) ২. নির্বাণা (ক, ঘ) ৩. বন্ধাবএ (ক) ৪. অপণা

(ক) ৫. অম্ভে (ক), ৬. জানহু (ক) ৭. মঅলে' (ক, ঘ) ৮. মরণে (ক), মরণে বি (ঘ) ৯: বিসংকা (ক) ১০. কখা (ক) ১১: ভণতি (ক)

শব্দার্থ, টীকা, ব্যুৎপত্তি :—

রচি<রচিত – রচনা করিয়া। নিব্বাণা—নির্বাণ> নিব্বাণ+আ (বিশিষ্টার্থে)। বন্ধাবই < বন্ধাপয়তি – বাঁধায়। আপণা< আত্মানম্ – নিজেকে। জানহু—জান+হু (অহম্-জাত); আমি জানি। অচিন্ত<অচিন্ত্য। মইলে<মৃত + ইল্ল+এ (৭মী) বিশেসো—বিশেষ। জা<যস্য—যার। মরণেরি—মরণের। সংকা —শংকা। করউ<করোতু—করুক। রসানেরে—রসায়ন>রসান +এরে (বিভক্তি)। কংখা <আকাংখা—আকাংখা। তিঅস < ত্রিদশ। ভমন্তি<ভ্রমন্তি—ভ্রমণ করে। হোন্তি<ভবন্তি- হয়।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর :—

নিজেই ভব-নির্বাণ রচনা ক'রে ক'রে মিছেমিছিই লোক নিজেকে বাঁধে। আমরা যারা অচিন্ত্য যোগী (তারা) জানিনে কি ক'রে জন্ম-মরণ ভব হয়। যেমন জন্ম তেমনই মরণ—জীবিত ও মৃতের মধ্যে পার্থক্য নেই। এখানে যার জন্ম-মরণের আশংকা রয়েছে সে-ই করুক রস-রসায়নে আকাঙ্ক্ষা। যারা সচরাচর ত্রিদশে ভ্রমণ করে, তারা কোনমতেই অজরামর হয় না। জন্ম থেকে কর্ম, না কর্ম থেকে জন্ম ? সরহ বলেন, সেই ধর্ম অচিন্ত্য।

অন্তর্নিহিত ভাব :—

ভব ও নির্বাণকে পৃথক ভেবে মিছেমিছিই লোকেরা দ্বৈতজ্ঞানের শৃংখলে নিজেকে আবদ্ধ করে। প্রকৃত সত্য এই যে, ভবের স্বরূপ ঠিক মতো উপলব্ধি করতে পারলেই চিত্ত নির্বাণে আরোপিত হয়। অর্থাৎ ভব-নির্বাণ মূলতঃ কোনো পৃথক ব্যাপার নয়। ভব সম্পর্কে অবিদ্যাবিমোহিত চিত্তের মিথ্যানুভূতি বিদূরিত হ'লেই নির্বাণ লাভ হয়। অচিন্ত্য যোগীরাই এ সম্পর্কে সত্যানুভূতির মুখোমুখি হয়েছেন, অতএব তাঁরাই জন্ম-মৃত্যু-ভব সম্পর্কে প্রকৃত

সত্য অবগত আছেন। তাঁরা জানেন, জন্ম-মৃত্যুতে কোনো পার্থক্য নেই— কারণ, তত্ত্ব-বিচারে ভবেরই কোন অস্তিত্ব নেই। দৃশ্যের উৎপত্তি ও বিনাশ অলীক ধারণা মাত্র – এই ভাবে জন্ম-মৃত্যুও ভ্রান্তিমূলক। কিন্তু এ কথা যারা বুঝে না, যাদের জন্ম-মৃত্যুর আশংকা পুরোমাত্রায় রয়েছে তারাই ক'রে থাকে রসরসায়নের আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ ঔষধি ইত্যাদির সাহায্যে মৃত্যুকে জয় ক'রে অমর হওয়ার কামনা পোষণ করে থাকে তারাই। পক্ষান্তরে যারা পরমার্থ তত্ত্বজ্ঞ তাদের জন্য এ সব রসরসায়নের কোনো প্রয়োজন নেই। যারা পার্থিব সৎকর্মের ফলে স্বর্গে গমন করে তাহাদেরও চরম মোক্ষ লাভ হয় না, কারণ তারা পুণ্যবলে কেবল নির্দিষ্ট সময়ের জন্যই স্বর্গে থাকতে পায়, পরে তাদের সংসারে পুনর্জন্ম নিতে হয়। ফলে বুঝা গেল, অজরামর কেবল তারাই হ'তে পারে যারা পরমার্থ-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে। জন্ম ও কর্ম কোনটি আগে বা পরে—এ বিচার নিরর্থক, কারণ জন্ম-কর্ম দুই-ই চিত্ত ভ্রান্তি মাত্র।

॥ ২৩ ॥

ভুসুকুপাদানাম্

রাগ—বরাড়ী

জই তুম্হে[১] ভুসুকু[২] অহেরি[৩] জাইবে[৪] মারিহসি পাঞ্চজণা[৫]।
নলিণীবন[৬] পইসন্তে হোহিসি একুমণা ॥ ধ্রু ॥
জীবন্তে ভইলা[৭] বিহাণি[৮] মইল[৯] রঅণি[১০]।
বিণু[১১] মাসে ভুসুকু[১১] পা ঘরুণ[১২] পইসহিণি[১৩] ॥ ধ্রু ॥ *
মাআজাল পসরিউ রে[১৪] বাধেলি মাআ হরিণী।
সদ্গুরু বোহে বুঝিরে কাসু কহানী[১৫] ॥ ধ্রু ॥
[পদটির শেষ চারটি চরণ পাওয়া যায়নি। এই চার চরণের যে কল্পিত পাঠক সুকুমার সেন স্থির করেছেন তা ভূমিকায় দেওয়া হয়েছে। ভূমিকা পৃ..৬ দ্রষ্টব্য।]

পাঠান্তর :–

১. তুষ্মে (ক, ঘ) ২. শহীদুল্লাহ সাহেবের গৃহীত পাঠে 'ভুসুকু' শব্দটি পরিত্যক্ত। ৩. অহেই (ক) ৪. জাইব (খ/ পঞ্চজণা (ক) ৬. নলণীবন (ক, ঘ) ৭ ভেলা (ক) ৮. বিহণি (ক) ৯. মঅল (ক) ১০. ণঅণি (ক); ণঅলি (গ. ঘ) ১১. হণবিণ (ক, ঘ) ১২. ১২. পদল্লাবণ (ক) ১৩. পইসাহিলি (গ) ১৪ পসরি উরে (ক) ১৫. কদিনি (ক)

শব্দার্থ, টীকা, ব্যুৎপত্তি :–

জাইবে—যাইবে। মারিহসি<মারয়িষ্যসি। পইসন্তে—প্রবিশ> পইস+অন্ত+এ (বিভক্তি)—প্রবেশ করিতে। হোহিসি<ভবিষ্যসি —হইও। একুমণা—একমনা। বিহাণি—বিভান > বিহাণ+ই (<ইকা)—প্রভাতে। মইল<মৃত+ইল্ল। মাসে<মাংসেন। পই-সহিণি—পইসহি (<প্রবিশসি)+ণি (নঞর্থক)। পসরিউ <প্রসারিতঃ—প্রসারিত হইল। বাধেলি <বদ্ধ+ইল্ল+ই (তুচ্ছার্থে)। কাসু<কস্য। কহানী—কাহিনী।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর :—

তুমি যদি শিকারে যাবে, (হে) ভুসুকু, (তবে) পাঁচজনাকে মেরো। নলিনী-বনে প্রবেশ করতে একাগ্রচিত্ত হও। সকালে জীবন্ত হ'ল, রাত্রে মৃত। ভুসুকু পাদ মাংস ব্যতীত অর্থাৎ মাংস নিয়ে ঘরে প্রবেশ করে না। মায়াজাল প্রসারিত হ'ল, মায়া-হরিণ বদ্ধ হ'ল। সদগুরুর বোধে বা উপদেশে বুঝলাম কার কি কাহিনী।

অন্তর্নিহিত ভাব :–

শিকার অর্থে বিকল্পাত্মক জ্ঞানের বিনাশ-সাধন; বস্তু জগৎ সম্পর্কীয় যাবতীয় দ্বৈতজ্ঞানের বিনাশ-সাধন যদি কাম্য হয় তবে সর্বপ্রথম পঞ্চেন্দ্রিয়কে বশ করতে হবে। তাহ'লে একচিত্ত হয়ে সহজ-নলিনীবনে প্রবেশ-লাভ সম্ভব।

হবে। অদ্বয়জ্ঞানের আলোকে সধাক জীবন্ত হয় অর্থাৎ অজরামর হ'তে পারে, কিন্তু অবিদ্যাচ্ছন্ন অন্ধকারে পতিত হ'লেই ধ্বংস অনিবার্য। পদকর্তা, তাই, মহাসুখকমলে প্রবিষ্ট হওয়ার সময় শিকার-লভ্য মাংস না নিয়ে অর্থাৎ বিকল্পাত্মক জ্ঞানের আধার পঞ্চেন্দ্রিয়কে হত্যা না ক'রে ছাড়েন না। মায়াজাল প্রসারিত ক'রে মায়া-হরিণী বাঁধা হয়েছে। সদ্‌গুরুর উপদেশে বুঝা গেল কার কি তত্ত্ব।

॥ ২৬ ॥

শান্তিপাদানাম্

রাগ—শবরী (শীবরী)

তুলা[১] ধুণি ধুণি আঁসুরে আঁসু।
আঁসু ধুণি ধুণি নিরবর[২] সেসু ॥ ধ্রু ॥
তউ সে[৩] হেরুঅ ণ পাবিঅই।
সান্তি ভণই কিণ সো[৪] ভাবিঅই ॥ ধ্রু ॥
তুলা[১] ধুণি ধুণি সুনে[৫] আহারিউ[৬]।
পুন[৭] লইআঁ আপণা[৮] চটারিউ ॥ ধ্রু ॥
বহণ[৯] বাট[১০] দুইআর[১১] নদীসই[১২]।
সান্তি[১৩] ভণই বালাগ ন পইসই[১৪] ॥ ধ্রু ॥
কাজ ন কারণ জো এহু[১৫] জুঅতি[১৬]
সএঁ[১৭] সংবেঅণ[১৮] বোলথি সান্তি ॥ ধ্রু ॥

---

* ডাঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এই চরণটির বিকল্প পাঠ স্থির করেছেন ঃ
হরিণীর মাসেঁ ভুসুকু পদমবণ পইসহিণি।
দ্র, Buddhist Mystic Songs, p. 72.

পাঠান্তর ঃ—

১. তূলা (ক, ঘ) ২. ণিরবর (ক, ঘ) ৩. যে (ক) ৪. স (ক, ঘ) ৪. সুনে (ব) ৬. অহারিউ (ক, ঘ) ৭. শূন (ঘ) ৮. অপণা (ক, ঘ) ৯. বহল (ক,ঘ) ১০. বট (ক), বঢ় (গ) ১১. মার (ক) ১২. দিশঅ (ক,ঘ) ১৩. শান্তি (ক,ঘ) ১৪. পইসঅ (ক,ঘ) ১৫. জএহু (ক) ১৬. জঅতি (ক), জগতি (গ) ১৭. স'এ' (ক) ১৮. সংবেঅণ (ঘ)

শব্দার্থ, টীকা, ব্যুৎপত্তি ঃ—

তূলা<তূলক। ধুণি<ধুণিত*—ধুনিয়া। আঁসু<অংশু। ণিরবব <নিরবয়বম্ (নিঃ+অবয়ব)। সেসু <শেষঃ। তউ—তবু। হেরুঅ—(১৭ নং চর্যা) দ্রষ্টব্য ; অথবা, হেতুরূপ >হেউরূঅ > হেরুঅ। পাবিঅই > পাঈঅই < প্রাপ্যতে—পাওয়া যায়। কি<কেন—কি করিয়া। ভাবিঅই<ভাব্যতে—ভাবা হয়। সুনে<শূন্য>সুন+এ (কর্মকারকে । পুন—পুনরায়। চটারিউ < চটারিতম্—নিঃশেষিত বা ধ্বংস হইলাম। বহণ বাট—চলার পথ ; সুকুমার সেন মূলের অনুসরণে 'বহল' পাঠ নিয়েছেন, এবং অর্থ করেছে বহুল, দীর্ঘ, প্রচুর।[1] দুইআর < দ্বিআকার। বালাগ (৯ নং চর্যা) দ্রষ্টব্য। এহু <এতস্য- ইহা, এই। জুঅতি < যুকতি < যুক্তি। সএঁ স্বয়ং। স'বেঅণ < সংবেদন। বোলথি—বোল (< প্রা বোল্ল)+থি (<তি) ; বলে।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর ঃ—

তুলো ধুনে ধুনে (হ'ল শুধু) আঁশরে আঁশ, আঁশ ধুনে ধুনে শেষে (তাকে করা হ'ল) নিরবয়ব। তবু সে হেরুক-(বীণা) পাওয়া যায় না (অথবা, তবু সে হেতু-রূপ পাওয়া যায় না)। শান্তি বলছেন, কেন তাকে ভাবা হয় ? তুলো ধুনে ধুনে শূন্যকে আহার করলাম। পুনরায় (শূন্যতায়) নিজেকে নিয়ে নিঃশেষিত হলাম। চলার পথে দ্বয়াকার দেখা যায় না। শান্তি বলছেন, (এমন

কি) কেশাগ্রও (মূর্খের মধ্যে) প্রবেশ করতে পারে না। না কাজ না কারণ—এই যে যুক্তি, শান্তি বলেন, (এ হচ্ছে) স্বয়ং সংবেদন।

অন্তর্নিহিত ভাব ঃ—

অবিদ্যাচ্ছন্ন চিত্ত তুলোর মতো। এই অবিদ্যাচ্ছন্ন চিত্তই একটা প্রাতিভাসিক জগৎ সৃষ্টি করে। এই প্রতিভাসিক জগৎকে বস্তুজগৎ ব'লে মেনে নিয়ে জীব মোহাচ্ছন্ন থাকে। অতএব অবিদ্যাচ্ছন্ন চিত্তকেই প্রথমে ধ্বংস করতে হবে। তুলো ধুনে যেমন আঁশ করা হয় তেমনি চিত্তকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ ক'রে প্রথমতঃ অংশে, পরে শূন্যে বিলীন করা হ'ল। কিন্তু তবু হেতুরূপ কিছু বুঝা গেল না অর্থাৎ চিত্তকে বিশ্লেষণ ক'রেও এই প্রাতিভাসিক জগৎ সৃষ্টির কারণ পাওয়া গেল না। না পাওয়ার কারণ এই যে, এই অধ্যাসের জগৎ চিত্তের স্বরূপ-ধর্মের অন্তর্গত কোনো ব্যাপার নয়, এ হ'ল অবিদ্যাজাত। পদকর্তা তাই বলছেন ঐ সব কারণ ভেবে কোনো লাভ নেই। চিত্তকে তুলো-ধুনা ক'রে (অর্থাৎ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিতে) প্রভাস্বর শূন্যতায় লীন ক'রে দেওয়াই হচ্ছে প্রকৃত কর্তব্য। সেখানে (প্রভাস্বর শূন্যতায়) নিজের অস্তিত্ব তিনি (পদকর্তা লুপ্ত ক'রে দিয়েছেন এবং অদ্বয়তত্ত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে দ্বৈতভাব থেকে মুক্ত হয়েছেন। এ সব তত্ত্ব সাধক ছাড়া সাধারণের বোধগম্য নয়। কার্যকারণাত্মক জ্ঞান দূরীভূত হওয়াই পদকর্তা এখন স্বসংবেদ্য মহাসুখের অধিকারী।

॥ ২৭ ॥

ভুসুকুপাদানাম্

রাগ—কামোদ

আধরাতি[১] ভর কমল বিকসিউ[২]।

বতিস জোইণী তসু অঙ্গ উহ্লসিউ[৩] ॥ ধ্রু ॥

১—চর্যাগীতি পদাবলী, পৃঃ ৪০-৪১

চালিঅ[৪] সসহর[৫] মাগে অবধূই।
রঅণহু সহজে[৬] কহেই[৭] ॥ ধ্রু ॥
চালিঅ সসহর[৫] গউনীবাণেঁ[৮]।
কমলিনী[৯] কমল বহই পণালেঁ। ॥ ধ্রু ॥
বিরমানন্দ বিলক্‌খণ[১০] সুধ[১১]
জো এথু বুঝই সো এথু বুধ[১২] ॥ ধ্রু ॥
ভুসুকু ভণই মই বুঝিঅ[১৩] মেলেঁ।
সহজানন্দ মহাসুহ লীলেঁ[১৪] ॥ ধ্রু ॥

পাঠান্তর :—

১. অধরাতি (ক) ২. বিকসউ (ক) ৩. উহ্নসিউ (ক), উহলসিউ (ঘ)
৪. চালিউঅ (ক), চালিউ (ঘ) ৫. ষষহর (ক) ৬. ষহজে (ক)
৭. কহেই [সোই] (ঘ) ৮. ণিবাণে (ক) ৯ কমলিনি (ক)
১০. বিলক্ষণ (ক) ১১. সুধ (ক) ১২. বুধ (ক) ১৩. বুঝিঅ (ক)
১৪. লোলেঁ (ক, ঘ)

শব্দার্থ, টীকা, ব্যুৎপত্তি :—

আধরাতি < অর্দ্ধরাত্রি। বিকসিউ < বিকশিতঃ—বিকশিত হইল। জোইণী < যোগিনী। তসু < তস্য। উল্লসিউ > উল্লসিতঃ। চালিঅ < চালিতম—চালিত। মাগে - মার্গ > মাগ+এ (৭মী)। অবধূই < অবধূতি। রঅণহু—রতন > রঅণ+হু (< ভ্যঃ পঞ্চমী)। কহেই > কথ্যতে। গউ < গতঃ। নীবাণেঁ—নির্বাণে, নিব্বাণ > নিব্বাণ > নীবাণ+এঁ (এখানে ৭মী)। পণালেঁ—প্রণালীতে; টীকা অনুসারে—প্রকৃষ্ট নাল—প্রণাল, অর্থাৎ .অবধূতী মার্গ; অথবা—পদ্মণাল> পউঅ'ণাল>পণাল+ এঁ (<এন)। বিরমানন্দ—টীকা অনুসারে বিরমানন্দ হচ্ছে বিলক্ষণ-পরিশোধিত চতুর্থ বা তুরীয় আনন্দ। বিলক্‌খণ<বিলক্ষণ। বুধ<বুদ্ধ। বুঝিঅ-বুধ্য>বুজ্‌ঝ>বুঝ

+ইঅ (<ইত)>বুঝিঅ। মেলে'<মেলকেন—মেলায় মিলনে।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর ঃ—

অর্ধ রাত্রি ভর কমল বিকশিত হ'ল। বত্রিশ যোগিনী—উল্লসিত (হ'ল) তাদের অঙ্গ। অবধূতী মার্গে শশধর চালিত হ'ল। রত্ন হেতু (সে) কথিত হয় সহজের দ্বারা। চালিত (হয়ে) শশধর গেল নির্বাণে। কমলিনী কমল বহন করছে মৃণালদণ্ডে (কিংবা) জল প্রণালীতে। বিরমানন্দ বিলক্ষণ শুদ্ধ; (এই কথা) এখানে যে বোঝে সে এখানে বুদ্ধ। ভুসুকু বলেন—মিলনে আমি সহজানন্দ (রূপ) মহাসুখ-লীলা বুঝেছি।

অন্তর্নিহিত ভাব ঃ—

অর্ধরাত্রি অর্থে প্রজ্ঞাজ্ঞানাভিষেকদানের সময়। সাধকের প্রজ্ঞাজ্ঞানাভিষেক কালে যখন শূন্যতারূপ সূর্যের উদয় হয় তখন মহাসুখকমল বিকশিত হয়ে উঠে। সে সময় ললনা, রসনা, অবধূতি প্রভৃতি বত্রিশ নাড়ী আনন্দে উল্লসিত হয়। আর চন্দ্রের অমৃতকে (অথবা পরিশুদ্ধ বোধিচিত্তকে। রক্ষা করবার জন্য তাকে মধ্যবর্তী অবধূতীর পথে চালানো হয়। গুরুবচনরূপ-রত্নের দ্বারা অর্থাৎ গুরুবাক্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে সহজানন্দের কথা প্রচার করতে থাকে।

অবধূতি পথে চালিত পরিশুদ্ধ বোধিচিত্তও নির্বানে প্রবিষ্ট হ'ল। কমলিনী অর্থাৎ অবধূতিকা-নৈরাত্মা মহাসুখরূপ কমল-রস মৃণাল-দন্ডে অর্থাৎ অবধূতী-মার্গে প্রবাহিত করে দিল। তার ফলে সমগ্র অবধূতীমার্গ আনন্দ-রসে আপ্লুত হ'ল। এই আনন্দই বিরমানন্দ—লক্ষণহীণ ও পরিশুদ্ধ। এ কথা যে বোঝে সেই জ্ঞানী। ভুসুকু বলেন যে; তিনি সহজানন্দরূপ মহাসুখলীলা উপলব্ধি করেছেন। বোধিচিত্ত সর্বশূন্যে উপনীত হ'লে যে আনন্দের সঞ্চার হয়—তা-ই সহজানন্দ।

॥ ২৮ ॥

শবরপাদানাম্

রাগ—বরাড়ি (বলাড্ডি)

উঞ্চা উঞ্চা পাবত তহি[১] বসই সবরী বালী।
মোরাঙ্গ[২] পীচ্ছ পরিহাণ[৩] সবরী গীবত[৪] গুঞ্জরী মালী॥ ধ্রু॥
*উমত সবরো পাগল সবরো[৫] মা কর গুলী গুহারী[৬]।
তোহেরী[৭] ণিঅ ঘরিণী ণামে সহজ সুন্দরী[৮]॥ ধ্রু॥ *
ণাণা তরুবর মৌলিল রে লাগেলী ডালী।
একেলী সবরী এ বণ হিন্ডই কর্ণকুন্ডল বজ্রধারী॥ ধ্রু॥
তিঅ ধাউ খাট পড়িলা সবরো মহাসুহে[৯] সেজি ছাইলী।
সবরো ভুঅঙ্গ[১০] ণইরামণি দারী পেম্ম[১১] রাতি পোহাইলী॥ ধ্রু॥
হিঅ তাঁবোলা মহাসুহে কাপুর খাই।
সুণ[১২] নৈরামণি[১৩] কণ্ঠে লইআ মহাসুহে রাতি পোহাই॥ ধ্রু॥
গুরুবাক্ ধনুআ[১৪] বিন্ধ ণিঅ মনে বাণেঁ।
একে সর[১৫] সন্ধানেঁ বিন্ধহ বিন্ধহ[১৬] পরম ণিবাণেঁ॥ ধ্রু॥
উমত সবরো গরুআ রোসেঁ[১৭]।
গিরিবর সিহর সন্ধি পইসন্তে সবরো লোড়িব কইসে॥ ধ্রু॥

পাঠান্তর :—

১-১. উঁচা উঁচা পাবত তঁহি (ক, ঘ) ২. মোরঙ্গি (ক, ঘ) ৩. পরহিণ (ক, ঘ) ৪. গিবত (ক) ৫. শবরো (ক) ৬. গুহাড়া (ক) ৭. তোহোরি (ক, ঘ) ৮. সুন্দারী (ক) ৯. মহাসুখে (ক)

— দুই তারকা-চিহ্নের মধ্যবর্তী অংশটুকুর চরণ-বিন্যাস হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও সুকুমার সেনের মতে নিম্নরূপ :—

উমত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী গুহাড়া তোহোরি।
ণিঅ ঘরিণী ণামে সহজসুন্দরী॥

১০· ভুজঙ্গ (ক) ১১· পেক্ষ (কু) ১২· সুন (ক, ঘ) ১৩· নিরামণি (ক, ঘ) ১৪· পুণ্ডআ (ক,ঘ) পুচ্ছিআ (গ) ১৫. শর (ক) ১৬· 'বিন্ধহ' শব্দটি শহীদুল্লাহ সাহেব একবার মাত্র নিয়েছেন। ১৭· রোষে (ক, ঘ)

শব্দার্থ, টীকা, ব্যুৎপত্তি :—

উঙ্কা<উচ্চ। পাবত <পব্বত <পর্বত। বসই <বসতি—বাস করে। সবরী—শবর>সবর+ঈ(স্ত্রী প্রত্যয়)। বালী<বালিকা। মোরাঙ্গ < ময়ূরাঙ্গ। পীচ্ছ<পুচ্ছ। পরিহাণ < পরিধান। গীবত—গ্রীবা>গীব+ত (৭মী)। গুঞ্জরী—গুঞ্জা>গুঞ্জ+র (কেরকজাত)+ঈ (স্ত্রী-বিশেষণ)। মালী <মালিকা। উমত <উন্মত। গুলী—গোলমাল। গুহারী—অভিযোগ; অনুনয়; মধ্যযুগে এই অর্থে 'গোহারী' শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। তোহোরী—'তোহোরি' (১০ নং চর্যা) দ্রষ্টব্য। ণিঅ—নিজ। ঘরিণী<গৃহিণী। ণাণা—নানা। মৌলিল<মুকুলিত+ইল্ল—মুকুলিত হইল। গঅণত—গগন<গঅণ+ত (৭মী)। লাগেলী—লাগিল (এখানে ক্রিয়াপদেরও লিঙ্গ পরিবর্তন হয়েছে, আধুনিক বাংলাতে এটি হয় না। ডালী—ডাল+ঈ (স্ত্রী-প্রত্যয়)। একেলী <একেল+ঈ(অপি-জাত)। বণ-বন। হিণ্ডই<হিণ্ডতি—ঘুরিয়া বেড়ায়। কর্ণকুন্ডল বজ্রধারী—টীকা অনুসারে অর্থ:—জ্ঞানাদি-পঞ্চমুদ্রারূপে কুন্ডলাদি পরিধান ক'রে। এবং প্রজ্ঞা ও উপায়রূপ বজ্রকে যুগনদ্ধরূপে ধারণ ক'রে। তিঅ<ত্রিক—তিন। ধাউ< ধাতু; তিন ধাতু অর্থে কায়, বাক, চিত্ত। সেজি<শয্যিকা*—শয্যা। ছাইলী √ছদ+ইল্ল>ছাইল+ঈ (স্ত্রী-প্রত্যয়)। ভুঅঙ্গ<ভূজঙ্গ ণইরামণি<নৈরামণি—তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের পারিভাষিক শব্দ নৈরামণি অর্থাৎ নৈরাত্মযোগিণী বৌদ্ধতান্ত্রিক মতে বিজ্ঞান স্কন্ধের অধিদেবতা। দারী < দারিআ < দারিকা—গণিকা। পেক্ষ

<প্রেম। পোহাইলী—প্রভাত+ইল্ল <পোহাইল+ই (স্ত্রী-) লিঙ্গে)। হিঅ < হৃদয়। তাঁবোলা—তাম্বুল > তাঁবোল+আ (বিশিষ্টার্থে)। কাপুর < কর্পূর। খাই < খাদতি—খায়। গুরুবাক্—গুরুবাক্য। ধনুআ—ধনুক। বিন্ধ—বিদ্ধ কর। বাণেঁ —বাণ+এঁ (< এন, তৃতীয়া)। একে—এক+এ (করণে)। সর সন্ধানে < শর সন্ধানেন। বিন্ধহ— √ বিধ্ হইতে বিন্ধ (রুধাদিগণীয় ধাতুর অনুকরণে 'ন' আগম হয়েছে, সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে এটি অশুদ্ধ)+হ (অনুজ্ঞায়)—বিদ্ধ কর। ণিবাণেঁ<নির্বাণ+এঁ (<এন)। গরুআ < গরুক*—গরু। রোসেঁ—রোষ<রোস+এঁ (<এন)। সিহর <শিখর। লোড়িব —লুণ্ঠন>লোড়+ইব (<তব্য) খোঁজা হবে। কইসে<কীদৃশেন।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর :—

উঁচু উচু পর্বত, সেখানে বাস করে শবরী বালিকা। ময়ূরের পুচ্ছ পরিধান করে শবরী, গলায় গুঞ্জার মালা। (ওগো) উন্মত্ত শবর, পাগল শবর, গোলমাল (কিংবা) অভিযোগ করোনা। সহজ সুন্দরী নামে (ঐ শবরীই) তোমার নিজ গৃহিনী। ওরে, নানা, (পুষ্পে) তরুবর মুকুলিত হ'ল, আকাশে গিয়ে ঠেকল (তার) ডাল। কর্ণকুন্ডলবজ্রধারিণী শবরী একাকিনী এ বনে বিহার করে। পাতা হ'ল তিন ধাতুর খাট, শবর শয্যা বিছাল মহাসুখে। শবর নাগর, নৈরামণি নাগরী প্রেমে রাত্রি কেটে গেল। হৃদয় তাম্বুল, মহাসুখে কর্পূর (সহ) খায়; এবং শূন্য নৈরামণিকে কণ্ঠে নিয়ে মহাসুখে রাত কাটায়। গুরুবাক্যকে ধনু (এবং) নিজের মনকে বাণ ক'রে বিদ্ধ কর—বিদ্ধ কর এক শর সন্ধানে, বিদ্ধ কর পরম নির্বাণে। শবর গুরু-রোষে উন্মত্ত। গিরি-শিখর-সন্ধিতে প্রবেশ করলে শবরকে আমি খুঁজব কেমন করে।

অন্তর্নিহিত ভাব :—

এই দেহ যেন সুমেরু পর্বত, মস্তিষ্ক তার শিখর—সেখানে বাস করে শবরী, শবরের সহজসুন্দরী গৃহিনী, নৈরাত্মাদেবী। নৈরাত্মা ভাববিকল্পরূপ

ময়ূরপুচ্ছ এবং গুহ্যমন্ত্ররূপ গুঞ্জার মালা ধারণ ক'রে আছে। বিষয়ানন্দে মত্ত শবর যেন তাকে চিনতে কোনো প্রকার ভুল না করে। একমাত্র তার সঙ্গেই শবরের মিলন হওয়া উচিত।

দেহ-সুমেরুতে নানা অবিদ্যারূপ তরু বিষয়ানন্দে মুকুলিত হয়েছে, তার পঞ্চস্কন্ধাত্মক শাখা-প্রশাখা আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু এরই মধ্যে জ্ঞান-মুদ্রাদিরূপ কুণ্ডল কানে প'রে নৈরাত্মা-শবরী একাকিনী ঘুরে বেড়ায়।

এই শবরীর আহ্বানে শবর কায়বাক্‌চিত্তরূপ ত্রিধাতুর খাট পেতে তার উপর মহাসুখরূপ শয্যা বিছাল এবং সম্ভোগচক্রে মিলিত হ'ল শবরীর সঙ্গে। সে হৃদয়রূপ তাম্বুল মহাসুখরূপ কর্পূরের সঙ্গে খায় অর্থাৎ চিত্তকে অচিত্ততায় লীন করে শবরী-নৈরাত্মাকে কণ্ঠে ধারণ ক'রে মহাসুখে রজনী-যাপন করে। গুরুবাক্যকে ধনু এবং নিজ মনকে বাণ ক'রে নির্বাণকে বিদ্ধ করা হয়েছে, অর্থাৎ গুরুবাক্য অনুসারে চিত্তের সাধনা দ্বারা নির্বাণ লাভ সম্ভব হয়েছে।

সহজানন্দ-পানে প্রমত্ত শবর মস্তকে অবস্থিত মহাসুখচক্রে এমনভাবে প্রবিষ্ট হয়েছে যে তাকে আর বিষয়ক্লেশদুষ্ট জীবনে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

———

॥ ২৯ ॥

লুইপাদানাম্

রাগ—পটমঞ্জরী

ভাব ন হোই অভাব ণ জাই।
অইস[১] সংবোহে[১] কো পতিআই ॥ ধ্রু ॥
লুই ভণই বঢ়[২] দুলক্‌খ বিণাণা।
তিঅ ধাএ বিলসই উহ[৩] লাগে ণা[৩] ॥ ধ্রু ॥

জাহের বানচিহ্ন রূব ণ জাণী।
সো কইসে আগম বেএ[২] বখাণী ॥ ধ্রু ॥
কাহেরে কিস ভণি[৪] মই দিবি পিরিচ্ছা।
উদক চান্দ জিম সাচন মিচ্ছা ॥ ধ্রু ॥
লুই[৫] ভণই মই[৬] ভাবই[৭] কীস[৮]!
[৯]জা লই অচ্ছম তাহের[৯] উহ ণ দিস[১০] ॥ ধ্রু ॥

পাঠান্তর :—

১. আইস (ক, ঘ) ২. বট (ক, ঘ) ৩-৩ ন জানা (ঘ) ৪. কিষভণি (ক) ৫. লুই (ক) ৬. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত গ্রন্থে শব্দটি নেই ৭. ভাবই (গ) ৮. কীষ্ (ক), কীষ (ঘ) ৯-৯. জালই অচ্ছমতা হের (ক) ১০. দিস্ (ক), দীস (ঘ)

শব্দার্থ, টীকা, ব্যুৎপত্তি :—

ভাব—অস্তিত্ব। অভাব—অনস্তিত্ব, অনুৎপত্তি। অইস<অন্নাদৃশ* —এমন। সংবোহে'<সংবোধেন - উপদেশে. ব্যাখায়। কো< কঃ—কে। পতিআই<প্রত্যেতি- প্রত্যয় করে। বঢ় মূর্খ (সম্বোধনে)। দুলকখ<দুর্লক্ষ্য। বিণাণা - বিজ্ঞান>বিণাণ+আ (বিশিষ্টার্থে)। ধাএ—ধাতুতে ('এ' ৭মীর চিহ্ন)। উহ< উহতে—জানা যায়, লক্ষিত হয়। লাগে - লাগ (নাগাল অর্থে) +এ। জাহের—যাহার; যস্য<জাহ+এর (কেরক-জাত)। বান<বর্ণ। রূব<রূপ। বেএ<বেদেন (করণ)। বখানী—ব্যাখ্যান>বাখাণ+ই (তি-জাত)। কিস<কীদৃশ; অথবা কস্য >কিস। ভণি<ভণিত- বলিয়া। দিবি—দিব; দাতব্য>দিতব্য দিবি। পিরিচ্ছা<পৃচ্ছা—প্রশ্নের সমাধান। উদক- জল (তৎসম শব্দ); উদক চাঁদ—জলের চাঁদ। সাচ<সচ্চ<সত্য। মিচ্ছা<মিথ্যা। ভাইব <ভাব্যম; অথবা, ভাবিতব্য*>ভাইব-ভাবা হইবে। লই<লইঅ >লভিত্বা; অথবা, লভিত*>লই- লইয়া। তাহের—তাহার;

তস্য > তাহ + এর (কেরক-জাত)। দিস -দিশা।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর :–

ভাব হয় না, অভাব যায় না। কে প্রত্যয় করে এমন সংবোধে ? লুই বলেন—(ওরে) মূর্খ ! বিজ্ঞান দুর্লক্ষ্য (যারা) ত্রিধাতুতে বিলাস করে (তারা তার) নাগাল বা উদ্দেশ পায় না। যার বর্ণ চিহ্ন রূপ জানা নেই, সে কেমন ক'রে আগম-বেদের দ্বারা ব্যাখ্যাত হবে ? আমি কাকে কি ব'লে প্রশ্নের সমাধান দেব ? জলের চাঁদ যেমন না সত্য না মিথ্যা (এও তেমনি)। লুই বলেন, আমি (আর) কি ভাবব ! যা নিয়ে আছি তার দিশা অর্থাৎ ঠিকঠিকানা জানিনে।

অন্তর্নিত ভাব :—

ভাব অর্থে জগৎ সংসার—অনিত্য ও শূন্য-স্বভাবহেতু এর সত্যকার অস্তিত্ব কিছু নেই। এর অভাবেও কিছু যায় আসে না। অর্থাৎ জগতের অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব কোনো কিছুতেই কিছু যায় আসে না। এজগৎ সত্যও নয়, মিথ্যাও নয়। কিন্তু এ সব তর্ক দ্বারা সহজানন্দকে জানার বা পাওয়ার চেষ্টা বৃথা। সহজানন্দ ইন্দ্রিয়াতীত, অতএব দুর্লক্ষ্য। ত্রিধাতু অর্থে কায়-বাক-চিত্ত—এই কায়-বাক্-চিত্ত দ্বারা বস্তুর স্বরূপ অথবা ইন্দ্রিয়াতীত সহজানন্দকে যারা ব্যাখ্যা করতে চায়, পদকর্তার মতে তারা মূর্খ। বর্ণ, চিহ্ন, রূপ প্রভৃতি কিছুই যার জানবার উপায় নেই, আগম-বেদ প্রভৃতি শাস্ত্র দ্বারা তার ব্যাখ্যা কি ভাবে হ'তে পারে ? মূর্খের কথাতে কোনো প্রশ্নের তো সমাধান হ'তে পারে না। সমস্ত ব্যাপারটা বস্তুত জলে প্রতিফলিত চাঁদের মতো—তো সত্যও বটে, আবার মিথ্যাও বটে; কেবল অনুভূতির দ্বারা তাকে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। যারা মহাসুখ লাভ করেছেন, যেমন পদকর্তা স্বয়ং তাদের পক্ষে ভাববার কিছু আর নেই। পদকর্তা লুই পা এখন গ্রাহ্যগ্রাহক-ভাববিরহিত যোগী। তিনি এখন ইন্দ্রিয়াতীত সহজানন্দের অধিকারী—এই যে সহজানন্দের এখন তিনি মগ্ন আছেন এর ফলে তিনি যেন দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। অর্থাৎ মহাসুখে তিনি এতোই নিমজ্জিত যে, পার্থিব কোনো ব্যাপারে তাঁর দিক্‌বিদিক জ্ঞান নেই।

———

ভুসুকুপাদানাম্

রাগ—মল্লারী

করুণা[১] মেহ নিরন্তর ফরিআ।
ভাবাভাব দ্বংদ্দল[২] দলিআ[৩] ॥ ধ্রু ॥
উইত্তা[৪] গঅণ মাঝে[৫] অদভুআ।
পেখরে ভুসুকু[৫] সহজ সরুআ। ধ্রু ॥
জাস্ম সুণন্তে[৬] তুটই[৭] ইন্দিআল।
[৮]নিহুএ রে নিঅ মন দে উলাল[৮] ॥ ধ্রু ॥
বিসঅ বিসুদ্ধি[৯] মই বুঝিঅ[১০] আনন্দে।
এ তেলোএ[১১] এতবি সারা[১২]।
[১৩]জো উঅই ভুসুকু ফেটই অন্ধকারা[১৩]

পাঠান্তর :—

১. করুন (ক, ঘ) ২. দ্বন্দল (ক, ঘ) ৩. দলিয়া (ক, ঘ) ৪. উইএ (ঘ) ৫. ভুসুকু (ক) ৬. সুনন্তে (ক), গুনন্তে (ঘ) ৭. তুট্টই (ক, ঘ) ৮-৮. নিহুরে ণিঅ মন ণ দে উলাস (ক) নিহএ নি-অমন দে উলাস (ঘ) ৯. বিশুদ্ধি (ক) ১০. বুঝ্‌ঝিঅ (ক) ১১. তৈলোএ (ক, ঘ), তিলোএ (গ) ১২. বিষারা (ক) ১৩-১৩. জোই ভুসুকু হেব্‌ভই অন্ধকারা (ক),—ফেড়ই অন্ধকারা (ঘ)

শব্দার্থ, টীকা, ব্যুৎপত্তি :—

মেহ<মেঘ। ফরিআ < স্ফুরিত। দুংদুল—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও সুকুমার সেনের গৃহীত পাঠ হচ্ছে দ্বন্দল—(দ্বন্দ্ব+ল)[১], কিন্তু শহীদুল্লাহ সাহেব প্রতিলিপি অনুসারে পাঠ নিয়েছেন

দুংদুলে°—অ´, কুয়াশা। দলিআ—দল + ইআ (> ক্তবাচ্)। উইত্তা—উদিত > উইত্ত> আ (বিশেষণে)। অদভুআ—অদ্ভুত >অদভুঅ+আ (বিশিষ্টার্থে)। পেখরে—প্রেক্ষ> পেখ+রে (সম্বোধনে)। সরুআ—স্বরূপ>অরুঅ+আ (বিশিষ্টার্থে) জাস্<যস্য—যাহার। মুণন্তে—প্রা মুণ (জানা অর্থে) + অন্ত (ঘটমান বিশেষণ) + এ (হি-জাত)। তুটই < ত্রুট্যাতে—টুটে। ইন্দিআল<ইন্দ্রিয়জাল। নিহুএ < নিহুঅ < নিভৃত। দে < দয়তে—দে। উলাস < উল্লোল। বিসঅ < বিষয়। বিসুদ্ধি°—বিশুদ্ধি দ্বারা; বিশুদ্ধ + এ° (< এন)>বিসুদ্ধে° বিসুদ্ধি°। বুঝিঅ—বুধ্য > বুজ্‌ঝ>বুঝ+ইঅ (<ইত)> বুঝিঅ। গঅণহ < গগনস্য। উজোলি < উদ্‌দ্যোতিত+ইল্ল —দীপ্ত হইল। তেলোএ < ত্রৈলোক । এতবি—এতই; এতৎ >এত্তিঅ>এঁত+ বি (অপি-জাত); অথবা, এত্তক* > এত +বি (অপি-জাত)। সারা—সার। উঅই < উদয়তি—উদিত হয়। আন্ধারা—অন্ধকার>আন্ধার + আ (বিশিষ্টার্থে)।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর :

ভাব-অভাবের কুয়াসা দলিত ক'রে করুণা মেঘ নিরন্তর স্ফুরিত হচ্ছে। গগন-মধ্যে উদিত (হয়েছে) অদ্ভুত; রে ভুসুক, সহজ-স্বরূপ দেখ। যাকে জানলে ইন্দ্রিয়জাল টুটে যায়, নিজের মন নিভৃতে উল্লাস দেয়। বিষয়-বিশুদ্ধি হেতু আমি আনন্দকে বুঝলাম—চাঁদে যেমন দীপ্ত হ'ল গগন। এই ত্রিলোক এতই সায়, ভুসুক যখন উদিত হয় (তখন) অন্ধকার নাশ এই ত্রিলোক এতই সার, ভুসুকু যখন উদিত হয় (তখন) অন্ধকার নাশ করে।

অন্তর্নিহিত ভাব :-

ভাবাভাব হচ্ছে গ্রাহ্য-গ্রাহকাদি বিকল্প। এই গ্রাহ্যগ্রাহকাদি বিকল্প কুয়াসার মতো আচ্ছন্ন ক'রে মানব জীবনকে সত্যের জ্যোতি থেকে বঞ্চিত করে। কিন্তু পূর্ণ সিদ্ধিলাভের অবস্থায় পদকর্তা যখন এই ভাব-বিকল্প থেকে মুক্তিলাভ করেন, তখন চিত্ত অচিত্ততায় লীন হয়ে যায় এবং নিরন্তর

করুণাবারির স্নিগ্ধ-স্পর্শে সহজানন্দকে উপলব্ধি করেন। গগন অর্থে শূন্যতা, পদকর্তা ভুসুকু সাধনার পথে এই প্রভাস্বর শূন্যতার অবস্থায় উপনীত হয়ে সহজানন্দ-স্বরূপকে প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি বলেছেন—এই সহজানন্দকে একবার জানলে কখনো আর ইন্দ্রিয়-প্রভাবে পৃথিবীর মায়া-মোহ-জালে জড়িয়ে যেতে হয় না এবং সকল সময়ের জন্য মন আনন্দ-উল্লাসে পূর্ণ থাকে (কারণ, ইন্দ্রিয়-জাত মায়া-মোহ ইত্যাদিই দুঃখের কারণ)। বিষয়সমূহের জ্ঞান ভ্রান্তিমাত্র এই বোধকে বলা হয়েছে বিষয়-বিশুদ্ধি। এই বিষয়-বিশুদ্ধি লাভ হওয়ার ফলে বিমলানন্দের উপলব্ধি সম্ভব হয়। তুলনা দ্বারা ব্যাপারটিকে বুঝবার জন্য গগনে চাঁদের উদয়ের কথা বলা হয়েছে—চন্দ্ররূপী আনন্দের আবির্ভাবে হৃদয়-গগনের মোহরূপ অন্ধকার বিদূরিত হয়। পরিশেষে বলা হয়েছে, ত্রিলোকে আনন্দই একমাত্র সার, এবং এখন ভুসুকু যে আনন্দময় সত্তা লাভ করেছেন তার ফলে তাঁর সংস্পর্শে অন্যের মোহান্ধকারও বিদূরিত হ'তে পারে।

॥৩১॥

আর্যদেবপাদানাম্ (আজদেব)

রাগ—পটমঞ্জরী

জহি[১] মণ ইন্দিঅ পবণ[২] হোই[৩] ণঠা[৪]।
ণ জানমি অপা কহি[৫] গই পইঠা।।ধ্রু।।
অকট করুণা[৬] ডমরুলি বাজই[৭]।
আজদেব ণিরাসে[৮] রাজই[৯]।।ধ্রু।।

১—চর্যাগীতি-পদাবলী, পৃ, ৮৬
—বৌদ্ধগান ও দোহা, পৃ, ৪৭
২—Buddhist Mystic Songs, p. 48

চান্দরে[১০] চান্দকান্তি জিম পড়িহাসই[১১]।
চিঅবি করণেঁ[১২] তহিঁ[১৩] টলি পইসই[১৪]।।ধ্রু।।
ছাড়িল[১৫] ভঅ[১৬] ঘিন লোআচার।
চাহন্তে চাহন্তে সুণ[১৭] বিআর।।ধ্রু।।
আজদেবেঁ সঅল বিহরিউ[১৮]।
ভঅ[১৬] ঘিণ দূর ণিবরিউ।।ধ্রু।।

পাঠান্তর :—

১. জহি (ক) ২. বণ (ঙ), ইন্দিঅবণ (ঘ) ৩. দো (ক) ৪. ণঠা (ক) ৫. কহি (ক) ৬. করুণ (গ) ৭. বাজেঅ (ক, গ, ঘ) ৮. নিরালে (ঘ) ৯. রাজেঅ (গ) ১০. চান্দেরি (ঘ) ১১. পতিভাসঅ (ক), পড়িভাসঅ (গ) (গ) ১২. চিঅ বিকরণে (ক) (ক) ১৩. তহি (ক) ১৪. পইসঅ (গ) ১৫. ছাড়িঅ (ক) ১৬. ভয় (ক, ঘ) ১৭. সুণ (ক) ১৮. বিহরিউ (ক)

শব্দার্থ, টীকা ব্যুৎপত্তি :—

জহি<যস্মিন অথবা, যদি*>জহি, জহিঁ—যেখানে। ইন্দিঅ< ইন্দ্রিয়। ণঠা—নষ্ঠ>নট্‌ঠ>নঠ, ণঠ+আ। জানমি<জানামি। অপা < অপ্‌পা <আত্মা। অকট—বিস্ময়কর; সরহের দোহা-কোষে 'অক্কট' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে—'অক্কট' পন্ডিত ভন্ডিঅ ন্যাসঅ'—এখানে অক্কট অর্থ মূর্খ; আধুনিক কথ্য ভাষায়—আকাট মুখ্‌খু। ডমরুলি—ছোট ডমরু। আজদেব<আর্য্যদেব। ণিরাসে<নৈরাশ্যেন। রাজই < রাজতে—বিরাজ করে। চান্দরে—চন্দ্র>চান্দ+র (কেরক-জাত +এ (অধি-জাত)। চান্দকান্তি <চন্দ্রকান্তি। পড়িহাসই < প্রতিভাসতি—প্রতিভাসিত হয়। চিঅবি—চিত্ত>চিঅ+বি (অপি-জাত)। করণে—ইন্দ্রিয়সমূহে। টলি<টলিঅ<টলিয়া—টলিয়া; অথবা, টলিল>টলি। ছাড়িল <ছর্দ+ইল্ল। ভঅ—ভয়। ঘিণ—ঘৃণা। লোআচার<লোকাচার।

চাহন্তে < চাহ্ + অন্ত (ঘটমান বিশেষণ) + এ (অধি-জাত)—খুঁজিতে। বিআর < বিচার; কিন্তু মণীন্দ্র মোহন বসু মনে করেন—বিকার > বিআর।[১] আজদেবে < আর্য্যদেবেন। বিহলিউ < বিফলিত—বিফল করা হইল। ণিবারিউ < নিবারিত।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর :

যেখানে মন-ইন্দ্রিয় পবন নষ্ট হয়, (যেখানে ভাবতেই হয়) না জানি কোথায় গিয়ে আত্মা প্রবিষ্ট হয়েছে। করুণা-ডমরুটি (কী) আশ্চর্যরূপে বাজে, নিরাশায় বিরাজ করেন আর্যদেব। চন্দ্রে যেমন চন্দ্রকান্তি প্রতিভাসিত হয়, চিত্তও তেমন বিচলিত হয়ে ইন্দ্রিয় সমূহে প্রবেশ করে। ভয়, ঘৃণা, লোকাচার—(সব) ছাড়লাম, চাইতে চাইতে (অর্থাৎ বার বার দেখতে দেখতে) বিচার (করলাম) শূন্যতাকে। আর্যদেব কর্তৃক সকলি বিফলীকৃত হ'ল, ভয় ঘৃণা (আজ) দূরে নিবারিত।

অন্তর্নিহিত ভাব :—

মন-ইন্দ্রিয় পবনাদি সব কিছুই তিরোহিত হয় যখন সাধক নির্বাণ লাভ করেন। কারণ নির্বাণের অবস্থায় চিত্ত লয় প্রাপ্ত হয় ব'লে তখন আর মন-ইন্দ্রিয় প্রভৃতিও ক্রিয়াশীল থাকেনা। এমনি নির্বাণের অবস্থায় আত্মা কোথায় থাকে তা জানা যায় না।

এমনি নির্বাণের অবস্থায় করুণা-ডমরু বাজতে থাকে। চিত্ত লয়প্রাপ্ত হ'লে ব্যক্তির মধ্যে চার অবস্থার উদ্ভব হয়, যথা—মিত্রতা, করুণা, উদাসীনতা এবং উৎফুল্লতা (বা মুদিতা)। এখানে করুণার কথা উল্লেখিত হয়েছে। করুণাই যেন অনাহত ডমরু। সাধকের মধ্যে অনাহত-ধ্বনি তখনি উত্থিত হয় যখন সে পার্থিব মায়ামোহবন্ধন কাটিয়ে কায়া-সাধনার পথে কয়েকটি চক্র অতিক্রম করে। পদকর্তা আর্য্যদেব, ভবজ্ঞান তিরোহিত হওয়াই, নিরালম্বে অর্থাৎ মুক্তচিত্ততায় উপনীত হয়েছেন। এই মুক্তচিত্তের অন্যতম লক্ষণ আবার পূর্বকথিত দাসীনতা। অর্থাৎ পদকর্তা যে-মুক্তচিত্ত হয়ে নির্বাণাবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন সেই কথাই এখানে বলা হচ্ছে।

এই বিশ্বজগতে চাঁদ থেকে যেমন তার জ্যোতি প্রতিভাসিত হয় তেমনি

সাধারণ অবস্থায় চিত্তের স্বভাব এই যে সে ইন্দ্রিয়-পথে ধাবিত হয়, এবং তার ফলে জীব পার্থিব মোহ-বন্ধনে বিজরিত হয়ে ধ্বংস-পথে চালিত হয়। সে জন্য অর্থাৎ ধ্বংস থেকে চিত্তকে রক্ষা করবার জন্য ঘৃণা, ভয়, লোকাচার সব কিছু ত্যাগ করতে হবে। এই ঘৃণা ভয় লোকাচারই তো দেহ-সাধনার পথে সব চেয়ে বড়ো বাধা। সেই জন্য পদকর্তা আর্যদের সব কিছু বিচার ক'রে দেখে শুনে ঘৃণা-ভয় ইত্যাদি দূরে পরিত্যাগ করেছেন।

॥ ৩২ ॥

সরহপাদানাম্

রাগ—দেশাখ

নাদন বিন্দু ন রবি ন শশিমণ্ডল।
চিঅরাঅ[১] সহাবে মুকল[২] ॥ ধ্রু॥
উজুরে উজু ছাড়ি মা লেহু রে[৫] বাংক[৩]।
নিঅড়ি[৪] বোহি মা জাহু রে[৫] লাংক ॥ ধ্রু॥
হাথেরে কাংকন[৬] মা লোউ দাপণ।
[৭]আপণে আপা[৭] বুঝ তু[৮] নিঅমণ ॥ ধ্রু॥
পার উআরে[৯] জোঈ[৯] সাঝঈ[১০]।
দুজ্জণ সাঙ্গে[১১] অবস মরি জাই[১১] ॥ ধ্রু॥
বাম দাহিণ জো খাল বিখালা[১২]।
সরহ ভণই বপা উজুবাট ভাইলা[১৩] ॥ ধ্রু॥

পাঠান্তর :–

১. চিঅরাজ (ঘ) ২. মুকল (ক) ৩. বংক (ক, ঘ) ৪ নিঅহি

১–চর্যাপদ, পৃ. ১৫৫

(ক) ৫. জাহুরে (ঙ) ৬. কাঙকাণ (ক, ঘ) ৭—৭। আপণে অপা (ক) ৮. বুঝতু (ক) ৯. সোই (ক, ঘ) ১০। গজিই (ক, ঘ) ১১—১১, অবসরি জাই (ক, ঘ), অবস মজিই (গ) ১২. বিখলা (ক) ১৩ ভইলা (গ)

শব্দার্থ, টীকা, ব্যুৎপত্তি :—

নাদ, বিন্দু—"নাদবিন্দ্বাদিবিকল্প…"—টীকা; অর্থাৎ নাদ বিন্দু প্রভৃতি এখানে বিকল্প—সর্বপ্রকার দ্বৈতভাব। চিঅরাঅ < চিত্তরাজ। মুকল—মুক্ত > মুকক > মুক + ল > মুকল। উজু < ঋজুক। লাংক - লংকা। হাথেরে—হস্ত > হাথ + এ (৭মী) 'রে' সম্বোধনে। কাংকণ - কংকণ। লোউ < লোকয়; অথবা, লাভ > লো + উ (অনুজ্ঞায়)। দাপণ < দর্পণ। আপা < আত্মা। বুঝ < বুধ্য। উআরেঁ—অপর পায় > উআর + এঁ (< এন) দুজ্জন < দুর্জন। সাঙ্গে—সঙ্গে। খাল-বিখালা < খল্ল-বিখল্ল। বপা—বপ্র > বপপ + আ (সম্বোধনে) > বপা। ভাইলা—ভাত + ইল্ল > ভাঅ + ইল + আ (১ম পুরুষে) > ভাইলা—প্রতিভাত হইল; শহীদুল্লাহ্ সাহেব শব্দটিকে 'ভাবিল' অর্থে গ্রহণ করেছেন।[১]

আধুনিক বাংলার রূপান্তর :—

না নাদ, না বিন্দু, না শশীমণ্ডল—চিত্তরাজ (এ সব থেকে) স্বভাবত মুক্ত। ওরে সোজা (পথ) ছেড়ে বাঁকা (পথ) নিওনা; নিকটে বোধি, ওরে, লংকায় (অর্থাৎ দূরে) যেওনা। ওরে, হাতেই কাঁকন (আছে), দর্পণ দেখোনা (অর্থাৎ হাতে কাঁকন আছে কিনা দেখবার জন্য দর্পণের দিকে তাকায়োনা)। নিজেই তুমি নিজের মন বোঝ। পরপারে যোগী সিদ্ধি পায়, দুর্জন-সঙ্গে (সে) অবশ্যই ম'রে যায়। বামে ডাইনে যা-(তা খাল-ডোবা. সরহ বলেন,—বাবা, পথ (কি তারা) সোজা ভাবলে! অথবা, সরহ বলেন, বাবা, সোজা পথ দেখা গেল। (প্রথম অর্থই অধিক সঙ্গত মনে হয়)।

অন্তর্নিহিত ভাব :—

নাদ-বিন্দু, রবি-শশি প্রভৃতি অর্থে যথাক্রমে ডান ও বাম নাড়ি রসনা-ললনা —এরাই হচ্ছে সর্ববিধ দ্বৈতজ্ঞানের এবং দ্বৈতাভাবের কারণ। দ্বৈতভাব-বিবর্জিত হ'তে পারলে তবেই সহজানন্দ লাভ সম্ভব হয়; সাধনায় সিদ্ধিলাভ ক'রে চিত্তরাজ এই সব দ্বৈতভাব থেকে মুক্ত হ'তে পারে। (মুক্তচিত্ত হওয়ার ব্যাপারটি পূর্ববর্তী চর্যায় বর্ণিত হয়েছে)।

কিন্তু কায়া-সাধনার পথই সহজানন্দে প্রতিষ্ঠিত হ'তে হবে। এই কায়া-সাধনার পথই সহজ পথ। পক্ষান্তরে বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের পথকে জটিল পথ ব'লে অভিহিত করা হয়েছে। হাতে কাঁকন আছে কিনা তা দেখবার জন্য দর্পনের দিকে তাকানোর প্রয়োজন হয় না, ওটা সহজ ব্যাপারকে জটিল ক'রে তোলার নামান্তর। অনুরূপভাবে, বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানের পথে সহজানন্দে উপনীত হ'তে চাওয়া মানেই অকারণে জটিলতার আবর্তে ঘুর-পাক খাওয়া। যে এই জটিলতা পরিহার করে সোজা পথে চলতে পারে, সে সংসার-সমুদ্র থেকে অর্থাৎ সংসারের মোহ-বন্ধন থেকে মুক্তি পায়। কিন্তু তা না পারলে মোহরূপী দুর্জন সাঙ্গ পথভ্রষ্ট হয়ে ধ্বংসমুখে পতিত হয় সে।

বাম-দক্ষিনের পথ পরিহার ক'রে সোজা মধ্যবর্তী পথ ধ'রে অগ্রসর হ'তে হবে। বলাই বাহুল্য, বাম-দক্ষিনের পথ হচ্ছে তান্ত্রিকদেয় ললনা-রসনার পথ, মধ্যেবর্তী সহজ-পথ বলতে মধ্যবর্তী সুষুম্নার কথা বুঝতে হবে।

———

১—Buddhist Mystic Songs, p. 91,

॥ ৩৩ ॥

ঢেংঢণপাদানাম্

রাগ—পটমঞ্জরী

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেসী[১]।
হাড়ীত ভাত নাহি[২] নিতি আবেশী ॥ ধ্রু ॥
বেঙ্গস[৩] সাপ[৪] চঢ়িল[৫] জাই[৬]।
দুহিল দুধু[৭] কি বেন্টে সামাই[৮] ॥ ধ্রু ॥
বলদ বিআএল গবিআ বাঁঝে।
পীঢ়া[৯] দুহিঅই[১০] এ তীনি[১১] সাঝে ॥ ধ্রু ॥
জো সো বুধী[১২] সোহি নিবুধী[১২]।
জো সো[১৩] চোর[১৪] সোহি[১৫] সাধী[১৬] ॥ ধ্রু ॥
নিতি নিতি[১৭] সিআলা[১৮] সিহে[১৯] সম[২০] জুঝই[২১]।
ঢেংঢন পাএর গীত বিরলে[২২] বুঝই[২৩] ॥ ধ্রু ॥

পাঠান্তর :—

১. পড়বেষী (ক, ঘ) ২. নাঁহি (ক, ঘ) ৩. বেঙ্গল (গ), বেগে (ঘ) ৪. ষংসার (ক, ঘ) ৫, বড়্হিল (ক), বাঁহিল (ঘ) ৬. জাঅ (ক, ঘ) ৭. দুধু (ক, ঘ) ৮. ষামায় (ক, ঘ), সমাজ (গ) ৯. পিটা (ক, ঘ) ১০ দুহিএ (ক, ঘ) ১১. তিনা (ক, ঘ) ১২.১২, সো ধনি বুধী (ক), সোই নিবুধী (ঘ) ১৩ বো (ক) ১৪. চোর (ক, ঘ) ১৫. সোই (ক, ঘ) ১৬. দুষাধী (ঘ) ১৭. নিতে নিতে (ক, ঘ) ১৮. ষিআলা (ক, ঘ) ১৯. সিহে (ক), ষিহে (ঘ) ২০. ষম (ক, ঘ) ২১. জুঝঅ (ক, ঘ) ২২. বিরলে (ক) ২৩, বুঝঅ (ক)

শব্দার্থ, টীকা, ব্যুৎপত্তি :—

টালত—টাল (টোলা অর্থাৎ বস্তী, অথবা টিলা অর্থে)+ত

(৭মী)। ঘর<গৃহ। পড়বেসী < প্রতিবেশিক। হাড়ীত —হন্ডী > হাঁড়ী, হাড়ী + ত (৭মী)। ভাত < ভত্ত < ভক্ত। নিতি - নিত্যোন > নিতে > তিনি। আবেশী—পরিবেশন করা হয়-শহীদুল্লাহ[১]; প্রবেশ করিতেছি—মণীন্দ্র মোহন বসু[২]; বেশ্যার প্রণয়ী (আবেশিক > আবেশী)—সুকুমার সেন[৩]। বেঙ্গস—ব্যাঙের দ্বারা। সাপ < সর্প। চঢ়িল—আক্রান্ত হইল; চঢ়+ইল্ল। দুহিল—দোহা, 'ল' এখানে বিশেষণবাচক প্রত্যয়। দুধু—দুগ্ধ। বেন্টে—বেন্ট (অর্থাৎ বাঁট) + এ (৭মী)। সামাই < সময়াতি—প্রবেশ করে। বিআএল—প্রসব করিল; বেদন> বিঅঅ + এল (ইল্ল-জাত) > বিআএল। গবিআ< গবিকা (গো-শব্দের প্রাদেশিক রূপ স্ত্রীলিঙ্গে গবী + ইকা —গবীকা, গবিকা)। বাঁঝে—বন্ধ্যা>বাঁঝা+এ (অধিকরণে) > বাঁঝে-বন্ধ্যাবস্থায়। দুহিঅই<দুহ্যতে—দেহা হয়। সাঝে —সন্ধ্যা>সাঁঝ + এ (অধিকরণে) > সাঁঝে, সাঝে। বুধী < বুদ্ধি। সোহি—সো (< সঃ)+হি; সেই। নিবুধী < নির্বুদ্ধিক। সাধী—সাধু; সুকুমার সেন 'সাধী' শব্দের পরিবর্তে 'দুবাধী' পাঠ নিয়েছেন[৪]; সেখানে—দোঃসাধিক>দযাধী (অর্থ—কোটাল)। সিয়ালা- শৃগাল > সিআল + আ (বিশিষ্টার্থে)। সিহে < সিংহেন। সম—সঙ্গে। জুঝই < যুধ্যতে —যুঝে। বিরলে<বিরল+এ (<এন)—কম লোকে। বুঝই <বুধ্যতে—বুঝে।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর :-

বস্তিতে আমার ঘর, প্রতিবেশী নেই। হাঁড়িতে ভাত নেই, (অথচ) প্রেমিক (ভিড় করে)। ব্যাঙ কর্তৃক সাপ আক্রান্ত হয়। দোয়ানো

১—Buddhist Mystic Songs, p. 94

২—চর্যাপদ, পৃ. ১৬৩

৩—চর্যাগীতিপদাবলী, পৃ. ৯১

৪—ঐ

দুধ কি বাঁটে প্রবেশ করে ? বলদ প্রসব করল, গাই বাঞ্ঝা, পাত্র (ভ'রে তাকে) দোয়ানো হ'ল এ তিন সন্ধ্যা। যে বুদ্ধিমান, সেই নির্বোধ, যে চোর সেই সাধু। নিত্য শৃগাল যুদ্ধ করে সিংহের সঙ্গে। ঢেণ্ঢণপাদের গীত অল্প লোকেই বুঝে।

অন্তর্নিহিত ভাব : –

বস্তি (অথবা টিলা) হচ্ছে মহাসুখচক্র যেখানে সর্ব প্রকার প্রকৃতিদোষ বিলুপ্ত হ'য়ে যায়। কায়বাকচিত্তের ১৬০ প্রকার প্রকৃতি দোষ সমস্তই বিলুপ্ত হ'লে তখন মহাসুখচক্রে প্রবিষ্ট হওয়া যায়। সেখানে পার্থিব কোনো বিষয়ের বন্ধন থাকে না ব'লে তাকে প্রতিবেশী শূন্য স্থান কল্পনা করা হয়েছে। হাঁড়ি এখানে রূপকার্থে দেহ-ভান্ড আর ভাত হচ্ছে সংবৃতি বোধিচিত্ত। সংবৃতি বোধিচিত্তের প্রভাব দেহের মধ্যে আর নেই; কায়া-সাধনায় সিদ্ধি লাভের ফলে এখন সেখানে পারমার্থিক বোধিচিত্তের নিত্য আনাগোনা। এই সংসার যেন সর্পতুল্য, বিষয়-বিষ প্রভাবে জীবনকে আচ্ছন্ন ক'রে, তাকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। বিগত অঙ্গ যায় সেই ব্যাঙ্ও তেমন সংবৃতি-বোধিচিত্তের বিলয়ে সাধকও এক প্রকার অঙ্গহীন হয়ে পড়েন এবং এমনি অবস্থাই হচ্ছে সাধকের কাম্য যখন তিনি সংসার সর্পকে পর্যুদস্ত ক'রে প্রভাস্বর শূন্যতায় বিরাজ করতে পারেন। তখন দোহা দুধ অর্থাৎ বোধিচিত্ত মহাসুখচক্রে (বাঁটে) প্রবেশ করে। বলদ অর্থে সংবৃতি বোধিচিত্ত–এই সংবৃতি বোধিচিত্ত রূপজগতের ধারণা দেয় ব'লে বলা হয়েছে বলদ প্রসব করে। গাভী বন্ধ্যা, কেননা গাভী হচ্ছে নৈরাত্মা-রূপী শূন্যতা, এই শূন্যতার অবস্থায় পার্থিব ব্যাপারের জ্ঞান বিলুপ্ত হয়— অতএব সে বন্ধ্যা। সর্ব প্রকার প্রকৃতি দোষ হচ্ছে বাঁট—ত্রিসন্ধ্যা একে দোহন করা অর্থাৎ নিঃস্বাভাবীকৃত করা হয়; এই ভাবে সকল প্রকৃতিদোষ নিঃশোষিত হয়। জ্ঞানযোগে জগৎব্যাপারের সঙ্গে যে এখানে বেশি জড়িত সেই এখানে নির্বোধ। মনুষের চিত্ত সবিকল্প জ্ঞান দ্বারা বিষয় সুখ আহরণ করে—তাই সে চোর : আবার যখন সে নির্বিকল্পজ্ঞান লাভ করে তখন সে হয় সাধু। মৃত্যু-বেদনা প্রভৃতি ভয়ে ভীত ব'লে এই সংসার-চিত্ত শৃগাল সম (অর্থাৎ সংসার-চিত্তকে এখানে শৃগালের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে); কিন্তু এই চিত্তই যখন মুক্ত ও বিশুদ্ধ হয় তখন সে যুগনদ্ধরূপ সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করে।

বিশেষ টীকা ঃ—

এই পদটির অনরূপ একটি পদের সন্ধান পাওয়া গেছে কবীরের ভণিতায়। মনে হয়, এমনি "অসম্ভব সংঘটনার প্রহেলিকা রূপকের দ্বারা অধ্যাত্ম সাধনার ও অনুভূতির বর্ণনা" মধ্যযুগেও বহুল প্রচলিত ছিল।[১] পদটির কয়েক চরণ হচ্ছে—

মূষ কী নাও বিলাই কাঁড়ারী
শোএ মেডুক নাগ পহারী।
বলদ বিয়াওএ গাভী ভই বাঞ্ঝা
বাছুরি দুহাওএ দিন তিন সাঞ্ঝা।
নিতি নিতি শৃগাল সিংহ সনে জুঝে
কহে কবীর বিরল জনে বুঝে।

[ইঁদুরের নৌকায় বিড়াল হয়েছে কান্ডারী। ব্যাঙ্‌ আছে শুয়ে সাপ দিচ্ছে পাহারা। বলদ প্রসব করে, গাই বন্ধ্যা। দিনে তিন বার বাছুর দোহা হয়। নিত্যই শৃগাল যুদ্ধ করে সিংহের সঙ্গে। কবীর বলেন, অল্প লোকই বোঝে।]

॥ ৩৪ ॥

দারিকপাদানাম্

রাগ—বরাড়ী

সুনকরুণরে[১] অভিন চারে[২] কাঅবাক্ চিঅ[৩]।
বিলসই দারিক গঅণত পারিমকূলে[৪] ॥ ধ্রু ॥

১—সুকুমার সেন—চর্যাগীতিপদাবলী, পৃ. ১৪১–৪২

অলখ[৫] লখচিত্তা মহাসুহে'[৬]।
বিলসই দারিক গঅণত পারিমকূলে'[৪] ॥ ধ্রু ॥
কিংতো[৭] মন্তে কিংতো[৭] তন্তে কিংতো[৭] রে ঝাণবখানে।
অপইঠান মহাসুহলীলে'[৮] দুলখ পরম নিবাণেঁ ॥ ধ্রু ॥
দুংখেঁ সুখেঁ একু করিআ ভুঞ্জহ[৯] ইন্দ্রিজালী[১০]।
স্বপরাপর ন চেবই দারিক সঅল অনুত্তর[১১] মাণী ॥ ধ্রু ॥
রাআ রাআ রাআ রে অবর রাঅ মোহেঁ রে[১২] বাধা।
[১৩] লুইপাঅ-পসাএঁ[১৩]দারিক দ্বাদশ[১৪] ভূঅণে'[১৫] লাধা[১৬] ॥ ধ্রু ।

পাঠান্তর ঃ—

১, সুনকরুণরি (ক, ঘ) ২. চারে' (ক) ৩. কাঅবাক্চিঅ (ক) ৪. পারিমকূলে' (ক) ৫. অলক্ষ (ক) ৬. মহাসুহে (ক) ৭. কিন্তো (ক,ঘ,) ৮. মহাসুহলীণে (ক) ৯. ভুঞ্জই (ক, ঘ) ১০. ইন্দিজানী (ক) ১১. সঅনুত্তর (ক, ঘ) ১২. মোহেরা (ক, ঘ) ১৩–১৩. লুইপাঅ পএ (ক) ১৪. দ্বাদস (ঘ) ১৫. ভূঅণে' (ক) ১৬. লধা (ক, ঘ)

শব্দার্থ টীকা, ব্যুৎপত্তি ঃ—

সুনকরুণরে- সুন (<শূন্য) + করুণ (<করুণা) + র কেরক-জাত) + এ (অধি-জাত)। অভিন<অভিন্ন। চারে'<আচারেণ। কাঅবাক্চিএ– কায়বাকচিত্তে। পারিমকূলে'- পরম কূলে, অথবা অপর কূলে। অলখ<অলক্ষ লক্ষচিত্তা– লক্ষ্যচিত্ত। মহাসুহে'< মহাসুখেন। কিংতো - কিং (<কিম্) + তো (<তব); কি তোর। মন্তে<মন্ত্রণে। তন্তে<তন্ত্রেণ। ঝাণবখানে—ঝাণ (<ধ্যান) + বখানে (<ব্যাখ্যানেন)। অপইঠান<অপ্রতিষ্ঠান। দুলখ<দুর্লক্ষ্য। দুঃখে'<দুঃখেন। সুখে'<সুখেন। ভুঞ্জহ <ভুঞ্জথ*—ভোগ কর। ইন্দিজালী<ইন্দ্রিয়জাল + তুচ্ছার্থে)। স্বপরাপর স্ব + পর + অপর। চেবই<চেতয়তি। মাণী<মানিত

—স্বীকৃত। রাঅা<রাজা। রাঅা<রাজ। মোহেঁ—মোহ+এঁ (<এন); মোহের দ্বারা। বাধা<বদ্ধ। পসাএঁ<প্রসাদেন। লাধা—লব্ধ>লাধা+আ।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর :—

কায়বাকচিত্তে শূন্য ও করুণার অভিন্নাচার দ্বারা (সিদ্ধি লাভ ক'রে) বিলাস করে দারিক গগনে পরম কূলে। অলক্ষ্য (বস্তুতে) লক্ষ্যচিত্ত (হয়ে) দারিক মহাসুখে বিলাস করে গগনে পরম কূলে। কী (হবে) তোর মন্ত্রে, কী (হবে) তোর তন্ত্রে, ওরে, ধ্যান ব্যাখ্যাই বা কী তোর (হবে)? অপ্রতিষ্ঠ মহাসুখ-লীলায় পরম নির্বাণ দুলক্ষ্য। দুঃখে সুখে এক করে ইন্দ্রিয়জাল ভোগ কর। সকলি অনুত্তর মেনে দারিক স্ব, পর, অপর—(এই সকল ভেদাভেদ) অনুভব করে না। রাজা রাজা রাজা রে অন্য রাজা—ওরে (সকলেই) মোহ দ্বারা বদ্ধ। লুইপাদ-প্রসাদে দারিক (কর্তৃক লব্ধ দ্বাদশ ভুবন !

অন্তর্নিহিত ভাব :—

কায়বাকচিত্তের পরিশুদ্ধাবস্থায় শূন্যতা ও করুণার অভিন্নতা দ্বারা অর্থাৎ শূন্যতা ও করুণার মিলনের ফলে পদকর্তা দারিক গগনের পরম কূলে অর্থাৎ সর্বশূন্যতার স্তরে মহাসুখে বিরাজ করেন। বৌদ্ধমতে প্রথম স্তর শূন্যতার, তৎপরে অতিশূন্য ও মহাশূন্য এবং সর্বশেষে সর্বশূন্য বা প্রভাস্বর শূন্যতার স্তর। এই প্রভাস্বর শূন্যতায় উপস্থিত হ'লে চিত্ত অলক্ষ্য লক্ষণযুক্ত হয় অর্থাৎ চিত্ত পুনরুৎপত্তি-লক্ষণ বর্জিত হয়। এই অবস্থায় সাধকের মহাসুখানুভূতি উপস্থিত হয়। তখনই বুঝা যায়, মন্ত্র-তন্ত্র ধ্যান ব্যাখ্যান ইত্যাদিতে লাভ কিছু হয় না। মহাসুখ লাভ হয় তান্ত্রিক যোগসাধনার দ্বারা—এই পথেই লাভ হয় মহাসুখ। এই মহাসুখের মধ্যে প্রবিষ্ট হতে' না পারলে নির্বাণ-লাভও সম্ভব নয়। সুখ-দুঃখ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বিষয়সমূহ এই মহাসুখ-লাভের অবস্থায় একাকার হয়ে যায়। তাই দারিক পা এখন সিদ্ধিলাভ ক'রে সব কিছুর ভেদাভেদ-জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন, এখন তিনি আত্মপরভেদরহিত এবং সব কিছুর উর্ধ্বে। রাজা অর্থে কায়বাকচিত্তের ঐশ্বর্য দ্বারা যিনি সমৃদ্ধ—এমনি

ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিগণ বিষয়মোহে অন্ধ। কিন্তু দারিক তাঁর গুরু লুইপাদের প্রসাদে নির্বাণলাভে সমর্থ হয় দ্বাদশ ভুবনের অর্থাৎ সারা পৃথিবীর মোহজাল অতিক্রম করেছেন।

॥৩৫॥

ভাদেপাদানাম্

রাগ—মল্লারী

এতকাল হউ[১] অচ্ছিলোঁ[২] স্বমোহে[৩]
এবেঁ মই বুঝিল সদ গুরু বোহেঁ ॥ ধ্রু ॥
এবেঁ চিঅরা অ মকু[৪] ণঠা।
গঅণ[৫] সমুদে টলিয়া পইঠা।।ধ্রু।।
পেখমি দহদিহ সব্বহি[৬] সুন[৭]।
চিঅ বিহুন্নে পাপ ন পুন[৮]।।ধ্রু।।
বাজুলে[৯] দিল মো লকখু[১০] ভণিআ।
মই আহারিল[১১] গঅণত পণিআ[১২] ॥ ধ্রু ॥
ভাদে[১৩] ভণই অভাগে লইলা[১৪]।
চিঅরাঅ মই আহার[১৫] কএলা ॥ ধ্রু ॥

পাঠান্তর :—

১. হাঁউ (ক) ২. অচ্ছিলে' (ক), অচ্ছিল (গ), আচ্ছিলেঁসু (ঘ)
৩. মোহে (ঘ) ৪. মোকু (গ) ৫. গণ (ক) ৬. সব্বই (ক, গ)
৭. শুন (ক) ৮. পুন্ন (ক) ৯. বাজুলে (ক) ১০. মোহকখু (ক,ঘ)
১১. অহারিল (ক) ১২. পণিআঁ (ক) ১৩. ভাদে (ক) ভাবে (ঙ)
১৪. লইআ (ক, ঘ) ১৫. আহার (ক)

শব্দার্থ, টীকা, ব্যুৎপত্তি :—

আচ্ছিলোঁ—অচ্ছ+ইল্ল+ও'(অহম-জাত)>আচ্ছিলোঁ—ছিলাম। স্বমোহে'<স্বমোহন। এবেঁ<এতদ্বৎ-এখন। বুঝিল--বুঝিলাম। নকু—নষ্ট>ম+ক (কৃত-জাত, চতুর্থীতে)+উ। সমুদে—সমুদ্র >সমুদ্র+এ(৭মী)। টলিআ<টলিত্বা। পেখমি<পেক্ষামি—আমি দেখি। দহদিহ < দশদিশ। সব্বহি < সর্ব্বহি—সবই। বিহুন্নে—বিহনে; বিহীন>বিহুন+এন>বিহুন্নে। বাজুলে'—বজ্রকুলেন> বজউলেন> বাজুলে'—বজ্রকুল দ্বারা; অথবা, বজ্রকুল>বাজুল+এ' (কর্তৃকারকে 'এ' বিভক্তি)। ভণিআ <ভণিতা। অহারিল—আহার করিলাম। পণিআ<পানীয়—জল। অভাগে<অভাগোন; অথবা, অ (নঞর্থক)+ভাগ্য> অভাগ+এ (কর্মকারকে)। লইলা<লব্ধ+ইল্ল+আ। কএলা কৃত+ইল্ল+আ—করিল।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর :—

এতকাল আমি স্ব-মোহে ছিলাম; এখন আমি সদ্‌গুরু বোধে (সব কিছু) বুঝলাম। এখন আমার জন্য চিত্তরাজ নষ্ট, (সে) ট'লে প্রবিষ্ট হয়েছে গগন-সমুদ্রে। দেখি, দশদিক সবই শূন্য, চিত্ত বিহনে পাপ পুণ্য কিছু নেই। বজ্রকুল আমাকে লক্ষণ ব'লে দিল, আমি গগনে আহার করলাম পানি। ভাদে বলেছেন, (আমি) কোনো ভাগ নিলামনা (অথবা, আমি অভাগ্য-গৃহীত অর্থাৎ অভাগ্য দ্বারা জড়িত হলাম); আমি চিত্তরাজকে আহার করলাম।

অন্তর্নিহিত ভাব :—

গুরুর উপদেশ-লাভ ব্যতীত পার্থিব মোহজাল ছিন্ন হবার কোনো-উপায় নেই। পদকর্তা ভাদে পাদ যতোকাল গুরু-উপদেশে লাভ করেন নি ততকাল মোহগ্রস্ত ছিলেন। পরে গুরু-উপদেশ সমস্ত কিছু অবগত হন, তখন অচিত্ততায় লীন হয়ে তিনি প্রভাস্বর-শূন্যতায় প্রবেশ করেন। জগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় জ্ঞান তখন লুপ্ত হয়, পাপ-পুণ্যাদি সংস্কারের ধারণাও। কেননা চিত্ত

না থাকায় পাপ-পুণ্যের বোধও থাকতে পারে না। বজ্রগুরু অর্থাৎ সহজিয়া গুরুর নির্দেশেই পদকর্তা অতীন্দ্রিয় সহজানন্দ-লাভে সন্ধান প্রাপ্ত হয়েছেন। এখন তিনি গগন-সমুদ্রে অর্থাৎ সর্বশূন্যতার স্তরে উপনীত হয়ে সংবৃত্তি বোধিচিত্তকে আহার করেছেন। পার্থিব বিষয়াদির কোনো ব্যাপারেই আর আর তিনি ভাগ নিচ্ছেন না, সবকিছুর উর্ধ্বে উত্থিত হয়ে সংবৃতি বোধিচিত্তকে নাশ ক'রে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেছেন তিনি।

॥ ৩৬ ॥

কৃষ্ণাচার্য্যপাদানাম্ (কাহ্নপাদানাম্)

রাগ—পটমঞ্জরী

সুণ[১] বাহ[২] তথতা পহারী।
মোহভণ্ডার লই[৩] সঅল আহারী[৪] ॥ ধ্রু ॥
ঘুমই ণ চেবই সপরবিভাগা।
সহজ নিংদালু[৫] কাহ্নিলা লাঙ্গা ॥ ধ্রু ॥
চেঅণ ণ বেঅন ভর নিদ গেলা।
সঅল মুকল[৬] করি সুহে সুতেলা ॥ ধ্রু ॥
স্বপণে মই দেখিল তিহুবণ সুণ[১]।
ঘোরিঅ[৭] অবণাগবণ[৮] বিহুণ[৯] ॥ ধ্রু ॥
শাখি করিব জালন্ধরি পাএ।
পাখি ণ চাহই[১০] মোরে[১১] পাণ্ডিআচাএ[১২] ॥ ধ্রু ॥

পাঠান্তর :—

১. সুণ (ক) সুন (ঘ) ২. বাহ [র] (ঘ) ৩. লুই (ক) ৪. অহারী

(ক) ৫. নিদাল্ (ক, ঘ) ৬. সুফল (ক, ঘ) ৭. ঘোলিয়া (গ)
৮. অবণাগমণ (ক) ৯. বিহল (ক) ১০. রাহঅ (ক, ঘ)
১১. মোরি (ক) ১২. পাণ্ডিআচাদে (ক)

শব্দার্থ, টীকা, ব্যুৎপত্তি :—

বাহ—বাহু; সংস্কৃত টীকা অনুসারে 'সুণ বাহ' অর্থে শূন্য বাসনাগার (বাহ <বাস) ! সুকুমার সেন বাহ শব্দের পাঠ নিয়েছেন বাহ [র]—অর্থ বাসর[১]। পহারী <প্রহারিত। ভণ্ডার <ভাণ্ডার। আহারী <আহারিতম্। ঘুমই—ঘুমায়; ঘুম + ই (<তি)। সপরবিভাগা—স (<স্ব) + পর + বিভাগ + আ (বিশেষণে)। নিংদাল্ <নিদ্রালু। কাহ্নিলা—কৃষ্ণ > কাহ্ন + ইল + অ (<ক, আদর বা অবজ্ঞাসূচক)। লাঙ্গা—উলঙ্গ > লাঙ্গ + আ (বিশিষ্টার্থে)। চেঅন < চেতন। বেঅন < বেদন। মুকল—মুকল (৩২ নং চর্যা) দ্রষ্টব্য। সুহে < সুখেন। সুতেলা <সুপ্ত + ইল্ল + আ (১ম পুরুষে)। তিহুবণ <ত্রিভুবন। ঘোরিঅ—ঘূর্ণ্যমান; ঘূর্ণিত >ঘোরিঅ। অবণাগবণ <আগমনগমন। বিহুণ <বিহীন। শাখি <সাক্ষী। পাএ—পাদ > পা + এ (কর্মকারকে)। পাখি —পক্ষে; পক্ষ > পাখ + ই। পাণ্ডিআচাএ—পণ্ডিতাচার্যে; পণ্ডিতাচার্য >পাণ্ডিঅ.চাঅ + এ।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর :—

শূন্য বাহুতে তথতা (দ্বারা) প্রহার ক'রে সকল মোহ-ভাণ্ডার নিয়ে আহার করা হ'ল। না সে ঘুমায়, না স্ব-পর-বিভাগ টের পায়; উলঙ্গ কানু সহজ-নিদ্রাবশ। না (আছে) চেতনা, না (আছে) বেদনা—ভরপুর নিদ্রা গেল (সে); সব কিছু মুক্ত ক'রে সুখে সুপ্ত হ'ল। স্বপ্নে আমি দেখলাম, ত্রিভুবন শূন্য (এবং) ঘুরে ঘুরে আনাগোনা-বিহীন। সাক্ষী করব জালন্ধরি পা-কে, আমাকে পণ্ডিতাচার্য পাশে চায়না (অথবা, পাশে থাকলেও পণ্ডিতাচার্য আমার পানে চায়না)।

অন্তর্নিহিত ভাব ঃ—

শূন্যতার বাহুতে তথতারূপে খড়্গ ধারণ ক'রে মোহ-ভাণ্ডার বিনষ্ট করা হয়েছে। শূন্য, অতিশূন্য ও মহাশূন্য—চিত্তের এই তিন স্তরে নানাবিধ প্রকৃতিদোষ যুক্ত থাকে। চতুর্থ শূন্য হচ্ছে সর্বশূন্যতার স্তর—এই স্তরে কোনো প্রকৃতিদোষ থাকে না; এই প্রকৃতিদোষকেই বলা হচ্ছে মোহ-ভাণ্ডার। সর্বশূন্যতার স্তরে তথতা বা নির্বাণ হয়, এবং সাধক মোহমুক্ত অবস্থায় পৌঁছাতে সক্ষম হন। এমনি অবস্থায় পদকর্তা কানুপার আত্মপর-ভেদাভেদজ্ঞান লোপ পেয়ে গেছে। এখন তিনি সর্বদোষমুক্ত, তাই উলঙ্গ। এবং চিত্তচেতনাবিকল্পাদি লোপ পাওয়ার অবস্থাকে বলা হয়েছে নিদ্রাগত অবস্থা। নিদ্রিতাবস্থায় মানুষের যেমন ভবজ্ঞান লোপ পায় ও বেদনাবোধ থাকে না তেমনি পদকর্তা এখন যোগনিদ্রায় মগ্ন থেকে সব কিছু ভবজ্ঞান ও বেদনা থেকে মুক্তি লাভ করেছেন। এখন ত্রিভুবন তাঁর কাছে শূন্য মনে হচ্ছে। আর এই শূন্যতার অবস্থায় তিনি পৌঁছেছেন ব'লেই তো জন্মমৃত্যুর ঘূর্ণিপাক থেকে মুক্ত হ'তে পেরেছেন। এই জাতীয় সাধকদের ব্যাপার সাধারণ ধর্মীয় পণ্ডিতাচার্যগণ উপলব্ধি করতে পারে না ব'লে তাঁদের ধারে-কাছেও ঘেঁষতে চান না।

॥ ৩৭ ॥

তাড়কপাদানাম্

রাগ—কামোদ

আপণে[১] নাহি মো[২] কাহেরি সঙ্কা[৩]।
তা মহামুদেরী টুটী[৪] গেলী কংখা[৫] ॥ ধ্রু ॥

১—চর্যাগীতি-পদাবলী, পৃঃ ৯৫

অনুভব সহজ, মা ভোল রে জোই।
চউকোড়ি[৬] বিমুকা জইসো তইসো হোহি[৭] ॥ ধ্রু॥
জইসনে ইচ্ছিলেস[৮] তইসন[৯] আচ[১০]।
সহজ পথক[১১] জোই ভান্তি মা[১২] বাস॥ ধ্রু॥
বান্ড কুরুন্ড[১৩] সন্তারে জাণী।
বাক্পথাতীত কাহি[১৪] বখাণী॥ ধ্রু॥
ভণই তাড়ক এথু নাহি অবকাস[১৫]॥
জো বুঝই[১৬] তা গলে গলপাস॥

পাঠান্তর :—

১. অপণে (ক) ২. সো (ক, ঘ) ৩. শংকা (ক) ৪. টুটি (ক, ঘ) ৫. কংখা (ক) ৬. চৌকোটি (ক) ৭. হোই (ক) ৮. অছিলেস (ক), ইচ্ছিলেস (গ) ৯. তইছন (ক) ১০. অচ্ছ (ক) ১১. পিথক (ক) ১২. মাহো (ক), নাহি (গ) ১৩. কুরু (ক) ১৪. কাহি (ক) ১৫. অবকাশ (ক) ১৬. বুঝই (ক)

শব্দার্থ, টীকা, ব্যুৎপত্তি :—

তা < তৎ — তাই। মহামুদেরী – মহামুদ্রা > মহামুদা + এর (কেরকজাত) + ঈ (স্ত্রীলিঙ্গে); এক প্রকার তান্ত্রিক প্রক্রিয়া, (পারিভাষিক শব্দ)। টুটী < ত্রোটিত। অনুভব—অনুভব কর (তৎসম)। ভোল—ভুলিও (অনুজ্ঞা)। চউকোড়ি < চতুষ্কোটি। বিমুকা – বিমুক্ত > বিমুক + আ। জইসনে—যাদৃশেন > জইসন + এ – যেরূপে। ইচ্ছিলেস – ইচ্ছা + ইল (< ইল্ল) + স (লঙ এর মধ্যম পুরুষে)। তইসন < তাদৃশেন। আছ < আচ্ছ + অ (< ত, মধ্যম পুরুষে)। পথক—পথ + ক (ষষ্ঠীর চিহ্ন)। বাস < বাসয় – অনুভব কর। বান্ড—পুরুষাঙ্গ। কুরুন্ড – অন্ডকোষ (বান্ড কুরুন্ড অর্থে এক প্রকার ক্ষুদ্র পাত্রও হ'তে পারে। উড়িয়া ভাষায়

ব'টুয়া শব্দটি 'ক্ষুদ্র থলে' অর্থে ব্যবহৃত হয়। মণীন্দ্রমোহন বসু মনে করেন—বান্ড এমনি ব'টুয়া জাতীয় থলে, বান্ড<বন্ড<বন্ট; আর কুরন্ড, তাঁর মতে করন্ড-জাতীয় পাত্র বিশেষ।১] সন্তারে—সন্তার (<সম্-√তৃ)-এ (অধিকরণে)। বাক্‌পথাতীত—বাক-(<বাক্য)+পথ+অতীত। কাহি'—কি করিয়া; 'কাহি' (১নং চর্যা দ্রষ্টব্য)। অবকাস—অবকাশ। তা<তস্য (ষষ্ঠী)। গলে' গলায় (অধিকরণে। গলপাস-গলপাশ।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর :—

আমি নিজেই নেই, আমার কাকে শংকা ? তাই আমার মহামুদ্রার আকাংখা টুটে গেল। সহজকে অনুভব কর, ওরে যোগী, ভুলোনা; (কোনো কিছু) যেমন চতুষ্কোটি বিমুক্ত হয় তেমনি হ'তে হয় (তোমাকেও। যেমন ইচ্ছা করলে তেমনি থাক, সহজ পথের (বিষয়ে), হে যোগী ভুল কোরোনা। বান্ড কুরুংক সাঁতারের সময় জানা যায়। বাকপথের অতীত (যা তাকে) ব্যাখ্যা করা যাবে কিভাবে ? তাড়ক বলেন, এখানে অবকাশ নেই, যে বোঝে তার গলায় দড়ি।

অন্তর্নিহিত ভাব :—

পার্থিব বিষয়ের অনিত্যতা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ হ'লে তখন বুঝা যায়, অন্যান্য বিষয়ের মতো নিজেরও কোনো সত্যকার অস্তিত্ব নেই। তখন মৃত্যু-জরা-যন্ত্রণা উদ্ভূত সর্বপ্রকার ভয় থেকেও মুক্তি মেলে। পদকর্তাও এইভাবে জন্ম-মৃত্যু ক্লেশাদির ভয় থেকে মুক্ত হয়েছেন। জন্ম-মৃত্যুর ধারণা বিকল্প মাত্র—একথা সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন ব'লেই পদকর্তার, এমন কি, নির্বাণ-সিদ্ধির বাসনাও লোপ পেয়েছে। বস্তুতঃ ভব-সম্পর্কীয় যথার্থ জ্ঞানই তো নির্বাণ, সেই জ্ঞান-লাভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত নির্বাণও লাভ হয়েছে তাঁর। অতএব পৃথকভাবে নির্বাণের সাধনা তাঁর পক্ষে অপ্রয়োজনীয়। চতুষ্কোটি হচ্ছে চার বিকল্প—সৎ, অসৎ সদসৎ এবং ন-সৎ-ন-অসৎ। জগৎ-সংসরে সব কিছু এই চার বিকল্প থেকে মুক্ত - এই অনুভূতিই সহজ অনুভূতি। এই সহজ অনুভূতিকে নিয়ে' পদকর্তা বলেন, যেমন ছিল

তেমনি থাক। সহজকে পরিত্যাগ কোরোনা। জাঁকজমকপূর্ণ আচার অনুষ্ঠানের পথ সহজিয়াদের নয়। বান্ড-কুরণ্ডের মতো অঙ্গকেও যারা সাঁতার দেবার সময় ভার বিবেচনা করে তাদের পক্ষে যেমন নদী পার হওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় তেমনি বাহ্যভয়ে যারা ভীত হয় তাদের পক্ষেও ভবপারাবার উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব নয়।

সিদ্ধিলাভের পর যোগীর যে সহজানন্দ লাভ হয়, তার সম্পর্কে বলতে গিয়ে পদকর্তা বলেছেন, অনির্বচনীয় এই তত্ত্ব বাক্ পথাতীত বাক্যের দ্বারা এর ব্যাখ্যা সম্ভব নয়।

।।৩৮।।

সরহপাদানাম্

রাগ—ভৈরবী

কাঅ ণাবড়ি খাণ্টি[১] মণ কেড়ু আল।
সদগরুবঅণে ধর পতবাল।।ধ্রু।।
চীঅ থির করি ধরহু[২] রে নাই[৩]
আন[৪] উপাএ[৫] পার ণ জাই। ধ্রু।।
নোবাহী[৬] নৌকা টাণই[৭] গুণে।
মেলি মিল[৮] সহজে জাই[৯] ণ আণে।।ধ্রু।।
বাটত ভঅ খাণ্ট বি বলআ।
ভব-উলোলে সবব[১০] বি বোড়িয়া[১১]।।ধ্রু।।
কুল[১২] লই খরে সোন্তে[১৩] উজাই[১৪]।
সরহ ভণই গঅণে[১৫] সমাই[১৬]।।ধ্রু।।

১—চর্যাপদ, পৃঃ ১৮৪

পাঠান্তর :—

১. খান্ডি (ঘ) ২. ধহ্ (ক) ৩. নাহী (ক, ঘ) ৪. অন (ক, ঘ) ৫. উপায়ে (ক, ঘ) ৬. নৌবাহী (ক, ঘ) ৭. টাগুঅ (ক, ঘ) ৮. মেল (ক, ঘ) মেলি (গ) ৯. জাউ (ক), জা [ই]উ (ঘ) ১০. ষঅ (ক) সব (ঘ) ১১. বোলিঅ (ক, ঘ) ১২. কুল (ক) ১৩. সোন্তে (ক) ১৪. উজঅ (ক, ঘ) ১৫. গণে (ক) গ[অ]ণে (ঘ) ১৬. পমাএ (ক)

শব্দার্থ, টীকা, ব্যুৎপত্তি :—

ণাবড়ি<নাবটিকা*; ক্ষুদ্র নৌকা। খান্ট—খাঁটি" সুকুমার সেন খান্ডি পাঠ নিয়েছেন তাঁর মতে—খন্ডিকা>খন্ডি[১]। বঅণে —বচন>বঅণ+এ(<এন)। পতবাল<পত্রবাল—নৌকার হাল। চীঅ<চিত্ত। ধরহু—ধর ;ধর+হু (অনুজ্ঞা)। আন<অন্য। উপাএ <উপায়েন। জাই<যায়তে—যাওয়া যায়। নৌবাহী<নৌবাহিক —মাঝি, নেয়ে। টানই—টানে; টান+ই (<তি)। গুণে<গুণেন গুণ দ্বারা। মিল—মিলিত হও; মিল্+অ (<ত)। সহজে <সহজেন। আণে—অন্য > আন, আণ+এ (<এন)। খান্ট--ডাকাত, দস্যু সম্ভবত খড়্গ>খন্ড>খন্ট খান্ট—অর্থ খড়্গধারী দস্যু এই অর্থে মধ্যযুগের বাংলায় খাঁটি ও খন্ড শব্দ দুটি পাওয়া যাচ্ছে। বলআ - বলবান। উলোলে<উল্লোলেন — তরঙ্গের দ্বারা। সব্ববি—সব্ব (<সর্ব)+বি (অপি-জাত)। বোড়িআ— বুড্ (নিমজ্জন অর্থে) > বোড়+ত স্থানে ইঅ। খরে—খর+এ (করণে)। সোন্তে—স্রোতে; স্রবস্ত্>সোন্ত্+ এ (<এন)>সোন্তে। উজাই<উদ্যাতি—উজানে যায়। গঅণে <গগন+এ (অধিকরণে)। সমাই<সমায়াতি—প্রবেশ করে।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর :

কায়া একটি ছোট্ট নৌকা. খাঁটি মন (হচ্ছে) বৈঠা; সদ্গুরু বচনে হাল ধর! ওরে, চিত্ত স্থির ক'রে তুমি নৌকা ধর; অন্য কোনো উপায়ে পারে যাওয়া

যায় না। নেয়ে নৌকা টানে গুণ দ্বারা; (সব কিছু) ছেড়ে দিয়ে মিলিত হও সহজে, অন্য উপায়ে যাওয়া যায় না। পথে ভয়, ডাকাতও বলবান; ভব তরঙ্গে সবাই ডুবল। (নৌকা) কুল ধরে খরস্রোতে উজান বেয়ে চলে; সরহ বলেন— (সেই নৌকা) গগনে প্রবেশ করে।

অন্তর্নিহিত ভাব ঃ –

দেহই ব্রহ্মান্ড—এ কথা সহজিয়াদের। তাদের মতে, সত্য বাইরে নেই; দেহেই তা বিরাজমান। অতএব তাদের সাধনাও এই দেহ-অভ্যন্তরে। এ সাধনার নাম কায়া-সাধনা। সংসার-সমুদ্র দেহকে নৌকা ক'রে সাধনপথে এগিয়ে যেতে হবে, তা'হলেই মিলবে মুক্তি। এই দেহ নৌকার বৈঠা হচ্ছে মন, আর হাল হচ্ছে সদ্‌গুরুবচন। চিত্ত স্থির ক'রে নৌকা বাইতে পারলে অর্থাৎ একমনে কায়া-সাধনা করতে পারলেই ভবসাগরে মুক্তিলাভ সম্ভব হবে।

নৌকা উজান স্রোতে বাইতে গেলে গুণ দ্বারা টানতে হয়। দেহ সাধনার ব্যাপারটিও উল্টা সাধনা। মূলাধার চক্র থেকে উজান বেয়ে সাধককে সহস্রারে বা মহাসুখচক্রে গমন করতে হয়। সেই জন্যই 'গুণ' শব্দ দ্বারা উজান যাত্রার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

সাধনার পথে বিভ্রান্তির সম্ভাবনা অমূলক নয়, তাই ডাকাতের কথা বলা হয়েছে। গ্রাহ্য-গ্রাহক ভাবই এখানে ডাকাত। কেননা এই গ্রাহ্যগ্রাহকভাব দ্বারা সাধক যদি আক্রান্ত হন তা'লে বিষয়তরঙ্গে হাবুডুবু খেয়ে মরতে হয় তাঁকে, মুক্তি-সম্ভাবনা তিরোহিত হয়।

রসনা-ললনার মধ্যবর্তী অবধূতি মার্গের কুল ধ'রে উজান যাত্রায় অর্থাৎ উল্টা সাধনার পথে উধ্বর্দিকে অগ্রসর হ'তে পারলে তবেই সহজ শূন্যতায় লীন হওয়া সম্ভব হয়।

১—চর্যাগীতি-পদাবলী, পৃঃ ৯৬ ও ১৬২

॥ ৩৯ ॥

সরহপাদানাম্

রাগ—মালশী

সুইণেঁ[1] হ অবিদার অরে[2] নিঅ মনে তোহোরেঁ দোসেঁ।
গুরুবঅণবিহারেঁ রে থাকিব তই ঘুণ্ড কইসে ॥ ধ্রু ॥
অকট হুঁ-ভবহিঁ[3] গঅণা[4]।
বঙ্গে জায়া নিলেসি পারেঁ[5] ভাগেল তোহোর[6] বিণাণা ॥ ধ্রু ॥
অদভুঅ[7] ভবমোহা রে[8] দীসই[9] পর অপণা[10]।
এ জগ জলবিম্বাকারেঁ[11] সহজেঁ সুণ[12] অপণা ॥ ধ্রু ॥
অমিঅ[13] আছন্তেঁ[14] বিস গিলেসি রে চিঅ পর[15] বাস[16] অপা।
ঘরেঁ[17] পরেঁ[18] কা বুঝিল[19] মইরে[20] খাইব মই দুঠ কুড়ুংবা[21] ॥ ধ্রু ॥
সরহ ভণন্তি বর সুণ[22] গোহালী কি মো দুঠ[23] বলন্দে[24]।
একেলে[25] জগ নাসিঅ[26] রে বিহরহুঁ[27] স্বচ্ছন্দেঁ[28] ॥ ধ্রু ॥

পাঠান্তর :—

১. সুইণা (ক) ২. অবিদারঅরে (ক), হো বিদারঅ (গ) ৩. ভবই (ক), ভব (ঘ) ৪ অণা (ক) ৫. পরে (ক, ঘ) ৬. তোহার (ক, ঘ) ৭. অদঅভুঅ (ক) ৮. ভব মোহারো (ক) ৯. দিসই (ক) ১০. অপ্যাণা (ক), অপ্পাণা (ঘ) ১১. জল বিম্বকারে (ক) ১২. সুণ (ক) ১৩. অমিয়া (ক) ১৪. আচ্ছন্তেঁ (ক) ১৫. পসর (ক) ১৬. বস (ক, ঘ) ১৭. ঘারেঁ (ক) ১৮. পারেঁ (ক) ১৯. বুঝ্‌ঝিলে (ক, ঘ) ২০. মরে (ক), মারি (গ), ম রে (ঘ) ২১. কুণ্ডবা (ক) ২২. সুণ (ক) ২৩, দুঠ্য (ক) ২৪. বলন্দেঁ (ক, ঘ) ২৫. একেলেঁ (ঘ) ২৬ নাশিঅ (ক) ২৭. বিরহুঁ ঈ (ক) ২৮. চ্ছন্দ্রেঁ (ক), ছন্দেঁ (গ)

শব্দার্থ, টীকা, ব্যুৎপত্তি :—

সুইণে—স্বপ্ন > সুপিন, সুবিন > সুইণ + এঁ (<এন। অবিদারঅ

<অবিদ্যারত। তোহোরে'—তোহোর (১০নং চর্যা দ্রষ্টব্য)+এ (<এন)। দোসে<দোষেণ। গুরুরঅণ<গুরুবচন। বিহারে' +বিহার+এ' (অধিকরণে)। থাকিব<স্থাতব্য*—থাকা হইবে। তই<ত্বয়া—তোমার দ্বারা। ঘন্ড—'গুন্ডা' শব্দের প্রাচীন রূপ; কিন্তু সুকুমার সেন এটিতে পর্যটন অর্থে গ্রহণ করেছেন[১] এক্ষেত্রে শব্দটি 'ঘুণ' থেকে নিষ্পন্ন হইয়াছে মনে করা যেতে পারে। হুং—হুংকার-মন্ত্র। ভবহি—ভব (হওয়া অর্থে)+হি (অপাদানে)। নিলেসি—লইলে, নিলে; লট্-এর মধ্যম পুরুষের অণুকরণে 'সি' যুক্ত হয়েছে। পারে—পার+এ (অধিকরণে)। ভাগেল<ভাগ+ইল্ল। অদভুঅ—অদ্ভুত। ভবমোহা—ভবমোহ। জল বিম্বাকারে < জল বিম্বাকরণে। আছন্তে'—অচ্ছ > আছ+অন্ত (ঘটমান বিশেষণ)+এ'। বিস—বিষ। গিলেসি—গিলিয়াছ; লট্-এর মধ্যম পুরুষের অনুকরণে 'সি' যুক্ত হয়েছে। বাস<বাসয়—অনুভব কর। পরে—পর+এ (অধিকরণে)। খাইব<খাদিতব্য—খাওয়া যাইবে। দুট্ঠ<দুট্ঠ<দুষ্ট। কুড়ংবা<কুড়ুম্ব<কুটুম্ব। বর<বরম্—বরঞ্চ। বলন্দে<বলদেন<বলীবর্দেন। একেলে—একেলা। নাসিঅ—নাশিত। বিহরহু'—বিহার করি, এখানে হু' অহম্‌জাত। স্বচ্ছন্দে' <স্বচ্ছন্দেন।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর :—

ওরে স্বীয় মন আমার! স্বপ্নে (তুই) নিজের দোষে অবিদ্যারত; ওরে, গুরু-বচন-বিহারে কি করে তুই থাকবি গুন্ডা (হয়ে)! আশ্চর্য! হুংকার থেকে উদ্ভূত এই গগন; বঙ্গে জায়া নিয়ে গেছে, তোমার বিজ্ঞান ওপারে ভাগল। ওরে, অদ্ভুত এই ভবের মোহ, পারও আপন দেখায়। এ জগৎ জল-বুদ্বুদের মতো, সহজে (থাকলে) আত্ম (হয়) শূন্য। অমৃত থাকতে বিষ পান করিস, ওরে মন। আপনাকে পর ভাব; ওরে, ঘরে-বাইরে কাকে আমি বুঝলাম। দুষ্ট স্বজনকে আমি খাব। সরহ বলেন, বরং (ভালো) শূন্য গোয়াল, কী হবে আমার দুষ্ট বলদে ? ওরে, একা জগৎ নাশ ক'রে (আমি) স্বচ্ছন্দে বিহার করি।

অন্তর্নিহিত ভাবঃ—

নিজের মনকেই লক্ষ ক'রে পদকর্তা বলছেন—ওরে মন, মায়ামোহ স্বপ্নে বিভোর হয়ে নিজের দোষেই অবিদ্যারত অবস্থায় রসেছিস। (অথবা, ওরে মন! স্বপ্ন সদৃশ্য এই জগৎকে নিজের দোষে সত্য বলে মনে করছিস!)। পূর্ববর্তী চর্যায় 'খান্ট' যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, এখানে 'ঘুন্ড' বা গুন্ডা কথাটিকেও সেই অর্থে গ্রহণ করলে অর্থ বেশ সুস্পষ্ট হয়। গুরুবচনরূপে বিহারে মন কি আর গুন্ডা হয়ে থাকতে পারে অর্থাৎ গুরুবচন শিরোধার্য করলে চিত্তের প্রকৃতি দোষ আর থাকতে পারে না। প্রকৃতি দোষমুক্ত চিত্ত হচ্ছে হুংকার-বীজোদ্ভব—সে প্রভাস্বর-গগনে বা চতুর্থ শূন্যতায় প্রবিষ্ট হয়ে অবিদ্যামুক্ত হয়েছে।

বঙ্গ অর্থে অদ্বয়তত্ত্ব বা অদ্বৈতজ্ঞান—এই অদ্বয়তত্ত্বকে জায়া ক'রে নেওয়া, অর্থাৎ চিত্তের অদ্বৈতত্ত্ব-লাভ একেবারে সম্পূর্ণ হয়েছে। তার ফলে অবিদ্যাজাত বিষয়বিজ্ঞান ধ্বংস হয়ে গেছে।

হায়, এই পার্থিব মায়া বিলাসটি বড়োই অদ্ভুত। এই মায়াবশেই এখানে আত্মপর-ভেদাভেদজ্ঞানের সৃষ্টি হয়েছে। বস্তুত এ জগৎ জলবুদ্বুদের মতো মিথ্যা মায়া মাত্র। কিন্তু সহজ শূন্যতায় চিত্ত লয় প্রাপ্ত হ'লে সকলই সত্যস্বরূপে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়, এবং সেই সহজ শূন্যতাকেই মনে হয় সত্যকার আপন।

অবিদ্যাপরবশ চিত্তকে লক্ষ ক'রে পদকর্তা বলছেন,--কেন ওরে মন, তুই সহজানন্দরূপ অমৃত রেখে বিষয়বিষ গলাধঃকরণ করছিস। নিজের দেহে পরম তত্ত্ব উপলব্ধি ক'রে পদকর্তা বলছেন, আমি রাগদ্বেষমোহাদি স্বজনকে ধ্বংস ক'রে ফেলব। দুষ্ট বলদ অপেক্ষা যেমন শূন্য গোয়াল ভাল তেমনি দুষ্ট বিষয়ে উত্তেজনা প্রদানকারী সংবৃতি বোধিচিত্ত অপেক্ষা শূন্য দেহ ভালো। বস্তুতঃ দেহ গোয়ালকে শূন্যতার আগার ক'রে তুলতে পারার মধ্যেই তো মুক্তি। অতএব জগৎ-সম্পর্কিত মিথ্যা জ্ঞান দূরে ক'রে স্বচ্ছন্দে একাকী বিচরণ কর।

---

১ - চর্যাগীতি-পদাবলী, পৃঃ ১৬৪

॥ ৪০ ॥

কাহ্নপাদানাম্ (কাহ্নুপাদানাম্)

রাগ—মালসী গবুড়া

জো মণ-গোঅর[1] আলাজালা।
আগম পোথী ইট্‌ঠা[2] মালা ॥ ধ্রু ॥
ভণ কইসে সহজ বোলবা জাই[3]।
কাঅবাক্ চিঅ জসু ণ সমাই[4] ॥ ধ্রু ॥
আলে[5] গুরু উএসই সীস।
বাক্ পথাতীত কহিব[6] কীস ॥ ধ্রু ॥
জেতই বোলী তেতবি টাল।
গুরু বোব[7] সে সীসা কাল ॥ ধ্রু ॥
ভণই[8] কাহ্ন জিণরঅণবি কইসা[9]।
কাল[9] বোবে[10] সংবোহিঅ জইসা ॥ ধ্রু ॥

পাঠান্তর :—

১. গোএর (ক, ঘ) ২. ইণ্টা (ক)', ঠণ্ঠা (ঘ) ৩. জায় (ক, ঘ) ৪. সমায় (ক, ঘ) ৫. আলে (ক) ৬. কাহিব (ক, ঘ) ৭. বোধ (ক) ৮-৮. কাহ্নু জিণরঅণ বিকসই সা (ক) ৯. কালে (ক, ঘ) ১০. বোব (ক, ঘ)

শব্দার্থ, টীকা, ব্যুৎপত্তি :—

মণ-গোঅর—মনগোচর। আলাজালা <আলজাল—প্রতারণা, ধোকাবাজি, জাল তুচ্ছবস্তু। পোথী<পুস্তিকা। ইট্‌ঠা—ইষ্ট> ইট্‌ঠা+আ। মালা <মাল্য—জপমালা। বোলবা (তব্য-জাত অসমাপিকা)—বলা। জসু<যস্য—যাহার। আলে—অলম্> আল+এ (এন); বৃথাই। উএসই<উপদিশতি—উপদেশ

দেয়। সীস শিষ্য। কহিব<কথয়িতব্য-বলা যাইতে পারে। জেতই—যতই। বোলা- বলা হইল (নিষ্ঠান্ত অতীত)। তেতবি—ততই। টাল- ছল। বোব বোবা। সীসা- শিষ্য > সীস+আ (বহুবচনে)। কাল—কালা, বধির। জিনরঅণবি-জিনরত্ন> জিনরঅণ+বি(< অপি)। কইসা < কীদৃশম্। বোধেঁ-বোব (<বোবা + এঁ (< এন)। সংবোহিঅ < সংবোধিত। জইসা<যাদৃশ।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর ঃ

যা মনোগোচর, (তা) ধোকাবাজি—(অমনি ধোকাবাজি হচ্ছে) আগম পুঁথি ইষ্টমাল্য। বল, সহজকে বলা যায় কেমন ক'রে—যার মধ্যে কায়-বাক্-চিত্ত প্রবেশ করে না ? বৃথাই গুরু শিষ্যকে উপদেশ দেয়, বাক্‌পথের অতীত (বস্তু) কেমন ক'রে ব্যাখ্যা করা যাবে ! যতই বলা গেল ততই (চলল) টাল-(বাহানা)। গুরু বোবা, (আর) সে শিষ্য কালা। কাহ্ন বলেন, জিন রত্নটি কেমন, (না) বোবা যেমন কালাকে সংবোধিত করে (তেমনি)।

অন্তর্নিহিত ভাব ঃ

যা কিছু মন এবং ইন্দ্রিয় দ্বারা সৃষ্ট তা সবই মিথ্যা, মায়া। আগম, পুঁথি, ইষ্টমাল্য ইত্যাদি দ্বারা সহজ-স্বরূপকে জানা যায় না। শাস্ত্র ইত্যাদি তো ইন্দ্রিয়গাহ্য, কিন্তু সহজানন্দ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। সহজানন্দ কায়বাক্‌চিত্তের অতীত, অতএব বাক্য ইত্যাদি দ্বারা এর স্বরূপ ব্যাখ্যা করা যায় না। গুরু যে শিষ্যকে উপদেশ দেন তাও অকারণ; বাক্যাতীতকে কিভাবে উপদেশের সাহায্যে স্পষ্ট ক'রে বলা সম্ভব হবে ! সে চেষ্টা আরো জটিলতার সৃষ্টি করবে মাত্র। গুরু যা বলতে চাইবেন তাও স্পষ্ট ক'রে বলতে পারবেন না, আবার শিষ্যও যা বুঝতে চাইবে তাও স্পষ্ট বুঝতে চাইবে তাও স্পষ্ট বুঝতে পারবে না– অতএব তারা যথাক্রমে বোবা ও কালার ভূমিকা পালন করবে মাত্র। এবং যে ভাবে বোবা কালাকে কোনোমতে সংকেতের সাহায্যে কোনো কিছু বুঝিয়ে দিতে পারে, ঠিক তেমনি গুরু তাঁর শিষ্যকে আভাসে-ইঙ্গিতে চতুর্থানন্দ সম্পর্কে অবহিত করিতে পারেন।

॥ ৪১ ॥

ভুসুকুপাদানাম্

রাগ—কাহ্নু গুংজরী (কহ্নু গুংজরী)

আই এ অণুঅনা এ জগ রে ভাংতিএঁ সো[১] পড়িহাই।
রাজ সাপ দেখি জো চমকিই সাচে[২] কি[৩] তা[৪] বোড়ো খাই ॥ ধ্রু ॥
অকট জোইআ রে মা কর হথা লোণা[৫]।
[৬]অইস সহাবে[৬] জইজগ[৭] বুঝসি তুটই বাসণা[৭] তোরা ॥ ধ্রু ॥
[৮] মরুমরীচি গন্ধবনঅরী দাপণপড়িবিম্বু[৮] জইসা।
বাতাবত্তেঁ সা দিঢ়[৯] ভইআ আপে[১০] পাথর জইসা ॥ ধ্রু ॥
বাঞ্চি[১১] সুআ জিম কেলি করই খেলই বহুবিহ খেড়া।
বালুআ তেনেঁ সসর সিংগে[১২] আকাশে[১৩] ফুলিলা ॥ ধ্রু ॥
রাউতু ভণই কট ভুসুকু ভণই কট সঅলা অইস সহায়[১৪]।
জই তো মূঢ়া আছসি[১৫] ভান্তি[১৬] পুছতু[১৭] সদগুরু পাব[১৮] ॥ ধ্রু ॥

পাঠান্তরঃ—

১. ভাংতি এঁসো (ক), ভন্তিএঁ (গ) ২. বারে (ক, ঘ) ৩. কিং (ক, ঘ) ৪. তং (ক) ৫ লোহ্না (ক, ঘ) ৬-৬ আইস সভাবেঁ (ক, ঘ) ৭-৭. বুঝিষি তুট বাষণা (ক, ঘ) ৮-৮. মরুমরীচিগন্ধনই-রীদাপতিবিম্বু (ক), মরুমরীচি-গন্ধ [ব] নইরী দাপনবিম্বু (ঘ) ৯. দিট (ক) ১০. অপেঁ (ক, ঘ) ১১. বাঙ্কি (ক), বাঙ্কি (ঘ) ১২. সসসিংগে (গ) ১৩. আকাশ (ক,ঘ) ১৪. সহাবা (গ) ১৫. অচ্ছসি (ক), অচ্ছই (ঘ) ১৬. ভান্তী (ক) ১৭. পুচ্ছতু (ক) ১৮. পাবা (গ)

শব্দার্থ, টীকা, ব্যুৎপত্তি :—

আইএ আদি > আই + এ (< তে। অণুঅনা < অনুৎপন্ন।

ভাংতিএঁ—ভ্রান্তি > ভাংতি+এঁ (< এন); ভ্রান্তি দ্বারা। পড়িহাই < প্রতিভাতি প্রতিভাত হয়। রাজ < রজ্জু। চমকিই <চমৎকৃত—চমকিত হয়। সাচে<সত্যেন (সত্য+এন>সচ্চ+এন>সাচ+এঁ>সাচেঁ, সাচে)। তা<তম্ (কর্মকারক)—তাকে। বোড়ো—বোড়া সাপ। খাই < খাদতি—খায়। হথা < হস্ত। লোণা – লবণাক্ত। তোরা—তোর। মরুমরীচি—মরুর মরীচিকা। গন্ধব্ব<গন্ধর্ব। পড়িবিম্ব<প্রতিবিম্ব। বাতাবত্তেঁ <বাত্যা-বর্ত্তেন। ভইআ—ভবিত> ভইঅ+আ। আপ—জল। বাঞ্ঝি <বাঞ্ঝি< বাঞ্ঝিকা—বন্ধ্যা। সুআ < সুত। খেলই < খেড়ই <খেড্ডই < ক্রীড়তি। বহুবিহ < বহুবিধ। খেড়া—খেলা, প্রাকৃতে 'খেড্ডা'। বালুআ < বালুকা। তেলেঁ – তেল (< তৈল)+এঁ (<এন)। সসর—সস্স (<শশ)+র (ষষ্ঠী)। সিংগে - সিংগ (শৃঙ্গ)+এ (<এন)। ফুলিলা পুষ্পিত হইল; ফুল্ল<ফুল + ইলা (<ইল্ল)। রাউতু<রাঅউত্ত<রাজপুত্র। কট<অকট—আশ্চর্য। সহাব—স্বভাব। আছসি < অচ্ছসি। পুছতু—পুছ (<পুচ্ছ) +তু (<ত্বম্)। পাব<পাঅ<পাদ।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর ঃ—

ওরে, আদিতে অনুৎপন্ন এ জগৎ, সে প্রতিভাত হয় ভ্রান্তিবশতঃ। রজ্জুতে সাপ দেখে যে চমকায়, যথার্থই কি তাকে বোড়া (সাপে) খায়? আশ্চর্য, ওরে যোগী, হাত লোনা করিসনে। যদি জগতকে (তার) এই (যথার্থ) স্বভাবে বুঝতে পারিস (তাহ'লেই তোর বাসনা টুটবে। যেমন মরুমরীচিকা, গন্ধর্বনগরী (ও) দর্পণের প্রতিবিম্ব, যেমন বাত্যাবর্তে সেই জল দৃঢ় হয়ে পাথর হয়, বন্ধ্যা (রমণীর) পুত্র যেমন কেলি করে—বহুবিধ খেলা খেলে বালির তেল নিয়ে (আর) শশকের শিং নিয়ে, (যেমন) আকাশ পুষ্পিত হয়,—(আর তা দেখে) রাজপুত্র বলেন 'আশ্চর্য!',—ভুসুকু বলেন '(ঠিক) এমনি আশ্চর্য সভাব-(বিশিষ্ট) সবকিছুই। তুই যদি (ওরে) মূঢ়, ভ্রান্তিতে থাকিস (তবে) সদ্‌গুরু পাদকে জিজ্ঞাসা কর।'

অন্তর্নিহিত ভাব :–

জগৎ সংসার মূলতঃ অস্তিত্ববিহীন। জীব কেবল ভ্রান্তিবশতই জগৎ সম্পর্কীয় মিথ্যা ধারণা পোষণ করে। রজ্জুতে সর্প প্রতীয়মান হওয়ার ন্যায় এই জগতের একটা প্রাতিভাসিক সত্তা মাত্র বিদ্যমান। জীবের অজ্ঞতার জন্যই মিথ্যা বস্তুতে সত্যের অধ্যাস হয়। রজ্জুকে সাপ মনে ক'রে আঁতকে উঠলেও সেই রজ্জু এমনকি ঢোড়া সাপ হয়েও কাউকে দংশন করতে পারে না। অতএব, পদকর্তা উপদেশ দিচ্ছেন, কেউ যেন সংসারের ব্যাপারে হাত লবণাক্ত না করে অর্থাৎ সংসার নিয়ে বেশি জড়িয়ে না পড়ে। জগতের প্রাতিভাসিক সত্তা সম্পর্কে অবহিত হ'তে পারলে মিথ্যা কামনা বাসনার অবসান হয়। মরুমরীচিকা, গন্ধর্বনগরী এবং দর্পণের প্রতিবিম্বের ন্যায় এই জগৎ মিথ্যা। ঘূর্ণাবর্তে জলস্তম্ভ সৃষ্টি হ'লে তা যেমন দৃঢ় পাষাণস্তম্ভ ব'লে প্রতীয়মান হয় তেমনি জগৎ সম্পর্কীয় ধারণা আমাদের চোখের ভুল ছাড়া আর কিছু নয়। বালির তেল এবং শশকের শিং নিয়ে বন্ধ্যারমণীর পুত্র খেলা করে– একথা যেমন একেবারেই মিথ্যা, কিংবা মিথ্যা আকাশকুসুম–তেমন এই জগতের অস্তিত্ব মিথ্যা মায়া মাত্র। একথা হয়ত সকলে ঠিক বুঝবে না, সে জন্য পদকর্তা সদ্‌গুরুর উপদেশ গ্রহণের কথা বলছেন।

———

॥ ৪২ ॥

কাহ্নুপাদানাম্ (কাহ্নুপাদানাম্)

রাগ–কামোদ

চিঅ সহজ সূণ[১] সংপুন্না।
কান্ধ বিয়োএ মা হোহি বিসন্না ॥ ধ্রু ॥

ভণ কইসে কাহ্ন[২] নাহি।
ফরই অনুদিন[৩] তোলাএ[৪] সমাই[৫] ।। ধ্রু।।
মূঢ়া দিঠ নাঠ দেখি কাঅর।
ভাগ[৬] তরঙ্গ কি সোসই[৭] সাঅর[৮] ।। ধ্রু।।
মূঢ়া আছন্তে[৯] লোঅ ন পেখই।
দুধ[১০] মাঝেঁ লড়[১১]ণ আছন্তেঁ[১১] দেখই ।। ধ্রু।।
ভব জাই ণ আবই এসু কোই।
অইস[১২] বিলসই কাহ্নিল জোই।। ধ্রু।।

পাঠান্তর ঃ—

১, শূণ (ক, ঘ) ২, কাহ্নু (ক, ঘ) ৩, অনুদিনং (ক, ঘ)
৪. তৈলোএ (ক, খ) তিলোএ (গ) ৫. পমাই (ক, ঘ)
৬. ভাঙ্গ (গ) ৭. সোষই (ক) সোসঈ (ঘ) ৮. সায়অর (ঙ)
৯. অচ্ছন্তে (ক) ১০-১০ ণচ্ছংতে (ক) চ্ছন্তে ণ (ঘ)
১১. আইস (ক, ঘ)

শব্দার্থ, টীকা ব্যুৎপত্তি ঃ—

সংপুন্না<সম্পূর্ণ। বিয়োএ<বিয়োগেন। বিসন্না—বিষন্ন। ফরই<স্ফুরতি। দিঠ<দৃষ্ট। নাঠ<নষ্ট। কাঅর<কাতর। ভাগ<ভগ্ন। সোসই<শুষ্যতি —শোষে। সাঅর<সাগর। অছন্তে (অস্ ধাতু শত্রন্ত অসমাপিকা সপ্তমীর একবচনে)—থাকিতে। পেখই<প্রেক্ষতে। লড়—মাখন। দেখই- দৃক্ষতি[৭]। আবই <আয়াতি—আসে। এসু<এতস্মিন (৭মীর একবচনে)। কোই <কোহপি—কেউ।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর ঃ—

চিত্ত সহজ (দ্বারা) শূন্যতা-পরিপূর্ণ। স্কন্ধ-বিয়োগে বিষন্ন হোয়োনা। কেমন ক'রে বল কানু নেই। ত্রৈলোক্যে প্রবেশ ক'রে সর্বদা সে ব্যস্ত (হয়)।

দৃষ্ট-(বস্তুর) নাশ দেখে মূঢ় ব্যক্তিই কাতর হয়। ভগ্ন তরঙ্গ কি সাগর শুষে ফেলে ? মূঢ় ব্যক্তিরা থাকতেও দেখে না। দুধের মধ্যে মাখন থাকলেও (তারা) দেখে না। এই ভাবে কেউ যায় না, কেউ আসেও না। এই ভাব নিয়ে বিলাস করেন যোগী কানুপাদ।

অন্তর্নিহিত ভাব ঃ

সহজ-শূন্যতার দ্বারা চিত্ত আমার পরিপূর্ণ। স্কন্ধ-বিয়োগ অর্থে মৃত্যু (কেননা মানুষ মাত্রেই পঞ্চস্কন্ধের সমন্বয়)—পদকর্তা শিষ্যদের উপদেশ দিচ্ছেন, আমার মৃত্যুতে তোমরা বিষন্ন হোয়ো না। এ কথা তোমরা কেমন ক'রে বলতে পার যে, মৃত্যুর পর আমি আর থাকব না! আমি তখন ত্রৈলোক্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে বিহার করব। বস্তুতঃ নির্বোধ লোকেরাই মৃত্যুতে কাতর হয়। ব্যক্তিজীবনের তরঙ্গ শাশ্বত জীবন-সমুদ্রে বিলীন হয়ে যায় মাত্র—এরই নাম মৃত্যু। কিন্তু তার ফলে তো জীবনের বিনাশ বুঝায় না। দুধের মধ্যে মাখন থাকার মতো ত্রিলোকের সর্বত্রই আমি তখন (মৃত্যুর পর) ছড়িয়ে থাকব। সাধারণ মূঢ় ব্যক্তিরা এটা বুঝতে পারবে না। সত্যি কথা এই যে, এখানে কেউ আসেও না, কেউ যায়ও না। এমনি এক মনোভাব নিয়ে কানু-পা বিরাজ করছেন জীবন সায়াহ্নে।

———

॥৪৩॥

ভুসুকুপাদানাম্

রাগ—বঙ্গাল

সহজ মহাতরু ফরিঅ এ[১] তোবোএ[২]।
খসমসহাবে[৩] রে[৪] বান্ধণত মুকা[৫] কোএ॥ ধ্রু॥

জিম জলে পাণি আ টলিয়া ভেউ[৫] ন জাই[৬]।
তিম মণ[৭] রঅণা[৮] রে সমরসে গঅণ সমাই[৯] ।।ধ্রু।।
[১০] জাসু ণাহি অপ্পা তাসু পরেলা[১০] কাহি।
আইএ[১১]অণু্অণারে জাম মরণ তব ণাহি।।ধ্রু।।
ভুসুকু ভণই কট রাউতু ভণই কট সঅলা এহ সহাব।
[১২]এথু জাই ণ আবই রে ণ তহি[১২] ভাবাভাব।।ধ্রু।।

পাঠান্তর ঃ—

১. ফরিঅএ (ক) ২. তৈলোএ (ঘ) ৩. খসমসভাবে (ক, ঘ) ৪. বাণত কা (ক), বাণত মুকা (গ), বান্ধ-মুকা (ঘ) ৫. ভেড় (ক) ৬. জাঅ (ক, ঘ) ৭. মরণ (ক) ৮. অঅণা (ক) ৯. সমাঅ (ক, ঘ ১০-১০. জুৎপুণাহি অপ্পাতা স্বপরেলা (ক) ১১. আই (ক, ঘ) ১২. জাই ণ আবহি রে ণ তংহি (ক)

শব্দার্থ টীকা ব্যুৎপত্তি ঃ -

ফরিঅ<স্ফুরিত। খসম—খ (আকাশ)+সম (তুল্য); কিন্তু পারিভাষিক অর্থে শূন্যতা। বান্ধণত—বান্ধণ (<বন্ধন)+ত (অপাদানে)। মুকা <মুক্ক<মুক্ত। কোএ<কোহপি—কেউ। পাণিআ—পাণিআ (৩৫ নং চর্যা দ্রষ্টব্য)। ভেউ<ভেদঃ। সমরসে—শূন্যতা ও করুণার অভেদ মিলনে। অপ্পা>আত্মা—আপন নিজ। পরেলা—পর+লিকা (স্বার্থে) >পরগিআ> পরেলা। এহ<এতস্য।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর ঃ-

সহজ মহাতরু এ ত্রিলোকে স্ফুরিত; ওরে খ-সম স্বভাবে কে বন্ধন-মুক্ত? যেমন জলে পানি পড়লে ভিন্ন করা যায় না, তেমনি ওরে, মনরত্ন সমরসে গগনে প্রবেশ করে। যার আপন নেই তার পর কোথায়! ওরে, আদিঅনুৎপন্ন (যা, তার) জন্ম মরণ স্থিতি নেই। ভুসুকু বলেন, আশ্চর্য! রাজপুত্র বলেন,

'আশ্চর্য'! —সকলি এই স্বভাব (বিশিষ্ট), ওরে, এখানে কেউ যায় না, (কেউ) আসেও না। (আর) তাতে ভাবও নেই, অভাবও নেই।

অন্তর্নিহিত ভাব :—

মহাসুখে নিমজ্জিত সহজচিত্ত যেন মহাতরু বিশেষ—এখন তা ভববন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ত্রিলোকে পরিব্যাপ্ত। খ-সম স্বভাব অর্থ মহাসুখময় শূন্যতাস্বভাব। এই শূন্যতাস্বভাবে যার চিত্ত লীন হয় সে কি মুক্ত না হয়ে পারে? অর্থাৎ সেই সাধক মুক্তিলাভ করবেই। জলের সঙ্গে জল মিশে গেলে যেমন আর তা পৃথক করা যায় না তেমনি মনও মহাসুখরূপ শূন্যতায় লীন হয়ে গেলে তাকে আর পৃথক করা সম্ভব হয় না। সেই অবস্থায় আত্ম-পর ভেদাভেদ লোপ পায়। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আদিতেই কোনো কিছু উৎপন্ন হয়নি, সব কিছুরই একটা প্রতিভাসিক সত্তা মাত্র বিদ্যমান। এ কথা যাঁরা বুঝেন তাঁরা জানেন, জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদির কল্পনা সমস্তই মায়াস্বপ্ন মাত্র ভুসুকু রাউতু এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা ক'রে বলেন—বিশ্বের সব কিছুই এমনি মায়া, এখানে কোনো কিছুর জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই; ভাবাভাব বলতেও কিছু নেই।

——

॥ ৪৪ ॥

কঙ্কণপাদানাম্ (কোঙ্কণপাদানাম্)

রাগ-মল্লারী

সুনে সুন[১] মিলিআ জবেঁ।
সঅল[২] ধাম উইআ তবেঁ। ধ্রু ॥
আছহু[৩] চউখণ সংবোলি[৪]।
মাঝ নিরোহে[৫] অণুতর[৬] বোহী ॥ ধ্রু ॥
বিন্দুণাদ[৭] ণ হিএঁ[৮] পইঠা।
আণ[৯] চাহন্তে বিণঠা ॥ ধ্রু ॥
জথা[১০] আইলেসি[১১] তথা জান।
মাঝে[১২] থাকী[১৩] সঅলবি হাণ[১৩] ॥ ধ্রু ॥

ভণই কঙ্কণ কল এল সাদেঁ।
সব্ববি[১৪] চুরিল[১৫] তথতা[১৬] নাদেঁ॥ ধ্রু॥

পাঠান্তর :—

১. সুনে সুন (ক) ২. সকল (ঘ) ৩. আচ্ছহু (ক, ঘ) ৪. সংবোহী (ক) ৫ নিরোহ (ক, ঘ), নিরোধ (গ) ৬. অণুঅর (ক, ঘ), অণুত্তর (গ) ৭. বিদুণাদ (ক), বিন্দুণাদ (ঘ) ৮. ণহিঁএ (ক) ৯. অণ (ক) ১০. জথা (ক) ১১. আইলেঁসি (ক) ১২ মাসং (ক) ১৩. ১৩. সঅল বিহাণ (ক, ঘ) ১৪. সব্ব (ক, ঘ) ১৫. বিচ্ছুরিল (ক, ঘ), বি সুনিল (গ) ১৬. তথতা (ক)

শব্দার্থ, টীকা ব্যুৎপত্তি :—

উইআ<উদিত। চউখণ<চতুঃক্ষণ। সংবোহি—সংবোহ (< সংবোধ)+ই (অসমাপিকার চিহ্ন)। নিরোহেঁ—নিরোধ> নিরোহ+এঁ (<এন)। বোহী<বোধি। বিন্দুণাদ<বিন্দু-নাদ—বিন্দু ও নাদ যথাক্রমে গ্রাহক ও গ্রাহ্য জ্ঞান; অথবা যথাক্রমে করুণা-শূন্যতা, বা কুলিশ-কমল, বা বোধিচিত্ত-খসম। হিএঁ—হৃদয়>হিঅঅ+এঁ (অধিকরণে) < হিএঁ। বিণঠা <বিনষ্ট। জথা<যত্র। আইলেসি—আসিয়াছে; আয়াত+ ইল্ল+সি (মধ্যম পুরুষে)। যথা<তত্র। থাকী—থাক+ঈ (ইঅ, ত্বাচ্-স্থানে)। সঅলাবি—সকলই। হাণ—আঘাত কর, এখানে 'ত্যাগ কর' অর্থে। কলএল সাদে—কলকল শব্দে। চুরিল <চুর্ণ+ইল্ল। নাদেঁ<নাদেন।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর :-

যখন শূন্যের সঙ্গে শূন্য মিলে গেল তখন ধর্ম উদিত হ'ল। চতুঃক্ষণ সংবোধিত ক'রে অর্থাৎ সম্যকরূপে উপলব্ধি ক'রে (আমি) রয়েছি। অনন্তর বোধী (লাভ হয়) মধ্য-নিরোধের দ্বারা। বিন্দুনাদ হৃদয়ে প্রবিষ্ট হ'ল না, এক চাইতে আর বিনষ্ট হ'ল। যেখানে থেকে এলে, জ্ঞান (যে) সেখানেই (সুখ)। মাঝখানে থেকে সকলই ছাড়। কঙ্কণাপাদ কলকল শব্দে বলেন— তথতানাদে সব কিছু চূর্ণ হ'ল।

অন্তর্নিহিত ভাব :—

প্রকৃতিদোষযুক্ত প্রথম তিন স্তরের শূন্যতা (যথা, শূন্য, অতিশূন্য ও মহাশূন্য) যখন চতুর্থ শূন্যে (অর্থাৎ সর্বশূন্যে) বিলীন হয়ে যায় তখন ধর্মের উদয় হয়। তখন সর্ববিষয়ে প্রকৃষ্ট জ্ঞানোদয়ের ফলে মহাসুখলাভ হয়।

ঊর্ধ্বগতিতে চিত্ত প্রথম স্তরের শূন্যতা থেকে যাত্রা শুরু ক'রে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তর অতিক্রম ক'রে চতুর্থ শূন্যতায় উপনীত হয়। সাধানার এই বিভিন্ন স্তরে সাধকের বিভিন্ন মানসিক অবস্থার সৃষ্টি হয়, সেগুলি হচ্ছে যথাক্রমে বিচিত্র, বিপাক, বিমর্দ ও বিলক্ষণ।—এই চার মানসিক অবস্থাই হচ্ছে চতুক্ষণ। এহ চতুঃক্ষণ্ দ্বারা সংবোধিত হয়েই চতুর্থ শূন্যের উপলব্ধি সম্ভব হয়।

মধ্য-নিরোধ অর্থে দৃশ্যাদির অস্তিত্বের জ্ঞান নিরোধ করা, অথবা অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যবর্তী বর্তমানের বা ভবের নিরোধ সাধন। এই প্রকার নিরোধের দ্বারা অনুত্তর-বোধী লাভ হয়। গ্রাহ্যগ্রাহকভাব বা দ্বৈতভাব হচ্ছে নাদাবিন্দু, বোধি-লাভের ফলে এই দ্বৈতভাব তিরোহিত হয়।

এই পৃথিবীতে এক চাইলে অন্য বিনষ্ট হয়, অর্থাৎ শূন্যতাকে চাইলে সংবৃতি বোধিচিত্তির বিকাশ হয়। পরমার্থ বোধিচিত্ত হ'তে উৎপন্ন হয়েছে এ তত্ত্ব অবগত হয় তুমি মধ্যপথ অবলম্বন কর—এ পথেই মহাসুখ লাভ হয়। মধ্যপথ মানেই সুষুম্না বা অবধূতিকার পথ। রসনা ললনার পথ পরিত্যাগ ক'রে এই মধ্যপথ ধ'রে অগ্রসর হ'লে সর্বাধিক বিকল্প দূর হয়। তখন সাকারনিরাকারাদি তত্ত্ব তথতা-নাদে ধ্বংস হয়ে যায়।

———

॥ ৪৫ ॥

কাহ্নুপাদানাম্

রাগ—মল্লারী

মণ তরু পাঞ্চ ইন্দি তসু সাহা।
আসা বহল[১] পাত ফল বাহা[১] ॥ ধ্রু ॥

বরগুরু-বঅণে কুঠারে[১] ছীজই[২]।
কাহ্ন ভণই তরু পুণ ন উঅজই[৩] ॥ ধ্রু ॥
বাঢ়ই[৪] সো তরু সুভাসুভ পাণী।
ছেবই বিদুজন গুরু পরিমাণী ॥ ধ্রু ॥
জো তরু ছেব[৫] ভেবউ[৬] ণ জাণই।
সড়ি পড়িআঁ রে মূঢ় তা ভব মাণই ॥ ধ্রু ॥
সুণ[৭] তরুবর[৮] গঅণ কুঠার।
ছেবহ সো তরু মূল ন ডাল ॥ ধ্রু ॥

পাঠান্তর :—

১-১ পাত ফলাহা হবাহা) (ক), পাতহ বাহা (ঘ) ২. ছিজঅ (ক, ঘ) ৩. উইজঅ (ক, ঘ) ৪. বাটই (ক, ঘ) ৫. ছেবই (গ) ৬. ভেউ গ) ৭ সুন (ক, ঘ) ৮ তরু (ক)

শব্দার্থ, টীকা, ব্যুৎপত্তি :—

ইন্দি<ইন্দিয়। সাহা<শাখা। আস।<আশা। বহল—বহুল। পাত—পাতা। বাহী—বহনকারী; বাহক > বাহা। বরগুরু-বঅণে—সদ্‌গুরুর উপদেশে। কুঠারে'—কুঠার+এ' (<এন)। ছীজই<ছিদ্যতে। উঅজই<উদ্‌বীজয়তি—উৎপন্ন হয়। বাঢ়ই <বর্দ্ধতে। সুভাসুভ শুভাশুভ। ছেবই < ছেদয়তি ছেদ করে। পরিমাণী<প্রমাণিত। ছেব<ছেদঃ। ভেবউ—ভেদ> ভেঅ>ভেব+উ (অপি-জাত)। জাণই < জানাতি—জানে। সড়ি—টীকা অনুসারে ষটিত্বা>সড়ি, অপসৃত হইয়া; শহীদুল্লাহ সাহেব শব্দটিকে 'পচিয়া' অর্থে গ্রহণ করেছেন।[১] পড়িআঁ— পড়িয়া। মাণই > মানয়তি—মানে। ছেবহ < ছেদয়থ—ছেদ কর।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর :—

মন (হচ্ছে) গাছ, পাঁচ ইন্দ্রিয় তার শাখা; আশা (রূপ) বহুল পাতা (ও) ফল বহনকারী (সে)। বরগুরু-বচন-(রূপ) কুঠারে ছেদ করতে হয় (তা)। কানু বলেন, সে) তরু (যেন) পুনরায় না উৎপন্ন হয়। শুভ অশুভরূপ জলে

সে তরু বর্ধিত হয়। গুরুকে প্রামাণ্য জেনে (অর্থাৎ গুরুর কথা মতো) বিজ্ঞজন তা ছেদন করে। তরুর ছেদ ও ভেদ যে না জানে, ওরে মূঢ়, (সে) সংসার মেনে নিয়ে পড়ে পচে। শূন্য তরুবর, গগণ কুঠার। ছেদ কর সেই তরু, (যেন না থাকে তার) মূল, না ডাল।

অন্তর্নিহিত ভাব :—

মন বৃক্ষ বিশেষ, পাঁচ ইন্দ্রিয় তার পাঁচ শাখা; আর বাসনা হচ্ছে তার পাতা ও ফল। মনের এই ইন্দ্রিয় এবং বাসনাদি থাকার জন্যই সংসার-মায়াজালে এমন গভীরভাবে সে জড়িত। সংসার মায়া হ'তে মুক্ত হওয়ার জন্য তাই এই মন-তরুকে কেটে ফেলা প্রয়োজন। গুরুর উপদেশরূপ কুঠার দ্বারাই এই মন-তরুকে কেটে ফেলা সম্ভব। সংসারের শুভ-অশুভ বোধের দ্বারা মনতরু পল্লবিত হয় একে একেবারে নির্মূল করতে না পারলে স্বার্থবোধের দ্বারা প্রণোদিত হয়ে আবার সে বেড়ে ওঠে। সদ্‌গুরুর উপদেশ অনুসারে তাই একেবারে মূলোচ্ছেদ ক'রে এই মনতরুকে ধ্বংস ক'রে ফেলতে হবে। না পারলে সংসারের মায়াজালে বদ্ধ হয়ে প'চে মরতে হবে। পরিশেষে পদকর্তা উপদেশ দিচ্ছেন—অবিদ্যারূপ শূন্যতরুকে (অর্থাৎ এই মনকে) প্রভাস্বর কুঠার দ্বারা এমন ভাবে ছেদন কর যেন তার ডাল কিংবা মূল কিছুই না থাকে।

॥ ৪৬ ॥

জয়নন্দীপাদানাম্

রাগ—শবরী

পেখু[১] সুণেই[২] আদসে[৩] জইসা।
অন্তরালে ভববি[৪] তইসা ॥ ধ্রু ॥
মোহ[৫] বিমুক্কা জই মণা।
তবে[৬] তুটই[৭] অবণাগবণা[৮] ॥ ধ্রু ॥

১ - Buddhist Mystic Songs, p 128

নউ[৮] দাঢ়ই[৯] নউ তিমই ন ছীজই[১০]।
পেখ মাআ[১১] মোহে[৫] বলি বলি বাঝই ॥ ধ্রু ॥
ছাআ[১২] মাআ কাঅ সমাণা।
বেণি[১৩] পাখে[৫] সোহই[১৪] ণাণা ॥ ধ্রু ॥
চিঅ তথতাসহাবে[১৬] সোহিঅই[১৭]।
ভণই জয়নন্দি ফুড় আণ[১৮] ণ হোই ॥ ধ্রু ॥

পাঠান্তর :—

১. পেখই (ঘ) ২. সুঅনে (ক, ঘ) ৩. অদশ (ক) ৪. মোহ (ক, ঘ) ৫. মোদ (ঙ) ৬. তুটই (ক) ৭. গমণা (ক, ঘ) ৮. নৌ (ক, ঘ) ৯. দাটই (ক, ঘ) ১০. চ্ছিজই (ক) ১১. মোঅ (ক), মাঅ (ঘ) ১২. ছাঅ (ক, ঘ) ১৩. বিণি (ঘ) ১৪. সোই (ক, ঘ) ১৫. বিণা (ক), বিণাণা (ঘ) ১৬. স্বভাবে (ক, ঘ) ১৭. যোহিঅ (ক, ঘ), বোহই (গ) ১৮. ফুড়অণ (ক, গ, ঘ)

শব্দার্থ, টীকা, ব্যুৎপত্তি :—

পেখু—পেখই < প্রেক্ষতে—দেখ। সুইণে—স্বপ্ন > সুবিণ > সুইণ + এ (৭মী)। অদসে—আদর্শ > অদশ, অদস + এ (৭মী)—আরশিতে। ভববি – ভব + বি (অপি-জাত); ভবও। বিমুক্ক—বি + মুক্ত > বিমুক্ক + আ। নউ < নতু—কখনো না। দাঢ়ই—দগ্ধ > দড্‌ঢ > দাঢ় + ই (< তি)—দগ্ধ হয়। তিমই < তিম্যতে—ভিজে। বলি < বলিঅং < বলীয়স্‌—দৃঢ়ভাবে। বাঝই < বজ্‌ঝই < বধ্যতে—বদ্ধ হয়। ছাআ—ছায়া পাখে· পক্ষ > পাখ + এ' (< এন)। সোহই < শোভতে—শোভা পায়। ণাণা—নানা। সোহঅই < শোধয়তি – শোধিত হয়। ফুড় < স্ফুটম্‌ – স্পষ্টভাবে।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর :—

দেখ, যেমন স্বপ্নে, যেমন আরশিতে, তেমনি (এই) ভব অন্তরালেও। মন যদি মোহ-বিমুক্ত হয় তবে আনাগোনা টুটে যায়। কখনো দগ্ধ হয় না, ভিজে না, (কিংবা) ছেদিত হয় না; (তবু) দেখ, মায়ামোহে বদ্ধ হয় দৃঢ়ভাবে।

ছায়া মায়া কায়া সমান। দুই পক্ষেই (তারা) নানা (রূপে) শোভা পায়। তথতাস্বভাবে চিত্ত শোধিত হয়; জয়নন্দী স্পষ্টভাবে বলেন, (এর) অন্যথা হয় না।

অন্তর্নিহিত ভাব :—

যেমন দর্পণে যেমন স্বপ্নে কোনো বস্তুর প্রকৃত সত্তাকে নয়, তার প্রাতিভাসিক সত্তাকে মাত্র প্রত্যক্ষ করা যায়, তেমনি এই পার্থিব জগতের যে অস্তিত্বকে অন্তরে উপলব্ধি করা যায় তাও প্রাতিভাসিক সত্য মাত্র। অর্থাৎ জগতের অস্তিত্ব সম্পর্কীয় একটা মিথ্যা জ্ঞান দ্বারা মানুষ আবদ্ধ। গুরু উপদেশে মন যদি এই মিথ্যা বোধ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে তাহলে ভববন্ধনও তিরোহিত হবে এবং পৃথিবীতে আর জন্ম নিতে হবে না। ফলে দুঃখপূর্ণ পৃথিবীতে আনাগোনা বন্ধ হয়ে যাবে।

অতঃপর মোহ-বিমুক্ত চিত্তের কথা বলা হয়েছে। সে আগুনে দগ্ধ হয় না, জলে ভিজে না, কিংবা কোনো অস্ত্রেও কাটা যায় না তাকে। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এমনি মোহ-বিমুক্ত চিত্তকে আয়ত্ত করার সাধনা না ক'রে জীব কেবলি সংসার মোহে আবদ্ধ থাকে। ছায়া মায়া, কায়া-সকলি সমান। অর্থাৎ ছায়া যেমন, মায়া যেমন, তেমনি এই কায়াও। অবিদ্যাচ্ছন্ন জীবের কাছে এদের রূপ এক প্রকারের, তার চোখে এর হচ্ছে জাগতিক সত্য। কিন্তু অদ্বয় স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত সাধকের কাছে এর রূপ অন্য প্রকারের। সেখানে এরা আপন বিশুদ্ধ স্বভাবে উপনীত হয়ে জীবের পক্ষে মুক্তির কারণস্বরূপ হয়।

॥ ৪৭ ॥

ধম্মপাদানাম্[১] (ধামপাদানাম্)

[রাগ]—গুঞ্জরী

কমল কুলিশ মাঝেঁ[২] ভইঅঁ[৩] মইলী[৩]।
সমতা জোএ[১] জলিঅ চন্ডালী॥ ধ্রু॥
ডাহ ডোম্বী ঘরে লাগেলি আগি।
সসহর[৪] লই সিঞ্চহু প্রাণী।।ধ্রু॥

নউ খড়[৬] জালা ধুম ন দীসই[৭]।
মেরু-শিখর লই গঅণ পইসই ॥ ধ্রু ॥
দাঢ়ই[৮] হরিহর বামহ ভট্টা[৯]।
[১০] ফীটা হই[১০] ণবগুণ শাসন পট্টা[১১] ॥ ধ্রু ॥
ভণই ধাম ফুড় লেহু[১২] রে জাণী।
পাঞ্চ[১৩] নালেং উঠি[১৪] গেল পাণী ॥ ধ্রু ॥

পাঠান্তর :—

১. গুঞ্জরী পাদানাং (ক) ২. ভইম (ক), ভইম (গ), ভইম (ঘ) ৩. মিঅলী (ক, ঘ,), লেলী (গ) ৪. সহ ঘলি (ক) ৫. ষিঞ্চহু (ক, ঘ) ৬. খর (ক, ঘ) ৭. দিশই (ক, ঘ) ৮. ফাটই (ক), দাটই (ঘ) ৯. বাহ্ম ভরা (ক), বাহ্মণ নাড়া (গ), বাহ্ম ভড়ায়া (ঘ) ১০—১০ দাঢ়ই (গ), দাটা হই (ঘ) ১১. পড়া (ক, ঘ), পাড়া (গ) ১২. লেহু (ক) ১৩. পঞ্চ (ক) ১৪. উঠে (ক)

শব্দার্থ, টীকা, ব্যুৎপত্তি :—

মইলী—মৃত+ইল (বিশেষণে)>মইল+ঈ (স্ত্রীলিঙ্গে); মৃতা। জোএং < যোগেন। জলিঅ<জ্বলিত। চণ্ডালী—তেজঃস্কন্ধের অধিষ্ঠাত্রী যোগিনী—নৈরাত্মা অবধূতি। ডাহ<দাহ। আগি <অগ্নিক। সিঞ্চহু—সিঞ্চ+হু (অহম-জাত); সেচন করি। জালা < জ্বালা—অগ্নিশিখা। দাঢ়ই—দগ্ধ> দড্‌ঢ়> দাঢ়+ই (<তি)। হরিহর—হরি (বিষ্ণু)+হর (শিব)। বামহ <ব্রহ্মা। ভট্টা—ভট্ট (তৎসম্‌)+আ (বিশিষ্টার্থে)। ফীটা <স্ফটিত, ফাটিয়া পড়ে বা নষ্ট হয়। হই<ভইঅ<ভূয়া। ণবগুণ—নবগুণ। পট্টা পাট্টা। নালেং—নাল+এং (<এন)।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর :—

কমল-কুলিশ মাঝে মৃতা হয়ে চণ্ডালী সমতা-যোগে প্রজ্জ্বলিত হ'ল। ডোম্বীর ঘরে দাহ, আগুন লেগেছে; শশধর নিয়ে জল সিঞ্চন করি। খড়ে অগ্নিশিখাও দেখা যায় না, ধোঁয়াও না। মেরু-শিখর ধ'রে গগনে প্রবেশ

করে। হরি-হর-ব্রহ্ম দগ্ধ হয়। দগ্ধ হ'ল নবগুণ শাসন-পাট্টা। ধর্মপাদ বলেন —ওরে, স্পষ্ট জেনে নিলাম। পঞ্চনালে পানি (ওপরে) উঠে গেল।

অন্তর্নিহিত ভাব :—

কমল-কুলিশ হচ্ছে যথাক্রমে প্রজ্ঞা ও উপায় বা ইড়া ও পিঙ্গলা। এই ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যবর্তী নাড়ী হচ্ছে সুষুম্না। ইড়া-পিঙ্গলার পথ পরিহার ক'রে সুষুম্না-পথে উধর্ব-যাত্রার কথা তন্ত্রশাস্ত্রে সুপরিজ্ঞাত। ইড়া-পিঙ্গলাকে যুক্ত ক'রে সুষুম্না-পথে চালিত করতে পারলে মূলাধারে অবস্থিত শক্তিরূপিণী কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত হয় এবং শুরু হয় তার উধর্ব যাত্রা। সর্ববিষয়ে সমতাজ্ঞান হচ্ছে যেন সেই প্রজ্ঞারূপ বাতাস যার সাহায্যে চণ্ডালীরূপা প্রকৃতি দগ্ধ হয় এবং বিষয়ানুভূতি বিনষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ সুষুম্নার পথে সাধকের উধর্বযাত্রা শুরু হ'লে তখন সাধারণ বিষয় জ্ঞান ধ্বংস হয়ে যায়। ডোম্বী অর্থে পরিশুদ্ধাবধূতিকা, এই আগুন তার ঘরেও লগ্ন হয়েছে; অর্থাৎ ক্রমে তা উধর্বমুখী হয়ে সকল বিষয়াশ্রয়ী চিত্তকে নাশ করেছে। কেননা, বিষয়াশ্রয়ী চিত্তের বিনাশ ব্যতিরেকে পরিশুদ্ধাবধূতী ডোম্বী বা নৈরাত্মার আবির্ভাব সম্ভব নয়। এই আগুন কি ? তন্ত্রসাধনার পথে যে মহাসুখের অনুভূতি জাগ্রত হয় তাকেই বলা যেতে পারে আগুন। শশধর দ্বারা এই আগুনে জল সিঞ্চন করার কথা বলা হয়েছে, যেন তার শিখা কিংবা ধোঁয়া দেখা না যায়। শশধর হচ্ছে বিলক্ষণ-পরিশোধিত সংবৃতি বোধিচিত্ত বা প্রভাস্বর বোধিচিত্ত। চিত্ত অচিত্ততায় লীন হয়ে বিলক্ষণ বা লক্ষণ রহিত হ'লেই এই প্রভাস্বর বোধিচিত্তের উদ্ভব হয়। এই বোধিচিত্তের প্রভাবে সেই মহাসুখ সাধারণ সুখের মতো তীব্র চিত্ত-চাঞ্চল্যের কারণ হয় না ব'লেই বলা হয়েছে তার শিখা কিংবা ধোঁয়া দৃষ্ট হয় না। বিভিন্ন চক্র অতিক্রম ক'রে সাধক যখন শেষ পর্যায়ে পৌঁছে তখন হরি-হর-ব্রহ্মা শাসনপাট্টা প্রভৃতি সকলি দগ্ধ হয়ে যায়। হরি-হর-ব্রহ্মা হচ্ছে সকল প্রকার দ্বৈতজ্ঞান এবং শাসনপাট্টা হচ্ছে ধর্মের বিধিনিষেধ-মূলক আচার-অনুষ্ঠান। তন্ত্রসাধকের সিদ্ধি লাভের অবস্থায় এ সকল বিকল্পাদি ধ্বংশ হয়ে যায়। পদকর্তা বলেন, এই গূঢ় তন্ত্রাচার জেনে নিলে পানি পঞ্চনালে উপরে উঠে যাবে। পরিশুদ্ধ বোধিচিত্তই পানি। তন্ত্রসাধনার দ্বারা এই বোধিচিত্ত উধর্বাভিমুখী হয়।

॥ ৪৯ ॥

ভূসুকুপাদানাম্

রাগ—মল্লারী

বাজ ণাব[১] পাড়ী[২] পউআঁ[৩] খালে[৪] বাহিউ ॥
অদঅ বঙ্গাল[৫] দেশ[৬] লুড়িউ ॥ ধ্রু ॥
আজি ভুসুকু[৬] বঙ্গালী ভইলী।
ণিঅ ঘরিণী চন্ডালে[৭] লেলী ॥ ধ্রু ॥
[৮]ডহিঅ পাঞ্চ পাটণ ইন্দি বিসআ[৮] ণঠা।
ণ জানমি চিঅ মোর কহিঁ গই পইঠা ॥ ধ্রু ॥
সোণ অ রুঅ[৯] মোর কিম্পি ণ থাকিউ।
নিঅ পরিবারে মহাসুহে থাকিউ ॥ ধ্রু ॥
চউকোড়ি ভণ্ডার মোর লইআ সেস।
জীবন্তে মইলে[৪] নাহি বিশেষ ॥ ধ্রু ॥

পাঠান্তর :—

১. রাজনাব (গ) ২. পাড়া (ঘ) ৩. পউআ (ক, ঘ) ৪. বঙ্গালে (ক), দঙ্গালে (ঘ) ৫. ক্লেশ (ক) ৬. ভুসু (ক) ৭. চন্ডালী (ক) ৮-৮. ডহি যো পঞ্চধাট ণই দিবি সংজ্ঞা (ক), দহিঅ পঞ্চপাটণ ইন্দি বিসআ (ঘ) ৯ তরুঅ (ক)

শব্দার্থ, টীকা, ব্যুৎপত্তি :

বাজ<বজ্র। ণাব<নৌ। পাড়ি—পার>পাড়+ঈ (অসমাপিকা)। পউআঁ<পউম<পদুমা<পদ্মা। খালে—খাল+এ (৭মী)। বাহিউ<বাহিতঃ। অদঅ<অদয়। লড়িউ<লুণ্ঠিতঃ। আজি <আদ্যক। বঙ্গালী—বঙ্গাল+ঈ (স্ত্রীলিঙ্গে)। ভইলী—ভইল +ঈ (স্ত্রী প্রত্যয়)। চণ্ডালে<চণ্ডালেন। লেলী—লওয়া হইল; লভিত+ইল্ল+ঈ (স্ত্রীলিঙ্গে অথবা তুচ্ছার্থে)। ডহিঅ<দহিঅ <দগ্ধত। পঞ্চপাটন—পঞ্চস্কন্ধ (৩ নং চর্যায় 'কান্ধ' দ্রষ্টব্য)।

বিসআ < বিষয়াঃ। রূঅ < রূপক। থাকিউ < স্থাকিতঃ* ! থাকিল। মইলে'– মৃত>মঅ+ইল্ল>মইল+এ' (< এন)।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর :–

বজ্রনৌকায় পাড়ি দিয়ে পদ্মাখালে বাওয়া হ'ল, অদ্বয়-(রূপ) বাঙ্গল দেশ লুণ্ঠিত হ'ল। আজ ভুসুকু ! বাঙ্গালিনী জন্ম নিল। নিজ গৃহিণী চণ্ডাল কর্তৃক গৃহীত হ'ল। পঞ্চপাটন হ'ল দগ্ধ, নষ্ট হ'ল ইন্দ্রিয়-বিষয়। না জানি আমার চিত্ত কোথায় গিয়ে (হ'ল) প্রবিষ্ট। আমার সোনা ও রূপা কিছুই থাকল না। (আমি) নিজ পরিবারে মহাসুখে থাকলাম। চতুষ্কোটি আমার ভাণ্ডার নিয়ে শেষ ক'রে দিল। জীবন্তে (এবং) মড়ায় (কোনো) পার্থক্য নেই।

অন্তর্নিহিত ভাব :–

বজ্ররূপ নৌকা প্রজ্ঞারূপ পদ্মাখালে বাওয়া হ'ল। অর্থাৎ বজ্রগুরুর উপদেশে প্রজ্ঞা লাভ হ'ল। অদ্বয় বঙ্গ হচ্ছে অক্ষয় মহাসুখভূমি, অক্ষয় মহাসুখের প্রান্তরে উপনীত হওয়ার ফলে অবিদ্যাজাত সমুদয় বিকল্পাদি লুণ্ঠিত হ'ল। আজ এমন অবস্থায় ভুসুকুর মধ্যে বাঙালিনী অর্থাৎ অদ্বয়-জ্ঞানধারী দেবী জন্ম নিল—এই দেবীই নৈরাত্মা। সাধকের পূর্বাবস্থায় তার সমস্ত চিত্ত অধিকার ক'রে থাকে পার্থিব বিকল্পাদি, তখন চিত্তের অধিশ্বরী দেবী হয় অপরিশুদ্ধাবধূতিকা প্রকৃতিরূপিনী, চণ্ডালী। দেবী নৈরাত্মার আবির্ভাবে এই চণ্ডালী অন্তর্নিহিত হয়। তখন রূপবেদনাদি পঞ্চস্কন্ধ বিনষ্ট হয়, পঞ্চেন্দ্রিয়ের প্রভাবও ধ্বংস হয়। এক কথায়, যাবতীয় পার্থিব মায়া মোহ ইত্যাদির বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

এইভাবে নির্বিকল্প জ্ঞানের আবির্ভাবে চিত্ত এমন এক অবস্থায় উপনীত হয় যখন সর্বপ্রকার ভববন্ধন তিরোহিত হয়—এটি এমন একটি অবস্থা যা পদকর্তা ঠিক মতো যেন বুঝতে পারেন না। অর্থাৎ এ অবস্থা সর্ব প্রকার জ্ঞানের অতীত। এই অবস্থায় সোনা রূপা ইত্যাদি পার্থিব সম্পদ কিছুই আর মনকে আচ্ছন্ন ক'রে থাকে না। তখন শূন্যতা রূপ পরিবারের মহাসুখে বিরাজ করা সম্ভব হয় এবং বিকল্প চতুষ্টয় (৩৭. সংখ্যক চর্যা দ্রষ্টব্য) দূরীভূত হওয়াই জীবনে ও মরণে সত্যকার কোনো পার্থক্য যে নেই সেটা বুঝা যায়।

শবরপাদানাম্

রাগ—রামক্রী

গঅণত গঅণত তইলা বাড়ী[১] হিএ[২] কুরাড়ী।
কণ্ঠে নইরামণি[৩] বালি[৪] জাগন্তে উপাড়ী[৫] ॥ ধ্রু ॥
ছাড়[৬] ছাড় মাআ মোহা বিসমে[৭] দুন্দোলী।
মহাসুহে বিলসন্তি সবরো[৮] লইআ সুণ মেহেলী[৯] ॥ ধ্রু ॥
হেরি সো[১০] মোরি[১১] তইলা বাড়ী খসমে সমতুলা।
[১২] সুকল এ মোরে[১২] কপাসু ফুটিলা[১৩] ॥ ধ্রু ॥
তইলা বাড়ী পাসেঁ রে[১৪] জোহ্না বাড়ী তা এলা[১৫]।
ফিটেলি অন্ধারি রে আকাস[১৬] ফুলিলা[১৭] ॥ ধ্রু ॥
কঙ্গুচিনা[১৮] পাকেলা রে সবরাসবরি[১৯] মাতেলা।
অণুদিণ সবরো[২০] কিম্পি ণ চেবই মহাসুহেঁ ভোলা[২১] ॥ ধ্রু ॥
চারিবাসে[২২] গরিলারে[২৩] দিআঁ চঞ্চালী।
তহিঁ[২৪] তোলি সবরো[২০] ডাহ কএলা কান্দই[২৬]
সগুণ সিআলী[২৭] ॥ ধ্রু ॥
মারিঅ[২৮] ভবমত্তা রে দহ দিহে দিধলি বলী[২৯]।
হের সে[৩০] সবরো নিরেবণ[৩১] ভইলা, ফিটিলি সবরালী[৩২] ॥ ধ্রু ॥

পাঠান্তর :—

১. বাড্হী (ক) ২. হেঞ্চে (ক) ৩. নৈরামণি (ক, ঘ) ৪. বালিকা (গ) ৫. সুঘাড়ী (ঘ) ৬. ছাড়ু (ক) ৭. বিষমে (ক, ঘ) ৮. শবরো (ক, ঘ) ৯. সুণমে হেলী (ক) ১০. যে (ক, ঘ) ১১. মোরি (ক, ঘ) ১২-১২. বকড়এ সেরে (ক), সুকড় এসেরে (গ), বুকড় এবেরে (ঘ) ১৩. ফুলিটিলা (ঙ) ১৪. পাসেঁর (ক, ঘ) ১৫. উএলা (ঘ) ১৬. অকাশ (ক, ঘ) ১৭. ফুলিআ (ক, ঘ) ১৮. কঙ্গুরি না (ক), কঙ্গুরি (গ) ১৯. শবরাশবরি (ক, ঘ) ২০. শবরো (ক, ঘ) ২১. ভোলা

(ক, ঘ) ২২. চারিবাসে (ক, ঘ), চারিপাসেঁ (গ) ২৩. ভাইলারেঁ (ক), ছাইলারে (গ), গড়িলরে (ঘ) ২৪. ত'হি(ক, ঘ) ২৫. হকএলা (ক) ২৬. কান্দশ (ক) ২৭. শিআলী (ক, ঘ), ২৮. মারিল (ক, ঘ) ২৯. দিধ লিবলী (ক) ৩০. হে রসে (ক), হেরি সে (ঘ) ৩১. নিবরাণ (খ) ৩২. ষবরালী (ক, ঘ)

শব্দার্থ টীকা ও ব্যুৎপত্তি :-

তইলা—তৃতীয় > তঈঅ+ল। বাড়ী< বাটিআ। কুরাড়ী < কুঠারিকা। বালি – বালিকা। জাগন্তে (শতৃজাত অসমাপিকা) —জাগিয়া থাকিতে। বিসমে—বিসম (< বিষম) + এ। দুন্দোলী < দুন্দোলিকা—আলোড়নকারী, দ্বন্দ্বকারী। বিলসন্তি (গৌরবে বহু বচন)—বিলাস করেন। মেহেলী—মহিলা (একই অর্থে ১৩ সংখ্যক চর্যার 'মেহেরী' শব্দটি পাওয়া যাচ্ছে)। মোরি—আমার; মোর+ই (স্ত্রীলিঙ্গে)। সুকল < শুক্ল। কপাসু—কার্পাস। ফুটিলা < স্ফুটি+ইল্ল। পাসেঁ—পার্শ্বে > পাস+এঁ (৭মী)। জোহ্না < জ্যোৎস্না। তাএলা < তাবেলা < তদবেলা; সেই সময়। ফিটেলি—স্ফেটিত+ইল্ল+ই (তুচ্ছার্থে)। অন্ধারি—অন্ধকার>অন্ধআর+অন্ধার+ই (তুচ্ছার্থে)। কঙ্গুচিনা—কাংনি দানা; সম্ভবত এ থেকে সেকালে মদ্য প্রস্তুত হ'ত। পাকেলা <পক্ব+ইল্ল। মাতেলা<মত্ত+ইল্ল। ভোলা – বিহ্বল। বাঁসে—বংশ>বাঁশ+এঁ (< এন)। গড়িলা<গঠিত+ইল্ল। চঞ্চালী—চাঁচাড়ি বা চেঁচাড়ি। তোলি<তুলিত—তুলিয়া। ডাহ<দাহ। কএলা < কৃত+ইল্ল। কান্দই < ক্রন্দতি। সগুণ < শকুন। সিআলি—শৃগাল>সিয়াল+ই (তুচ্ছার্থে)। মারিঅ<মারিত-মারিয়া। দহ<দশ। দিধলি—দেওয়া হইল। বলী—শ্রদ্ধাপিন্ড। নিরেবণ<নিরেঞ্জন-নিশ্চল। ফিটিলি-ফিটেলি দ্রষ্টব্য।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর :-

গগনে গগনে তৃতীয় উদ্যান বাটিকা, হৃদয়ে কুঠার। কণ্ঠে নৈরাত্মা বালিকা জেগে উঠতেই উপড়ে ফেলল (তা)। বিষম দ্বন্দ্ব (সৃষ্টি)-কারী

মায়ামোহ (গুলি) পরিত্যাগ কর, পরিত্যাগ কর। শবর মহাসুখে শূন্য-মহিলা নিয়ে বিলাস করেন। আমার সে খসম-সমতুল্য তৃতীয় বাটিকা দেখে এই আমার সাদা কাপাস ফুটেছে। ওরে, (আমার) তৃতীয় উদ্যান বাটিকার পাশে সেই সময় জ্যোৎস্না-বাটিকা (প্রস্তুত হ'ল); দূর হ'ল অন্ধকার, ওরে, আকাশ কুসুমিত হ'ল। কঙ্গুচিনা পেকে উঠল, ওরে মাতাল হ'ল শবরশবরী। দিনের পর দিন শবর কিছুই অনুভব করে না (থাকে) মহাসুখে ভোর (হয়ে)। ওরে, চার বাঁশের (খাট) গড়ানো হ'ল চেঁচাড়ি দিয়ে, তার ওপর তুলে শবরকে দাহ করা হ'ল কাঁদল শকুন-শৃগালী। ওরে, ভবমত্তকে মেরে দশ দিকে পিন্ড দেওয়া হ'ল। দেখ, সে শবর নিশ্চল হয়ে গেল, দূর হ'ল (তার) শবরালী।

অন্তর্নিহিত ভাব :—

শূন্য, অতিশূন্য মহাশূন্য এবং প্রভাস্বর শূন্য—এই চারি প্রকার শূন্যের মধ্যে তৃতীয় মহাশূন্যই হচ্ছে তৃতীয় উদ্যান বাটিকা। হৃদয়-দেশে অবস্থিত অনাহত চক্রে রয়েছে প্রভাস্বর-শূন্যতারূপ কুঠার। এই কুঠার দ্বারা সমস্ত বিকল্পাদি-দোষ ছেদন ক'রে কণ্ঠে নৈরাত্মা-বালিকার জাগরণ হ'ল। তখন পার্থিব মায়া-মোহগুলি বিনিষ্ট ক'রে পদকর্তা এই নৈরাত্মা বালিকাকে নিয়ে মহাসুখে সেই তৃতীয় উদ্যান বাটিকায় বিরাজ করেন। কাপাস হচ্ছে চতুর্থ শূন্য, কেননা সাদা কাপাসের যেমন কোন বর্ণ বা রূপ থাকে না তেমনি প্রভাস্বরহেতু চতুর্থশূন্যও বর্ণহীন। জ্যোৎস্না-বাড়ি অর্থে প্রভাস্বর-শূন্যতা। সাদা কাপাস ও জ্যোৎস্নাবাটিকা প্রভৃতি দ্বারা তৃতীয় মহাশূন্যের পরবর্তী চতুর্থ মহাশূন্যের কথা বলা হইয়াছে। তৃতীয় স্তর থেকে চতুর্থ স্তরেও সাধকের উত্তরণ ঘটলে আকাশ-কুসুমের মতোই অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হয়। মহাসুখ-মদে মাতাল হয়ে উঠে সারা চিত্ত। তখন ভব-বিকল্পাদি দ্বারা বদ্ধ সংসারের সাধারণ মানুষ শবরের মৃত্যু হয়, তার ইন্দ্রিয়াদি দগ্ধীভূত হয়। সংসারের বিষয়বাসনরূপ শকুন-শৃগাল তাতে কাঁদে। এইভাবে ভবমত্ততা বিদূরিত হয়ে শবর নির্বাণ লাভ করে এবং তার শবরালি ঘুচে যায়। এখানে শবরালি ঘুচে যাওয়ার অর্থ চিত্ত অচিত্ততায় লীন হয়ে যাওয়া।

———

প্রথম চরণের সূচী

(বন্ধনী-মধ্যস্থ সংখ্যা পদ-নির্দেশক এবং শেষ সংখ্যাটি পৃষ্ঠাংক-বাচক)